গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র
ও
বাঙলার বিপ্লবীরা

সুকুমার মিত্র

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১, শংকর ঘোষ লেন,
কলকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা, ১৯৫৭

মুদ্রক :
শঙ্কর প্রসাদ নায়ক
নায়ক প্রিণ্টার্স
৮১/১ই, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র

ও

বাঙলার বিপ্লবীদের

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

সূচীপত্র

ভূমিকা

গান্ধীজী পৃথিবীর ইতিহাসের এক মহত্তম ট্র্যাজিক নায়ক, এক শোকাবহ ব্যর্থতার প্রতীক। সামাজিক ক্রমবিকাশের সমস্ত নিয়ম অগ্রাহ্য করে তিনি চেয়েছিলেন—মানুষে মানুষে গভীর প্রীতি ও মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে, সমস্ত বিরোধ, বিদ্বেষ, সংঘর্ষ ও যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে—এমন এক রামরাজ্য বা আদর্শ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে যেখানে স্বার্থপরতা ও বিদ্বেষের স্থান থাকবে না। রাজায়-প্রজায় বিরোধ থাকবে না। সকলেই সমান অধিকার ভোগ করবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রচার করেছিলেন অহিংসার ও ভ্রাতৃত্বের বাণী। তাঁর ঐ বাণীকে বাস্তবে রূপায়িত করতে তিনি নিজের জীবনকে বিপন্ন করতেও কুণ্ঠিত হন নি। অনেক ভেবে চিন্তেই তিনি তাঁর লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের পরাধীনতার অবসান ঘটানোয় আন্দোলনকে উপযুক্ত মাধ্যম রূপে বেছে নিয়েছিলেন। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ ও অহিংসার আন্দোলনের দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হৃদয়ে পরিবর্তন ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণ পথে তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টাই তাঁকে শেষ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট করেছিল।

ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসংগ্রামে (কংগ্রেসকে) তিনি তাঁর লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপায়রূপে বেছে নিয়েছিলেন। বুঝতে পারেন নি যে, ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর সংগঠন তাঁকে বুর্জোয়া রাজনীতির পঙ্কিল স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। রাজনীতিকে এক উন্নত নৈতিক স্তরে উন্নীত করার তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

গান্ধীবাদ নামে পরিচিত তাঁর মতবাদ এক মধ্যবিত্তসুলভ কল্পনাশ্রয়ী ও অবাস্তব মতবাদ রূপেই বর্তমান। তাঁর মাতৃভূমিতেই তাঁর মতবাদের চিতা রচিত হয়েছে। হানাহানি, সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও সংঘর্ষ আজ তুঙ্গে উঠেছে; বিচ্ছিন্নতাবাদ, জাতিভেদ প্রথা আজ দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করতে চলেছে, সংকট ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে।

গান্ধীজীর ব্যর্থতার কারণ এবং সুভাষচন্দ্রের সত্যকার রূপটি তুলে ধরাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্য কতটা সফল বা নিষ্ফল হয়েছে তা পাঠকরাই বিচার করবেন।

গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বাঙলার বিপ্লবী দলগুলির কর্মকাণ্ড ও ধ্যানধারণা এই গ্রন্থে বিশ্লেষিত হয়েছে।

—লেখক

গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র ও বাঙলার বিপ্লবীরা

(১ম পর্ব)

[১৯১৫-১৯২১]

১৯১৫। প্রথম মহাযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। গুজরাটের পোরবন্দর নামক দেশীয় রাজ্যের অধিবাসী ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফেরার পথে লণ্ডনে উপস্থিত হয়ে ভারতীয়দের এক সংবর্ধনা সভায় ভারতীয় তরুণদের 'সাম্রাজ্যিক' মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের 'কর্তব্য পালনের' জন্য আহ্বান জানালেন। অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে মিলে তিনি ভারত-সচিবের কাছে একটি চিঠিও দিলেন। চিঠিতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা ও সাম্রাজ্যের সেবায় আত্মনিয়োগের ইচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়েছিল। এক কথায় বলা যায় যে, গান্ধীজী তখনও ব্রিটিশ সরকারের উপর গভীর আস্থা রেখেছিলেন, তখনও তিনি সাম্রাজ্যের এক অনুগত নাগরিক। তখন তিনি 'গান্ধীজী' বা 'মহাত্মা' বলে পরিচিত নন। দেশের সাধারণ মানুষ তাঁকে চেনে না। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করে তিনি দেশে বিদেশে শিক্ষিত মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। লেভ তলস্তয়ের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছিল।

দেশে ফিরে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সর্বতোভাবে সহযোগিতা করলেন। গুজরাটের চাষীদের তিনি বুঝালেন যে, তারা সৈন্যদলে যোগ দিয়েই স্বরাজ লাভ করতে পারবে।

দেশে ফিরে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তাঁর রাজনৈতিক গুরু গোখলের উপদেশ অনুযায়ী সবরমতিতে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আদর্শ ও কর্মপন্থা অনুসরণ করবে এমন সব কর্মীকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই তিনি এই

আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। গঠনমূলক কাজের উপরেই তিনি তখন জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু অন্যায়ের ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের যে সঙ্কল্প তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা' তাঁকে বসে থাকতে দিল না। চম্পারণ, আমেদাবাদ ও খেরায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করে তিনি ভারতবর্ষের জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হলেন। এইসব আন্দোলন শুধু তাঁর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করল না, রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করল।

সমগ্র ভারতবর্ষ যখন প্রথম মহাযুদ্ধের বিপুল ভার বহন করতে গিয়ে চরম দারিদ্র্য, ইনফ্লুয়েঞ্জা, মহামারী এবং অবিরাম মূল্যবৃদ্ধির সম্মুখীন হয়ে বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে, ঠিক তখনই জাতীয় কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মিলন ঘটল (১৯১৬)। এই সময়েই জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে একটা রফা হয়ে গেল। ১৯১৬ সালের লখনৌ চুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে আংশিক স্বশাসনের অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে শাসন সংস্কারের একটি অভিন্ন পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য একযোগে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল।

সমাজের উপরের তলার বিত্তশালী মানুষদের ঐক্য ফলপ্রসূ হল ভিন্ন কারণে। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব সারা দুনিয়ার পরিস্থিতি বদলে দিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সতর্ক হল। জারতন্ত্রের পতনের পাঁচ মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্পর্কে মণ্টেগু ঘোষণায় বলা হল "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অচ্ছেদ্য অংশরূপে ভারতবর্ষে ক্রমে ক্রমে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ক্রমে ক্রমে স্বশাসনের প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশ ঘটানোই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের লক্ষ্য।"

ভারত সচিব মণ্টেগুর নামে ঘোষণাটি প্রচারিত হলেও এটি রচনা করেছিলেন ঝানু সাম্রাজ্যবাদী লর্ড কার্জন ও অস্‌টেন চেম্বারলেন।

কংগ্রেস নেতারা খুশি হলেন এবং ১৯১৭ সালের শেষদিকে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি গভীর আনুগত্য প্রকাশ করে প্রস্তাব গৃহীত হল। কিন্তু মণ্টেগু চেমস ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দেয়। ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ব্রিটিশ সরকারের শাসন সংস্কারের প্রস্তাবকে "নৈরাশ্যজনক ও

অসন্তোষজনক" বলে ধিক্কার জানানো হয়। নরমপন্থী ও উগ্রপন্থীদের মধ্যে বিরোধ আবার চরমে ওঠে এবং বিশিষ্ট নরমপন্থী নেতারা কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এ সময় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন এবং শনৈঃ শনৈঃ পাদ-প্রদীপের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছেন। তখনও তিনি গোখলের মন্ত্রশিষ্য, তখনও তিনি নরমপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলছেন। তবে বিশিষ্ট নরমপন্থী নেতারা কংগ্রেস ত্যাগ করলেও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী কংগ্রেস ত্যাগ করলেন না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমেই তাঁর আদর্শকে তিনি বাস্তবে রূপায়িত করতে পারবেন। আর কংগ্রেসকে প্রকৃত গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে না পারলে কিছুই করা সম্ভব হবে না এই সত্যও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ১৯১৮ সালে তাঁর উদ্যোগে বোম্বাই-এর কংগ্রেস অধিবেশনে চার হাজার কৃষক প্রতিনিধিকে যোগ দিতে দেওয়া হয়। সেই প্রথম বিত্তশালী ও উচ্চ শিক্ষিতদের রাজনৈতিক সংগঠন গণ-সংগঠনের রূপ লাভ করে।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীরও তখন রূপান্তর ঘটে গিয়েছে। তিনি আর তখন ব্যারিস্টার নন, আর দশজন উচ্চশিক্ষিত চোস্ত ইংরাজী বোলনেওয়ালা নেতা নন, তিনি তখন 'মহাত্মা'। তৎকালীন ভারতবর্ষের বিখ্যাত নরমপন্থী নেতা গোপাল কৃষ্ণ গোখলের অসাধারণ দূরদৃষ্টি ছিল। তিনিই প্রথম বুঝতে পারেন যে তাঁর মন্ত্রশিষ্য মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করবেন। ১৯০৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে আনীত প্রস্তাব প্রসঙ্গে বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি বলেছিলেন: "তিনি (গান্ধীজী) একজন মানুষের মতো মানুষ, বীরের মতো বীর, সেরা দেশপ্রেমী এবং এ কথা আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে, বর্তমান যুগে তাঁর মাধ্যমে ভারতীয় মানবতা সর্বোত্তম সীমাচিহ্নে উপনীত হয়েছে।"

১৯১৭ সাল থেকে জাতীয় কংগ্রেসে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে গান্ধীজী যখন সুপরিচিত হয়ে উঠেছেন তখনও তিনি ব্রিটিশ সরকারের উপর গভীর আস্থা রেখেছেন এবং আশা করেছেন যে, শাসন সংস্কার মেনে নিয়ে কাজ

করলে দেশ শীগ্রই পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার গঠনে সমর্থ হবে। তাঁর এই ধারণার বিরোধিতা করেন বাঙলার খ্যাতনামা ব্যারিস্টার সি আর দাস (তখনও তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বলে পরিচিত হন নি)।

১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় কংগ্রেসে প্রবল বাদবিতণ্ডার পর শেষ পর্যন্ত একটা আপস হয়, কিন্তু সংশোধিত যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে গান্ধীজী ও শ্রীমতী অ্যানী বেসান্তের নরমপন্থী কর্মনীতিই প্রাধান্য লাভ করে।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে যায়। রাজনৈতিক নেতৃত্বহীন লক্ষ লক্ষ বিক্ষুব্ধ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন শুরু করে দেয়। শ্রমিক ধর্মঘট অভূতপূর্ব আকারে দেখা দেয়। এর ফলে সরকার শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বন করে। যুদ্ধকালীন কঠোর শাসন ব্যবস্থাকে কঠোরতর করার জন্য রাওলাট আইন নামে পরিচিত এক কুখ্যাত আইন জারি করা হয় ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে। গণতান্ত্রিক সমস্ত অধিকার পদদলিত করে এই আইনে বিনাবিচারে যে কোন লোককে বন্দী রাখার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ ও অক্টোবর মহা-বিপ্লব তখন ভারতবর্ষের মানুষের মনে নতুন চেতনা জাগিয়েছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে শোষিত শ্রমিক-কৃষক তখন বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। রাওলাট আইন বারুদে অগ্নিসংযোগ করল।

গান্ধীজী বুঝলেন যে, ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা ও আপসের চেষ্টা জনগণকে আরও বিক্ষুব্ধ করে তুলবে। আর তিনি এও বুঝলেন যে ব্রিটিশ সরকার তাদের শাসন ও শোষণের ক্ষমতা বজায় রাখতে দৃঢ়সঙ্কল্প, বুঝলেন 'এ সব দৈত্য নহে তেমন।'

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ভারতীয় পরিস্থিতিতে কাজে লাগাবার জন্য তিনি প্রস্তুত হলেন। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই সত্যাগ্রহ লীগ গঠিত হয়েছিল। এই সংস্থার তরফ থেকে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদ জানানোর জন্য ৬ এপ্রিল হরতাল ডাকা হল।

হরতালের ডাকে সাড়া দিল লক্ষ লক্ষ মানুষ। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ টলমল করে উঠল। দেশব্যাপী এই আলোড়ন স্তম্ভিত বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করলেন গান্ধীজী, কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা এবং ব্রিটিশ সরকার।

সাম্রাজ্যবাদী সরকারের মুখোস খুলে গেল, অনুসৃত হল নির্মম দমননীতি যার পরিণতি ঘটল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের খবর চেপে রাখা হল আট মাস। চেপে রাখায় সরকারী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও খবর ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। সমগ্র দেশে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠল। সমস্ত ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকার এক তদন্ত কমিটি (হান্টার কমিটি) গঠন করল এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগকে লঘু করে দেখানর ব্যবস্থা করল। ঝানু সাম্রাজ্যবাদীরা ঘাতক জেনারেল ডায়ারকে পুরস্কৃত করল ২০ হাজার পাউণ্ডের তোড়া উপহার দিয়ে। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে গান্ধীজী ১৮ এপ্রিল সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অহিংসার পথ থেকে জনসাধারণ তথা সত্যাগ্রহীরা বিচ্যুত হয়েছে, আন্দোলন স্থগিত রাখার পক্ষে এই ছিল গান্ধীজীর প্রধান যুক্তি।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, জনসাধারণ, এমনকি নেতৃস্থানীয় অনেকেই গান্ধীজীর অহিংসার নীতিকে একটা পলিসি বা কর্ম-কৌশল বলে গ্রহণ করেছিলেন, দর্শন হিসাবে নয়। গান্ধীজী এটা বুঝতে পেরেই বলেছিলেন যে তিনি "হিমালয় প্রমাণ ভুল" করেছেন বলেই দুষ্ট লোকেরা—খাঁটি সত্যাগ্রহীরা নয়—বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পেরেছে।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রথম পর্যায় শেষ হল। কিন্তু দেশজুড়ে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের আগুন ধোঁয়াতে লাগল অব্যাহতভাবে।

১৯১৯ সালে যখন কংগ্রেস শাসন সংস্কার রূপায়ণে উদ্যোগী হচ্ছে এবং গান্ধীজী যখন দেশবাসীর কাছে শাসন সংস্কারকে সফল করার জন্য শান্তভাবে কাজে মন দিতে আহ্বান জানাচ্ছেন ঠিক তখনই লক্ষ লক্ষ শ্রমিক শুরু করে দিল ধর্মঘট-সংগ্রাম। ১৯২০ সালের প্রথম ছয় মাসেই ২০০ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করল ১৫ লক্ষ শ্রমিক।

১৯২০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে সভাপতি লালা লাজপৎ রায় অকপটভাবে ঘোষণা করলেন:

"এই সত্য এড়িয়ে গিয়ে কোন লাভ নেই যে, আমরা এক বৈপ্লবিক কালের মধ্যে দিয়ে চলেছি…"

গণ-বিক্ষোভ গণ-বিপ্লবের রূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে দেখে গান্ধীজী ও

অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা (সকলেই কিন্তু একমত হন নি) আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের ব্যর্থতা সত্ত্বেও গান্ধীজীর প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটি গান্ধীজীর নেতৃত্বেই আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

গান্ধীজী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মঞ্চের পাদ-প্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সকলের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যবশতঃ তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হলেন।

—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁকে দেখল "বিপজ্জনক বিদ্রোহী" রূপে যদিও তাঁর অহিংসা নীতি ও আপসকামী মনোভাব তাদের মনে স্বস্তি এনে দিল।

—ভারতীয় ধনিকশ্রেণী এতদিনে তাদের মনের মতো মানুষ দেখতে পেলেন। এমন মানুষ আগুন জ্বালাতেও পারবেন, আবার আগুন নেভাতেও পারবেন। গণ-বিপ্লবের ভয় আর থাকবে না, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হবে।

—আর দেশের কোটি কোটি নিরক্ষর অনগ্রসর ও শোষিত মানুষ গান্ধীজীকে দেখল এক অবতাররূপে যিনি 'রামরাজত্ব' প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই 'রামরাজত্বে' সবাই দু'বেলা পেট ভরে খেতে পারবে, সবাই সমান হবে, শোষণ শাসনের বালাই থাকবে না।

সবচেয়ে অনগ্রসর সরল দেহাতী মানুষগুলি তাকে দেখল এক মস্ত "গুণী" রূপে।

গান্হী বাবা কে ? গান্হী বাবা ?

"বড়া গুণী আদমী। বৌকা বাওয়া আর রেবন গুণীর চাইতেও 'নামী'।

সিরিদাস বাওয়ার চাইতেও বড় না হলে কি মাস্টার সাব চেনা হয়েছে। গান্হী বাবা মাস-মছলী নেশা ভাঙ থেকে 'পরহেজ'। সাদি বিয়া করেনি। নাঙ্গা থাকে বিলকুল।"

(ঢোঁড়াই চরিত মানস—সতীনাথ ভাদুড়ী)

—শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী কিছুটা সংশয়, কিছুটা বিরোধী মনোভাব সত্ত্বেও

গান্ধীজীকে নেতা হিসাবে মেনে নিলেন। একটা সুযোগ তাঁকে দিতে চাইলেন।

এক কথায় ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে গান্ধীজী আবির্ভূত হলেন একাধারে জনগণের ও ধনিকশ্রেণীর নেতারূপে, আবির্ভূত হলেন যুগপৎ সত্য সন্ধানী মানবপ্রেমিক, দেশপ্রেমিক এবং রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদ রূপে।

গান্ধীজী তার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বুর্জোয়া রাজনীতির স্রোতে নেমে পড়লেন। বলাবাহুল্য এই রাজনীতির মালিন্য থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন নি, পারা সম্ভব ছিল না।

(২)

সুভাষচন্দ্র কটকে এক বিত্তশালী বাঙ্গালী পরিবারের ছেলে। পিতা ছিলেন খ্যাতনামা আইনজীবী। ছেলেবেলাতেই তিনি ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। গীতা, উপনিষদ্, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আবার হেগেলীয় দর্শনও তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। দর্শনের ক্ষেত্রে অন্যান্য দর্শনের তুলনায় হেগেলীয় দর্শনই সত্যের অনেক বেশী কাছাকাছি যেতে পেরেছে বলে সুভাষচন্দ্র অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

শুধু ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় নয়, বাঙলার স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ভাবধারাও তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

গান্ধীজী যখন কংগ্রেসের অন্যতম নেতারূপে আবির্ভূত হলেন তখন সুভাষচন্দ্র ওটেন সাহেবকে প্রহারের অভিযোগে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন।

সুভাষচন্দ্র আদৌ ওটেন সাহেবকে প্রহার করেছিলেন কি না এ প্রশ্ন নিয়ে এখনও বাদানুবাদ চলছে। যাদের দ্বারা ওটেন প্রহৃত হয়েছিলেন, সুভাষচন্দ্রকে তাদের মধ্যে তিনি দেখতে পান নি বলে ওটেন সাহেব তার স্মৃতি কথায় লিখে গেছেন বলে জানা গেছে। কিন্তু সে সময় সরকার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে যে তদন্ত কমিটি গঠন করেন সেই তদন্ত কমিটি অভিযুক্ত ছাত্রদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছিল, ফলে ভোলানাথ রায়, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন ছাত্র প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন।

সুভাষচন্দ্র ছিলেন বিত্তশালী পরিবারের ছেলে এবং মেধাবী ছাত্র। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সুভাষচন্দ্রের পিতাকে জানতেন। কাজেই তিনি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে সুভাষচন্দ্র যাতে অন্য কলেজে পড়াশুনো করতে পারেন তার ব্যবস্থা করে দেন। সুভাষচন্দ্র স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ার অনুমতি পান এবং দর্শনশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বি এ পাস করেন।

সুভাষচন্দ্র যখন বিলেতে আই সি এস পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছেন তখন সমগ্র ভারতবর্ষে আলোড়ন উঠেছে। দেশের অবস্থা লক্ষ্য করে সুভাষচন্দ্র বিচলিত হলেন। দেশের মুক্তি সংগ্রামে যোগদানের সঙ্কল্প তাঁর মনে জাগল। ১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। এই বছরেই সুভাষচন্দ্র আই সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। কিন্তু ব্রিটিশ প্রশাসনের "ইস্পাতের কাঠামো"য় যোগদান তাঁর আর করা হল না।

গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯২১ সালের মে মাসে সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করে দেশে ফিরে এলেন। ১৬ জুলাই বোম্বাইতে পৌঁছে সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলেন।

বিদেশে থাকায় সময় শুধু পরীক্ষার পড়া নিয়ে সুভাষচন্দ্র মাথা ঘামান নি, মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীরা কি ধরনের কর্মপন্থা অনুসরণ করেছেন তাও তিনি বিশেষভাবে অনুধাবন করেছিলেন। গান্ধীজী ঠিক কী করতে চান এইটি জানাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

বোম্বাই-এ 'মণিভবনে' গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘ আলোচনা হয়। সুভাষচন্দ্রের প্রশ্ন ছিল তিনটি: (১) কংগ্রেসের বিভিন্ন ধরনের তৎপরতা কিভাবে তার শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ ট্যাক্সবন্ধ আন্দোলনে পরিণতি লাভ করবে; (২) শুধু কর বন্ধ আন্দোলন বা আইন অমান্য আন্দোলন করে কি বিদেশী শাসকদের হটিয়ে দেওয়া ও স্বাধীনতা লাভ করা যাবে; (৩) এক বছরের মধ্যে 'স্বরাজ' লাভ করা যাবে এমন প্রতিশ্রুতি মহাত্মা কি করে দিতে পারলেন।

প্রথম প্রশ্নের জবাবে গান্ধীজী যা বলেছিলেন সুভাষচন্দ্র তাতে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কিন্তু বাকি দু'টি প্রশ্নের জবাবে তিনি খুশি হতে পারেন নি।

'এক ঘন্টা' আলোচনার পর সুভাষচন্দ্র নৈরাশ্যপীড়িত বিষণ্ণ মনে ফিরে এলেন।

তিনি লিখেছেন: "তাঁর প্রকৃত প্রত্যাশা কি তা' আমি বুঝতে পারলাম না। হয় তিনি তাঁর সব গোপন কথা আগেভাগে প্রকাশ করতে চান নি, আর না হয় কি কৌশলে সরকারকে বাধ্য করা যাবে সে সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণা ছিল না।" (পরে সুভাষচন্দ্র মন্তব্য করেন যে, সম্ভবতঃ "মহাত্মাজী সরকারের হৃদয়ের পরিবর্তন" ঘটবে এই আশা করেছিলেন।)

সুভাষচন্দ্র এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন যে, তিনিই হয়ত সব কথা বুঝতে পারেন নি তবু যুক্তি দিয়ে বিচার করতে গিয়ে তিনি বুঝেছিলেন যে, "মহাত্মা যে পরিকল্পনা করেছেন তাতে স্পষ্টতার শোচনীয় অভাব আছে এবং যে আন্দোলন ভারতবর্ষকে তার আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা এনে দেবে সেই আন্দোলনের পরের পর স্তরগুলি সম্পর্কে তাঁর নিজেরই কোন পরিষ্কার ধারণা নেই।"

(Netaji Collected Works, Vol. II, p. 59)

গান্ধীজী উপদেশ দিলেন সুভাষচন্দ্রকে চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে দেখা করতে। কলকাতায় পৌঁছে চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হল তখন চিত্তরঞ্জন তাঁর ব্যারিস্টারি ছেড়ে দিয়ে পরিপূর্ণভাবে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। এবারে তিনি সত্যিকারের একজন নেতা পেয়ে খুশি হলেন। স্বল্পকালের মধ্যেই সুভাষচন্দ্র চিত্তরঞ্জনের দক্ষিণ হস্ত হয়ে উঠলেন। দেশবাসীও সাদরে তাঁকে অন্যতম নেতারূপে বরণ করে নিল।

(৩)

বাঙলার বিপ্লবী দল ও গোষ্ঠীগুলির মধ্যে 'যুগান্তর' দলই প্রথম গান্ধীজীর প্রতি আকৃষ্ট হল। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বাহ্নে যখন যুগান্তর-অনুশীলন মিলনের প্রচেষ্টা চলেছে তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর নেতৃত্বে 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' আন্দোলন বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'যুগান্তর' দলের নেতারা এই অন্দোলনে "আশার ক্ষীণ রশ্মি" দেখতে পেলেন।

"আমরা বুঝলাম, যদি গান্ধীজী দেশে আসেন তাঁর নেতৃত্বে জনজাগরণের কাজ খুব ভালো হবে—প্রকাশ্য আন্দোলন বলশালী হবে। আমরা চাঁদা তুলে গোখলের হাতে দিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকার কাজ সারা হয়ে গান্ধীজী যাতে ভারতে আসেন তাঁকে (গান্ধীজীকে) সেরূপ অনুরোধ জানাতে বললাম।"
(বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ২য় সং, পৃঃ ৩২২)

পুণা থেকে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে কলকাতায় এসেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতীয়দের আন্দোলনে সাহায্যার্থে চাঁদা সংগ্রহ করতে। 'যুগান্তর' দলের প্রতিনিধিরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে সংগৃহীত চাঁদা তাঁর হাতে তুলে দেন এবং উপরোক্ত অনুরোধ জানান।

১৯১৫ সালে গান্ধীজী দেশে ফিরে গোখলের উপদেশে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। দেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং জনসাধারণের সঙ্গে যোগ স্থাপনই ছিল এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য।

১৯১৫ সালের শেষ দিকে কলকাতায় উপস্থিত হয়ে গান্ধীজী ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত এক সভায় যোগ দেন। এই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন তৎকালীন প্রথম বাঙলা সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের বড়কর্তা পি সি লায়লন। তিনি বাংলার তরুণদের "দেশদ্রোহী" অর্থাৎ দেশপ্রেমিক না হয়ে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানান। এই সভায় গান্ধীজী বলেন: "বাঙলার বিপ্লবী তরুণরা পথভ্রষ্ট হতে পারে, কিন্তু তাদের দেশপ্রেম খাঁটি সত্য বস্তু। আমাদের তাদের ঘৃণা করা উচিত নয়।"

১৯১৬ সালে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে আড়ম্বরপূর্ণ এক সভার অনুষ্ঠান হয়। মদনমোহন মালব্য একটা বিদ্যালয়ের জন্য এক কোটি টাকা চাঁদা তুলেছিলেন। বেশির ভাগ টাকা দিয়েছি'লন দেশীয় রাজ্যের রাজারা।

এই সভায় গান্ধীজী বলেন: "এখানে যে শিক্ষা দেওয়া হবে তাতে যেন দেশের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা জন্মায়। যেমন ভালোবাসা বঙ্গের বিপ্লবীদের মধ্যে দেখা যায়।"

স্বভাবতঃই গান্ধীজীর এইসব উক্তি 'যুগান্তর' দলে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি করে। কিন্তু ১৯১৭-১৮ সালে গান্ধীজী সরকারের যুদ্ধ কমিটিতে যোগ দিয়ে রংরুট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে কলকাতায় উপস্থিত হয়ে ব্যাপটিস্ট মিশনের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত বিপ্লবীদের সম্পর্কে এমন কটূক্তি করেন যে বিপ্লবীরা স্তম্ভিত হয়ে যান। অনুরাগ তীব্র বিরাগে পরিণত হয় তবে বিরাগ আবার অনুরাগে পরিণত হতে বেশি দেরি হয় নি।

গান্ধীজীর প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় বিপ্লবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের। এ ব্যাপারে ১৯০৭ সালে তাঁর মেজদা মাখনগোপাল এবং

অতীশ সেনগুপ্ত তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। ডাঃ যদুগোপালের প্রথম থেকেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের উপর বিশেষ আস্থা ছিল না। ব্যাপক গণ আন্দোলন ব্যতিরেকে কিছু করা যাবে বলে তিনি মনে করতেন না। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পরিকল্পনা তাঁর মনে সাড়া জাগায়। ইতিমধ্যে 'যুগান্তর' দলের অন্যান্য নেতারাও নতুনভাবে ভাবিত হন।

প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পর ১৯১৯-১৯২০ সালে রাজবন্দী ও অন্তরীণ বন্দীরা একে একে ছাড়া পেতে থাকেন। ১৯২০ সালে মনোরঞ্জন গুপ্ত মুক্তিলাভ করার পর পলাতক ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে নতুন কর্মপন্থা অনুসরণের প্রস্তাব করেন। ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁকে সমর্থন করেন।

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, কুন্তল চক্রবর্তী, চারু ঘোষ প্রমুখ 'যুগান্তর' দলের নেতৃস্থানীয় কর্মীরাও অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

ইতিমধ্যে ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজীর অ-সহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী গৃহীত হল। এই সময়েই 'যুগান্তর' দলের কর্মীরা সর্বভারতীয় নেতাদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন।

এ সময় 'যুগান্তর' দলের মধ্যে নতুনভাবে ভাবিত নেতা ও কর্মীদের চিন্তাধারা কোন্ খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল তা' পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত।

তিনি লিখেছেন: "এতদিন আমরা তিন জনে ভেবেছি—একটা জাতি শুধু গুপ্ত সমিতির কাজকর্ম দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার কল্পনা করতে পারে না—বিশেষতঃ ভারতবর্ষের মতো একটা বিশাল নিরস্ত্র দেশ কিছু অস্ত্র কোনভাবে সংগ্রহ করে তাই নিয়ে যুদ্ধ করে ইংরেজের মতো একটা শক্তির কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের কল্পনা করতে পারে না; তা বরং সম্ভব ছিল বিংশ শতাব্দীর আগে। বিপ্লবীর কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই—এই মন্ত্রে দীক্ষিত যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ও রাসবিহারীর সহযোগিতায় জার্মানীর সাহায্য নিয়ে ভারত বিশ্বযুদ্ধের কালে স্বাধীন হবার গোপন আয়োজন করেছিল। তারপর আজ কোন্ পথ—সেই আলোচনাই আমাদের।"

(বিপ্লবী গান্ধী ও ভারতে বিপ্লবান্দোলন, গান্ধী পরিক্রমা, পৃঃ ১৯২-১৯৩)

পথের সন্ধানে 'যুগান্তর'-এর নেতারা যখন ব্যাপৃত তখন গান্ধীজী অনেক

দূর অগ্রসর হয়েছেন। ভারতব্যাপী একটা আন্দোলন আসন্ন হয়ে উঠেছে। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সত্ত্বেও 'যুগান্তর' দলের নেতাদের অনেকেই গান্ধীজীর আন্দোলনে সমর্থন জানানো কর্তব্য বলে মনে করলেন। 'বিপ্লবী আন্দোলনের স্বার্থে' তারা 'গণ-চাঞ্চল্য'-কে কাজে লাগাতে চাইলেন।

শেষ পর্যন্ত স্থির হল দলের কয়েকজন নেতা নাগপুরে গিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা করে তিনি কিভাবে কি করতে চান তা' বুঝবার চেষ্টা করবেন। ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, কুন্তল চক্রবর্তী, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, পূর্ণ দাস, ভূপতি মজুমদার ও গিরীন ব্যানার্জী—এই ছয়জন নাগপুরে চলে গেলেন।

বাঙলার একটি বড় বিপ্লবী দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছেন জেনে গান্ধীজী খুশি হলেন এবং প্রথম আলাপকালেই তিনি বিপ্লবীদের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও সাহসের উচ্চ প্রশংসা করে 'যুগান্তর'-এর প্রতিনিধিদের অভিভূত করে দিলেন।

'যুগান্তর'-এর প্রতিনিধিরূপে ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও কুন্তল চক্রবর্তী গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা চালান। এই আলোচনাতেই প্রথম বুঝতে পারা যায় যে 'যুগান্তর' দল ইংল্যাণ্ডের মতো একটি সংসদীয় সরকার গঠনের অর্থাৎ একটি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের কথা ভাবছে। এ বিষয়ে গান্ধীজী তাঁদের সঙ্গে একমত হন। কিন্তু কোন্ পথে বিপ্লব পরিচালিত হলে এমন ধরনের সরকার গঠন সম্ভব হবে সে বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়।

'যুগান্তর' দলের প্রতিনিধিরা এক বছর সর্বান্তঃকরণে গান্ধীজীর কর্মসূচী মেনে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অস্ত্রধারণ করতে হবে এই অভিমত প্রকাশ করেন।

মহাত্মাজী শেষ পর্যন্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেন, "আচরণ-নীতি হিসাবে—policy হিসাবে তোমরা উপস্থিত অহিংসার পথ বেছে নিচ্ছ, তাতে আমি খুশী ; কিন্তু সর্বান্তঃকরণে আমি তোমাদের অভিনন্দন জানাতাম যদি তোমরা তোমাদের রাজনীতির ভিতরই—as principle—অহিংসাকে গ্রহণ করতে।" "বলি, না মহাত্মাজী না আমরা পারি নে। আপনাকে সে কথা দিলে আমাদের পক্ষে অসত্যতা হবে।"

(বিপ্লবী গান্ধী ও ভারতে বিপ্লবান্দোলন—ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, গান্ধী পরিক্রমা, পৃঃ ২০১)

গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনার পর 'যুগান্তর' দলের নেতারা আলোচনা করলেন পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দের সঙ্গে। এখানে বলে রাখা ভালো যে শ্রীঅরবিন্দের প্রতি 'যুগান্তর' দলের ভক্তি ও আস্থা ছিল গভীর।

শ্রীঅরবিন্দ সব কথা শুনে বললেন, "গান্ধীজীকে কথা দিয়ে ঠিকই করেছ। এখন পন্থা এই—carry the message of revolt of the people—জনগণের কাছে বিদ্রোহের বার্তা পৌঁছে দাও। কিন্তু নিজেদের ভাসিয়ে দিও না। Don't make a fetish of non violence—অহিংসাতে নিজেদের খর্ব করে তুলো না। গান্ধী এসেছেন বিরাট এক শক্তি নিয়ে—দেশকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবেন, but I don't believe, he can bring independence—কিন্তু তিনি দেশকে স্বাধীন করে দিয়ে যেতে পারবেন, আমি বিশ্বাস করিনে।" (গান্ধী পরিক্রমা, পৃঃ ২৩৪)

এ ছাড়া শ্রীঅরবিন্দ আন্দোলনের শক্তিকে ধরে রাখার জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার উপদেশ দেন এবং গান্ধীজীর আন্দোলন চলাকালে বিপ্লবের আয়োজন করতে নিষেধ করেন।

শ্রীঅরবিন্দের উপদেশেই 'যুগান্তর' দলের নেতারা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চন্দননগরের মতিলাল রায়ের সাহায্য গ্রহণ করে যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় নেতাদের পলাতক জীবনের অবসান ঘটান।

মোটের ওপর বেশ সুপরিকল্পিতভাবেই 'যুগান্তর' দল তাদের নিজস্ব সংগঠন ও সত্তা বজায় রেখেই গান্ধীজীর আন্দোলনে যোগ দেয়।

"আমাদের দল ১৯২১ সালের অ-সহযোগ আন্দোলনে যোগ দিল। কিন্তু সংঘের আপন প্রধান কেন্দ্র কংগ্রেসের বাইরে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলতে লাগল। হিংসা কর্মসূচী বর্জিত হল বা মুলতবী রইল।"

(বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৮৪)

অসাধারণ রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে গান্ধীজী বাঙলার উদীয়মান দুই শক্তিশালী নেতা চিত্তরঞ্জন-সুভাষচন্দ্র এবং বাঙলার একটি শক্তিশালী বিপ্লবী দলকে তাঁর পক্ষে টেনে এনে অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠলেন।

'যুগান্তর' দল কয়েকটি প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত প্রধান রাজনীতি থেকে একেবারে সর্বভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হল।

শুধু শ্রীঅরবিন্দের উপদেশ নয়, বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করেই 'যুগান্তর'

দলের নেতারা তাদের নিজস্ব সংগঠন বজায় রাখতে বাধ্য হন। এতদিন কর্মীদের সশস্ত্র বিপ্লবের লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করতে বলা হয়েছে, এখন হঠাৎ সেই লক্ষ্য বর্জন করলে দলের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটতে পারত। 'যুগান্তর'-এর এক কালের বিশিষ্ট কর্মী ও পরে কমিউনিস্ট মতাবলম্বী নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ের উল্লেখ করে পরিহাসভরে লিখেছেন :

"দাদারা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। অস্ত্রশস্ত্র শিকেয় তোলার ব্যবস্থা"। (বিপ্লবের সন্ধানে, পৃঃ ৬৪) তখনই তার চোখে অহিংসার বিপ্লবীবিরোধী ভূমিকা ছিল সুস্পষ্ট।

এই মনোভাব থেকে পরে বিপ্লবী দলে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, তবে সে কাহিনী এখানে বলার প্রয়োজন নেই।

বাঙলার অপর বৃহত্তম বিপ্লবী দল 'অনুশীলন' গান্ধীজীর আন্দোলনের বিরোধিতা করল। এই দলের নেতাদের দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছিল যে, গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন দেশের মানুষকে ক্লীব করে দেবে, ফলে সশস্ত্র বিপ্লবের এতদিনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু 'অনুশীলন' দলের নেতা ও কর্মীদের এই প্রত্যয় তাদের ভুল পথে নিয়ে গেল।

আসন্ন আন্দোলনের দিকে তাকিয়ে সরকার বিপ্লবীদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল। বিপ্লবীদের একটি দল গান্ধীজীর আন্দোলনের বিরোধী জেনে সরকার উল্লসিত হল এবং 'অনুশীলন' দলের সাহায্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

১৯১৯ ও ১৯২০ সালে রাজবন্দী ও অন্তরীণ বন্দীরা একে একে মুক্তিলাভ করতে থাকেন। "এই অবস্থায় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং Y. M. C. A.-র নেতা O. R. Raha এবং বি সি চ্যাটার্জী, এস আর দাস প্রমুখ মডারেট নেতাদের নেতৃত্বে মুক্ত বন্দীদের জন্যে ইণ্টালী বেনেপুকুরের একটা বড় বাড়ি নিয়ে একটা ফ্রী মেসের মতন ব্যবস্থা হ'ল। ঢাকা অনুশীলন পার্টির একজন নেতৃস্থানীয় সদ্যমুক্ত রাজবন্দী নলিনীকীশোর গুহকে সেখানে বসানো হল পরিচালক হিসাবে। এই আড্ডা থেকেই নলিনীবাবু 'শঙ্খ' নামে সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। তারপর পুলিন দাসের নেতৃত্বে ওখানেই 'ভারত সেবক সংঘ' গঠিত হয় এবং তার মুখপত্র 'হককথা' প্রকাশিত হয়। হককথারও সম্পাদক হয়েছিলেন নলিনীবাবুই। অসহযোগ আন্দোলনে বিরুদ্ধে প্রচারই ছিল এই সংঘ ও পত্রিকার কাজ।" (বিপ্লবের সন্ধানে, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৬৫)

প্রকৃতপক্ষে 'অনুশীলন' দলের নেতারা বিদেশী সরকারের ফাঁদে পা দিয়েছিলেন।

অ-সহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে সরকারের ইঙ্গিতে ব্রিটিশ ধনী বনিকেরা ইয়োরোপীয় এসোসিয়েশনের মাধ্যমে টাকা ঢালতে শুরু করেছিলেন।

Citizen's Protection League বা নাগরিক রক্ষা সঙ্ঘ নামে একটি সঙ্ঘ গঠিত হয়েছিল বি সি চ্যাটার্জী প্রমুখ কয়েকজন মডারেট নেতার সহায়তায়। এ ব্যাপারে তৎকালীন এ্যাডভোকেট জেনারেল এস আর দাস বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনিই 'অনুশীলন' দলের নেতা পুলিনবিহারী দাসের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে অ-সহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্য প্রচুর অর্থ সাহায্য দেন। এই টাকাতেই "শঙ্খ", "হককথা" প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশ ও প্রচার করা সম্ভব হয়। এ সব কাজ চালানোর জন্য সিটিজেন প্রোটেকশন লীগের সদস্যদের নিয়েই ভারত সেবক সংঘ গঠিত হয় এবং সারা দেশে এই সংঘের শাখা গড়ে তোলা হয়।

দীর্ঘকাল ধরেই 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে 'অনুশীলন' দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। এই সময় বিরোধ তুঙ্গে ওঠে এবং সরকার এই বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করে উভয় দলের অনেক খবর জেনে ফেলে। এর ফল হয়েছিল শোচনীয়।

'অনুশীলন' দলকে তাদের মারাত্মক ভুলের মাসুল গুনতে হয়েছিল। দলের শুধু বদনাম হল না, দলের প্রভাব প্রতিপত্তিও কমে গেল। সর্বভারতীয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'অনুশীলন' একটি মধ্যবিত্তপ্রধান প্রাদেশিক দলরূপে টিকে থাকল।

হেমচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবী দল 'মুক্তি সংঘ' (পরে বি ভি বা বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স নামে পরিচিত) অ-সহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা না করে দলের সংগঠনকে আরও মজবুত করার চেষ্টা করেছিল এবং তার ফলও ফলেছিল। সংশয়, সন্দেহ সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র বিনাশর্তেই গান্ধীজীর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন। 'যুগান্তর' দলের নেতারা গান্ধীজীর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন শর্তাধীনে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর নেতৃত্বে আস্থা হারিয়ে বিদ্রোহ করেন। অন্যদিকে 'যুগান্তর' দল গান্ধীজীর নেতৃত্ব পুরোপুরি মেনে

নিয়ে কংগ্রেসের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। 'যুগান্তর' দলের জাতীয় কংগ্রেসের অঙ্গীভূত হওয়া প্রসঙ্গে অরুণচন্দ্র গুহ লিখেছিলেন :

"এর মধ্যে শুরু হল গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ।...মৌলিক দিক থেকে দেখলে গান্ধীজীর এই আন্দোলন আমাদের বিপ্লব আন্দোলনের অনুসৃতি মাত্র। আমাদের চিন্তাজগতে আর একটি সূর্যের উদয় হল। আমাদের রাজনীতির ক্রমবিকাশ এখান থেকে শুরু হয়। আমরা সিদ্ধান্ত করলাম, খালাস হয়ে গান্ধীজীর অ-সহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবে।

পন্থাগত এত বড় একটা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত একদিনে বা হুজুগের মুখে হয় নি, হয়েছে অনেক আলোচনা, অনেক তর্কবিতর্ক ও অনেক অন্তর্দ্বন্দ্বের পর। সহিংস বিপ্লবীর আত্মশ্লাঘা অহিংস-পন্থা অবলম্বনে আমাদের পক্ষে অন্তরায় হয়েছিল। তখন আমরা গান্ধীর পন্থাই (technic) গ্রহণ করেছিলাম কিন্তু তাঁর মত (ideology) গ্রহণ করিনি। কি করে আস্তে আস্তে আমরা গান্ধীজীর মতবাদও গ্রহণ করলাম—সে এক বিস্ময়কর কাহিনী।" (পরিচিতি অরুণচন্দ্র গুহ, বিপ্লবের পদচিহ্ন, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, ১৯৫৩) শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, কি সুভাষচন্দ্র, কি 'যুগান্তর' দল কোন পক্ষই কংগ্রেসে ধনিকশ্রেণীর আধিপত্য নিয়ে মাথা ঘামান নি। তাঁরা ধনিকশ্রেণীর সহযোগিতা স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছিলেন তার পরিণতি কি হতে পারে তা কখনও ভাবেন নি। আর তাই, এ নিয়ে সুভাষচন্দ্র বা 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে গান্ধীজীর কখনও বিরোধ দেখা দেয় নি। অহিংসা নীতির দার্শনিক তত্ত্বের মোড়কেঢাকা যে আপস-নীতি বার বার দেশব্যাপী মুক্তি সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দিল সে আপস-নীতি যে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর স্বার্থেই অনুসৃত হয়েছিল এই সত্যও সুভাষচন্দ্র ও 'যুগান্তর' দলের নেতারা উপলব্ধি করতে পারেন নি। তবু সুভাষচন্দ্র আপস-নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ভারতের তথা বাঙলার ঐতিহ্য অনুসরণ করে, 'যুগান্তর' দল সে ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়েছিল। একমাত্র 'অনুশীলন' দল গান্ধীজীর কর্মনীতি সম্পর্কে কিছুটা সচেতন ছিল, তাই সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছিল।

১৯২১ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল এবং কংগ্রেসের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছিল কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

সংযোজন

গান্ধীজী বাঙলার বিপ্লবীদের সশস্ত্র বিপ্লবের পথ পরিহার করে অ-সহযোগ আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনার চেষ্টা যখন শুরু করেন তখন তিনি 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন' উভয় দলের নেতাদেব সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। 'যুগান্তর' দলের নেতারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা করেন কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনকালে। কিন্তু 'অনুশীলন' দল অ-সহযোগ আন্দোলনের বিরোধী হওয়ায় গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন বোধ করেনি।

গান্ধীজী কলকাতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে অবস্থানকালে 'অনুশীলন' দলের নেতা পুলিনবিহারী দাসের সঙ্গে আলোচনা করতে চান। তাঁর ইচ্ছার কথা জানতে পেরে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বড় ভাই ব্যারিস্টার সুবোধ রায় ও আনন্দমোহন বসুর পুত্র ব্যারিস্টার হিমাংশু রায় (সম্ভবতঃ দেশবন্ধুর পরামর্শ-ক্রমেই) পুলিনবাবুকে গান্ধীজীর কাছে নিয়ে যান।

আলোচনা শুরু হলে মতিলাল নেহরু মন্তব্য করেন যে, চিত্তরঞ্জনকে যখন গান্ধীজী তাঁর দলে টানতে পেরেছেন তখন পুলিনবাবুকেও সহজেই স্বমতে আনতে পারবেন। কিন্তু গান্ধীজী প্রথম আলাপেই বুঝেছিলেন যে তিনি বেশ শক্ত পাল্লায় পড়েছেন। প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের পর গান্ধীজী রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনা করতে চান। তদনুযায়ী তিনদিন ধরে রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনাকালে তিনদিনই ব্যারিস্টার সুবোধ রায় ও হিমাংশু বসু আলোচনা-স্থলে উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা ব্যর্থ হয়, পুলিনবাবু সশস্ত্র বিপ্লবের পথ পরিহার করতে অস্বীকার করেন। গান্ধীজীর অহিংস অ-সহযোগ আন্দোলনের উপর তাদের কোন আস্থা নেই এ কথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন।

'অনুশীলন' দল সক্রিয়ভাবে অ-সহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করতে থাকে এবং এই উদ্দেশ্যে এস আর দাসের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে "ভারত সেবক সংঘ" নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে এবং 'শঙ্খ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে।

এস আর দাস দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের খুড়তুতো ভাই এবং খ্যাতনামা ব্যারিস্টার। তিনি চিত্তরঞ্জনের রাজনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন।

কারামুক্ত বিপ্লবীদের এক সম্মেলনে পুলিন দাস যে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন তা' শোনার পর এস আর দাস তার আত্মকথায় (বিপ্লবী পুলিন দাস, ১ম সং, ১৯৬৫) অকপটেই লিখেছেন :

"এস আর দাস বলিলেন, কাজ শুধু অ-সহযোগ আন্দোলনের বিভিন্ন ত্রুটিগুলি জনসাধারণকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে। ইহার কর্মপদ্ধতি ও কার্য পরিচালনার ভার আপনাকেই লইতে হইবে, ব্যয়ভার সম্পূর্ণই আমি বহন করিব"। ব্যয়ভার যে এস আর দাস বহন করেন নি এ কথা সুবিদিত, কিন্তু পুলিনবাবু কি তা জানতেন না? আসলে "কাঁটা দিয়ে কাঁটা" তোলার নীতি অনুসরণ করেই তিনি বিদেশী শাসকদের ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। এর ফলেই শেষ পর্যন্ত তিনি দলের আস্থা হারান।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথও গান্ধীজীর অ-সহযোগ আন্দোলনকে প্রথমে সমর্থন করতে পারেন নি। তাই পুলিনবাবুর অনুরোধে 'শঙ্খ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার জন্য তিনি একটি কবিতা পাঠিয়ে দেন। কবিতায় পরিষ্কার ভাবে অ-সহযোগ আন্দোলনকে ইঙ্গিত করেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

"সাধন কি তোর আসন নেবে হট্টগোলের কাঁধে, খাঁটি জিনিস হয়রে মাটি নেশার পরমাদে।" শেষ দুটি লাইনে ছিল :

"মস্ত বড় লোভের শেষে মস্ত ফাঁকি জোটে এসে, ব্যস্ত আশা জড়িয়ে পড়ে সর্বনাশের ফাঁদে।"

বিপিন পালও গান্ধীজীর আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। গান্ধীজীর তীব্র সমালোচনা করে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি 'শঙ্খ'-এ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সে সময় গান্ধীজীর নেতৃত্বে সমগ্র দেশে বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হওয়ায় সম্পাদক নলিনী গুহ গান্ধীজীকে সমর্থন করে ও বিপিন পালের প্রবন্ধের সমালোচনা করে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পুলিনবাবু এতে আপত্তি করায় নলিনীবাবু পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন গান্ধীজীকে ঐ ভাবে আক্রমণ করলে 'শঙ্খ' কিনবেন না।

প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই পুলিনদাসের সঙ্গে দলের অন্যান্য নেতাদের বিরোধ শুরু হয়। পুলিন দাস নিজেই লিখেছেন :

"এই সম্পর্কে ও অন্যান্য বিষয়েও আমার সঙ্গে অনুশীলন সমিতির কয়েকজন প্রধান কর্মীর সহিত মতবিরোধ, পরে কলহ আরম্ভ হয়।"

(বিপ্লবী পুলিন দাস, পৃঃ ২৮১)

এই 'মতবিরোধ ও কলহে'র পরিণতি ঘটে কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনকালে প্রচারিত প্রতুল গাঙ্গুলী প্রমুখ নেতাদের ইস্তাহার প্রকাশে। পুলিনবাবু 'অনুশীলন' দলের নেতৃত্ব থেকে অপসারিত হন।

গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র ও বাঙলার বিপ্লবীরা

(২য় পর্ব)

[১৯২২-১৯২৮]

গান্ধীজী যখন কংগ্রেসের হাল ধরলেন তার আগেই তাঁর মত ও পথ বেশ স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছিল। তাঁর মত ও পথ গান্ধীবাদ নামে পরিচিত।

গান্ধীবাদের মূলে ছিল বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অহিংসা ও ক্ষমা। বৈষ্ণবধর্মের প্রেম ('মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না') ও বিনয় ('তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা'), গীতার একনিষ্ঠ ঈশ্বর-ভক্তি ('সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'), অনাসক্তি ও রাগ-ভয়-ক্রোধ থেকে মুক্তি ('দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগত স্পৃহ, বীত রাগ ভয় ক্রোধঃ') এবং বাইবেলের আত্মদান ও ক্ষমার বাণী। আর এ সবের সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটেছিল রাসকিন, তলস্তয়, এমারসন ও থরো-ইয়োরোপ ও আমেরিকার চারজন মনীষীর চিন্তাধারা।

গান্ধীবাদের মূল কথা হল অহিংস অ-সহযোগ বা প্রতিরোধের দ্বারা প্রতিপক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানো যায়।

গান্ধীজী তাঁর মত ও পথ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং সাময়িকভাবে কিছুটা সাফল্যও অর্জন করেছিলেন। এই সাফল্যই তাঁকে ভারতবর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর মত ও পথ অনুসরণে উৎসাহিত করে।

ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষকে তাঁর মতবাদ গ্রহণ করানো সহজ সাধ্য ছিল না এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্মম দমন-পীড়ন জনগণকে পাল্টা-আক্রমণের পথ অনুসরণে বাধ্য করেছিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বর হত্যাকাণ্ডের খবর যখন প্রকাশিত হল তখন জনগণকে আর সংযত রাখা সম্ভব হল না। আগুন জ্বলে উঠল এবং সেই আগুনে কিছু সংখ্যক ইয়োরোপীয় নরনারী পুড়ে মরলেন। ক্ষুব্ধ গান্ধীজী

আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। জনগণ বিক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হলেও গান্ধীজীর নির্দেশ মেনে নিয়ে আন্দোলন থেকে বিরত হল।

আন্দোলন চলাকালে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও সংহতি সাম্রাজ্যবাদীদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। আন্দোলনের প্রচণ্ডতাও তাদের গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা গান্ধীজীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল। গান্ধীজী যে সহজেই আন্দোলন বন্ধ করে দিতে পারলেন তা' লক্ষ্য করে তারা গান্ধীজীর নেতৃত্বের শক্তি সম্পর্কে যেমন নিঃসন্দেহ হয় তেমনি গান্ধীজীর আপসকামী মনোভাব লক্ষ্য করে তারা খুশিও হয়। এই কারণেই গান্ধীজীর উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞাগুলি ক্রমে ক্রমে প্রত্যাহার করা হয়।

জনগণের মনোভাব লক্ষ্য করে গান্ধীজীও সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন। পিছু হটা যাবে না বুঝতে পেরে তিনি আরও কঠিন শৃঙ্খলার সঙ্গে দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হলেন। এই আন্দোলনে চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্রের সমর্থনলাভে উৎসাহিত হয়ে গান্ধীজী বাংলার বিপ্লবীদের সমর্থনলাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন এবং 'যুগান্তর' দলের শর্তাধীন সমর্থনলাভ করে স্বস্তি লাভ করেন। এবার তাঁর দৃষ্টি পড়ল মুসলমান সম্প্রদায়ের দিকে।

হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব তিনি অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন। এই ঐক্যকে সুদৃঢ় করার ও নির্বিঘ্নে তাঁর আন্দোলন পরিচালনার সুযোগ এনে দিল খিলাফতের প্রশ্ন নিয়ে সারা দেশে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ ও বিক্ষোভ।

ভারতীয় মহাবিদ্রোহের কাল থেকেই ভারতীয় মুসলমান সমাজের মধ্যে বিক্ষোভ ও অসন্তোষের আগুন ধোঁয়াচ্ছিল। ভারতীয় মহাবিদ্রোহের সময়ে স্বল্প-সংখ্যক মুসলমান আধুনিক ইয়োরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। দিল্লী কলেজে যেসব মুসলমান ছাত্র শিক্ষালাভ করেছিলেন বা করছিলেন তাদের অনেকেই মহাবিদ্রোহে যোগ দেন। এই কারণে মহাবিদ্রোহের সময় দিল্লী কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাংলায় ফোর্ট উইলিয়ামেও বেশ কিছুসংখ্যক মুসলমান আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হন।

এই সময় থেকেই নতুন ভাবধারা মুসলমান সমাজে ধীরে ধীরে প্রবাহিত

হতে থাকে। কিন্তু তখনও ধর্মীয় নেতাদের প্রভাব খুব বেশী থাকায় স্বল্প-সংখ্যক আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান অনেকটা কোণঠাসা হয়ে থাকেন।

মহাবিদ্রোহের আগেই সৈয়দ আহম্মদ খাঁর (১৮১৭-১৮৯৮) নেতৃত্বে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু সৈয়দ আহম্মদ খাঁ পরিণত বয়সে তার সমাজ সংস্কারের চিন্তাধারা এবং বিদেশী-বিরোধী মনোভাব পরিহার করে পুরোপুরিভাবে ব্রিটিশ শাসন মেনে নেন। কিন্তু তার দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূর করার আহ্বান এবং প্রশাসনে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের দাবি মুসলমান সমাজে নতুন চেতনার সৃষ্টি করে।

সৈয়দ আহম্মদ খাঁ শিক্ষা প্রচারে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং তার চেষ্টাতেই আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভেদ নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে মুসলমান সম্প্রদায়কে কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে জাতীয় আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টায় ব্রতী হয়।

সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সৃষ্টি হয় এইভাবেই। কিন্তু শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তরা তখন যে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখতে থাকেন সে স্বপ্ন ভেঙে দেওয়া সম্ভব হল না। এর ফলে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে আগ্রহী, সমাজ সংস্কারে প্রয়াসী এবং প্রশাসনে অধিক পরিমাণে অংশগ্রহণে সচেষ্ট একটি শিক্ষিত গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটল মুসলমান সমাজে। এই গোষ্ঠীকে বলা যায় আলিগড় গোষ্ঠী। আবার দারুণ ব্রিটিশবিরোধী দেওবন্দগোষ্ঠী বিদেশী সরকারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে মুসলিম সমাজের সমস্ত গলদ দূর করে মুসলিম সমাজকে নতুন করে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হল।

এছাড়া একেবারে গোঁড়া, সর্বপ্রকার সংস্কারের বিরোধী আধুনিক সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া একটি বড় গোষ্ঠীও রয়ে গেল।

যত মতবিরোধ থাক না কেন সব গোষ্ঠীই সমস্ত মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করার আবশ্যকতা উপলব্ধি করল। এই উপলব্ধির মূলে ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ও ক্ষমতালাভের আগ্রহ। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের মধ্যে জেগেছিল জাতীয়তাবোধ যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্বাতন্ত্র্যবোধ। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী মুসলিম নেতাদের চিন্তাধারার মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র ছিল। তারা সকলেই মনে করেছিলেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে

পারলে ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে তাদের দাবি-দাওয়া আদায় করা সম্ভব হবে। মূলতঃ এই ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলিম নেতারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দিকে ঝুঁকলেন। কিন্তু তাদের জাতীয়তাবোধ ও আত্ম-সচেতনতার বিচিত্র অভিব্যক্তি ঘটল খিলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে।

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর সঙ্গে যোগ দিয়ে তুরস্ক মিত্রশক্তির কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। অটোম্যান বা তুরস্ক সাম্রাজ্য ভাগ-বাঁটোয়ারার জন্য মিত্রশক্তি প্রস্তুত হল। তুরস্কের সুলতান ছিলেন সারা মুসলিম দুনিয়ার ধর্মগুরু। তুরস্কের সুলতান তার সাম্রাজ্য হারাবেন এবং ধর্মগুরু থাকতে পারবেন না এই আশঙ্কায় ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ বিচলিত হয়ে উঠল। মুসলিম নেতৃবৃন্দ খিলাফতের প্রশ্নে ভারতীয় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার সুযোগ পেয়ে গেলেন। নেতারা সারা দেশে সভাসমিতি করে মুসলমানদের জাগিয়ে তুললেন। স্বভাবতই তাদের প্রচার ও আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে উঠল এবং তার ফল—জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের হাত মেলানোর সুযোগ এনে দিল।

খিলাফত আন্দোলন এমন সময় আরম্ভ হয়েছিল যখন খলিফা নিয়ে মুসলিম জগতের অন্যান্য দেশ মাথা ঘামাচ্ছিল না এবং একাধিক আরব দেশ তুরস্কের সুলতানের অধীনে থাকতে রাজি ছিল না। এ ছাড়া খাস তুরস্কেই কামাল পাশার (আতাতুর্ক) নেতৃত্বে তুরস্ককে আধুনিক ইয়োরোপীয় ধাঁচের রাষ্ট্রে পরিণত করার দাবিতে তুরস্কী তরুণরা সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। এর ফলে তুরস্ক সেভ্‌র চুক্তি মানতে অস্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত লাজানে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হল তার ফলে তুরস্ক হারায় সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া (ইরাক) ও প্যালেস্তাইন। মিশরের উপর তার আধিপত্যও তাকে হারাতে হয়। তবে লাজান চুক্তির বলে তুরস্ক কনস্ট্যান্টিনোপোল (ইস্তাম্বুল), স্মারনা, আরমেনিয়া, কুর্দিস্তান তার দখলে রাখতে সমর্থ হয়।

অবশেষে কামাল পাশার নেতৃত্বে গ্রীসকে এশিয়া মাইনর থেকে বিতাড়িত করে তুরস্ক এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সুলতানকে গদীচ্যুত করে খলিফার পদ লোপ করা হয়।

কাজেই খিলাফত আন্দোলনের ভিত ছিল অত্যন্ত দুর্বল। তবু এই

আন্দোলন ভারতবর্ষের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার ও জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে তাদের হাত মেলানোর সুযোগ এনে দিয়েছিল এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

অহিংস অ-সহযোগ আন্দোলন শুরু করার আগে গান্ধীজী খুব সতর্কভাবে সকল দিক গুছিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর কার্যকলাপ লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যায় যে, সাধু সন্তরূপে নয়, দক্ষ রাজনীতিবিদ রূপেই তিনি প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। কথাটা তিনি নিজেও বলেছিলেন। অ-সহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি বলেন: "আপাতত আমার কথা আপনারা বাদ দিন। আমার বিরুদ্ধে সাধুগিরির ও একনায়কত্বের আকাঙ্ক্ষার অভিযোগ আনা হয়েছে। আমি বলতে চাই যে, আপনাদের সামনে আমি সাধুসন্তরূপে অথবা একনায়কত্ব প্রার্থী রূপে দাঁড়াই নি।"

মুসলমানদের মধ্যে উগ্র মনোভাব প্রবল এটা লক্ষ্য করে গান্ধীজী চিন্তিত হয়েছিলেন। তাই খিলাফত কমিটি অ-সহযোগ আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব আনছে শুনে গান্ধীজী নিজে খিলাফত কমিটির সভায় যোগ দেন।

১৯২০ সালের ১৯ মার্চ অনুষ্ঠিত এই সভায় গান্ধীজী খিলাফত কমিটির প্রস্তাব সম্পর্কে বলেন: "প্রস্তাবটিতে অতি সম্মানজনকভাবে ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আন্দোলনের কয়েকটি স্তর নির্দেশ করা হয়েছে, যার শেষ পর্যায়ে হবে সশস্ত্র বিপ্লব। ভগবান করুন এ দেশকে যেন সশস্ত্র বিপ্লব ও তার আনুষঙ্গিক বিভীষিকার মুখ দেখতে না হয় কিন্তু খিলাফত প্রশ্ন সম্পর্কে মানুষের মনোভাব এত তীব্র যে, সমস্যার যথোচিত সমাধান না হলে বা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ব্যর্থ হলে এমন এক সশস্ত্র বিপ্লব আসবে, যা এদেশ কখনও দেখেনি। আশা করি, সরকার ক্রোধোন্মত্ত নির্যাতন দ্বারা সে অবস্থা টেনে আনবেন না।"

মুসলমান নেতাদের বুঝিয়ে গান্ধীজী তাদের অহিংস কর্মপন্থা অনুসরণ করতে রাজী করে একটা বড় রকমের সাফল্য অর্জন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সরকার দমন-নীতি অনুসরণ করলে সশস্ত্র বিপ্লব হতে পারে এই ভয় দেখিয়ে তিনি সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করলেন।

খিলাফত কমিটির মাধ্যমেই অ-সহযোগ আন্দোলন শুরু করা হল। জাতীয় কংগ্রেস যখন আন্দোলন শুরু করার আহ্বান জানাল তখন সারা দেশে এক

বিরাট আন্দোলনের ঢেউ উঠল। গান্ধীজী এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আদায় করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর মানুষ সেই প্রতিশ্রুতিতে আস্থা রেখে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী সন্ত্রস্ত হয়ে নির্মম দমননীতি অনুসরণ করলেন। উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ জনতা অহিংসার কর্মপন্থা অগ্রাহ্য করে পাল্টা জবাব দিল। নানা স্থানে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটল। উত্তর-প্রদেশের মজফ্ফরপুর জেলার চৌরি-চৌরা গ্রামে বিক্ষুব্ধ জনতার আক্রমণে ২২ জন পুলিস কনস্টেবল নিহত হল। জনগণের বিপ্লবী মনোভাব সরকার ও ধনিকশ্রেণী উভয়ের মনে ভীতির উদ্রেক করেছিল। সবকার পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মাধ্যমে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে একটা আপসরফা করার চেষ্টা শুরু করল। অন্যদিকে কংগ্রেস সমর্থকদের চাপ বাড়তে লাগল।

অবস্থা বুঝে গান্ধীজী আগেভাগেই প্রস্তুত হয়েছিলেন। জনতার হিংসাত্মক কার্যকলাপের উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন যে, 'স্বরাজ' কথাটা এখন তাঁর কাছে দুর্গন্ধময় হয়ে উঠেছে।

আন্দোলন তখন তুঙ্গে উঠেছে। গান্ধীজী ছাড়া আর কোন নেতাই তখন বাইরে নেই। গান্ধীজী এর সুযোগ গ্রহণ করতে দ্বিধা করলেন না।

আমেদাবাদ কংগ্রেসে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার নেতৃত্ব গ্রহণের নামে কংগ্রেসের সর্বময়ক্ষমতাসম্পন্ন নেতা রূপে নির্বাচিত হলেন। তিনি যে সাধুসন্তরূপে আন্দোলন পরিচালনা করছেন না তার প্রমাণ তিনি আগেই দিয়েছিলেন। এখন গণ-আন্দোলন সংযত করার উদ্দেশ্যে তিনি 'ডিকটেটর' রূপে দেখা দিতেও দ্বিধা করলেন না।

গান্ধীজীর কার্যকলাপ সাম্রাজ্যবাদী সরকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল। হাওয়া ঘুরছে বুঝে বড়লাট তারযোগে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে আশ্বস্ত করে জানালেন যে, বোম্বাই-এর দাঙ্গা-হাঙ্গামা, গণ-আইন অমান্য আন্দোলনের বিপদ মিঃ গান্ধীকে সজাগ করেছে। কংগ্রেসের প্রস্তাবে চরমপন্থীদের অহিংসা নীতি বর্জন করার দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং খাজনা বন্ধ আন্দোলনের কথা তোলাই হয়নি।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

চৌরি-চৌরার হাঙ্গামার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

বারদৌলিতে খাজনা বন্ধ আন্দোলনের সিদ্ধান্তও মুলতবী রাখা হল।

দেশবাসী বিমূঢ়, কারারুদ্ধ কংগ্রেস নেতারা ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত। প্রতিবাদ জানালেন অনেকেই কিন্তু গান্ধীজী অটল, নির্বিকার। "জেলে যারা আটক রয়েছেন তাদের তো কোন নাগরিক জীবন থাকে না"—এই যুক্তিতে তিনি সব প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করলেন।

কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধের আগুন ধোঁয়াচ্ছে দেখে ভারত সরকার আঘাত হানার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। ১৯২২ সালের ১৯ মার্চ গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হল। দেশে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিল না। বিচারে গান্ধীজী ছয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন এবং দুই বছরের মধ্যেই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল। কংগ্রেস কর্মীরা তখন গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত যখন টলমল করছে, প্রচণ্ডতর বিস্ফোরণের আশঙ্কায় ভারত সরকার যখন দিশাহারা হয়ে উঠেছে ঠিক সেই সময়েই গান্ধীজী আন্দোলন বন্ধ করে দিয়ে একদিকে সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে এবং অপরদিকে সন্ত্রস্ত ভারতীয় ধনিকশ্রেণীকে বাঁচালেন।

চৌরি-চৌরায় যে সব কৃষক পুলিসের অবিরাম গুলিবর্ষণে (যতক্ষণ কার্তুজ ছিল ততক্ষণ গুলি চালানো হয়েছিল) হতাহত হয়েছিল তাদের সম্বন্ধে একটি কথাও বলা হল না। কোনরকম সাহায্য দান তো দূরের কথা, হাঙ্গামায় জড়িত অভিযোগে মামলার প্রথম দফায় ১৭২ জন কৃষকের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তারা নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গেল। গান্ধীজী তো তাদের মত লোকদের 'শান্তিভঙ্গকারী দুর্বৃত্ত' বলে গণ্য করেছিলেন, কাজেই তিনিও নীরব রইলেন।

চৌরি-চৌরার হাঙ্গামার পর গান্ধীজী যখন আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র একই জেলে আটক ছিলেন।

গান্ধীজীর সিদ্ধান্তের খবর পেয়ে দেশবন্ধু ক্ষেপে গিয়েছিলেন। আন্দোলন আর একটু অগ্রসর হলেই ব্রিটিশ সরকার আপস করতে বাধ্য হত এই ধারণা তার মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে, গান্ধীজী বড় রকমের আন্দোলন শুরু করতে পারেন বেশ ভালভাবেই, কিন্তু তিনি শেষরক্ষা করতে পারেন না।

গান্ধীজীর সিদ্ধান্তে সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তিনি স্পষ্টভাষায় বলেন যে, গান্ধীজীর আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে চৌরি-চৌরার ঘটনা একটা অজুহাত মাত্র। তিনি এমনও খবর পেয়েছিলেন যে, বারদৌলি সত্যাগ্রহ সফল হবে না জেনেই গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। অবশ্য এ খবর তিনি বিশ্বাস করেন নি।

ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে যখন লক্ষ লক্ষ লোক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছে তখন চৌরি-চৌরার মত কয়েকটি ঘটনার জন্য আন্দোলন প্রত্যাহার করার কোন যৌক্তিকতা নেই এই বিষয়ে দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য অনেক কংগ্রেস নেতাই একমত হয়েছিলেন।

কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় দেশবন্ধু বা সুভাষচন্দ্র মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত চৌরি-চৌরার কৃষকদের সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নি। এ ব্যাপারে তাঁরা নীরব থেকে কার্যত গান্ধীজীর মনোভাবকেই সমর্থন করেছিলেন।

'যুগান্তর' দলের দিকে দৃষ্টি রেখে দেশবন্ধু, গোপীনাথ সাহা সংক্রান্ত প্রস্তাব নিয়ে, গান্ধীজীর সঙ্গে তীব্র তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু চৌরি-চৌরার কৃষকদের সম্পর্কে তিনি একটি কথাও বলেননি। আন্দোলনের অবসান ঘটল। দেশবাসী অসাধারণ শৃঙ্খলা ও সংযমের পরিচয় দিল। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে ধূমায়িত বিক্ষোভ আর চাপা রইল না।

ধনিকশ্রেণীর একটি অংশ ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর একটি বড় অংশের প্রতিনিধিরূপে চিত্তরঞ্জন দাস ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে ধরলেন। তারা রাজনৈতিক আন্দোলন পরিহার করে গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণের বিরোধিতা করলেন। আইনসভা বর্জন করার নীতি ত্যাগ করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং 'শত্রুর দুর্গে প্রবেশ করে ভিতর থেকে লড়াই চালানোর' জন্য তারা আহ্বান জানালেন। শুরু হয়ে গেল 'নো-চেন্‌জার' ও 'প্রো-চেন্‌জার' অর্থাৎ পরিবর্তনবিরোধী ও পরিবর্তন-কামীদের মধ্যে তুমুল লড়াই। কংগ্রেসে তখনও গান্ধীজীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। তাঁর বিচারকালে তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতা ও কারাদণ্ড গান্ধীজীর জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর মানুষ তখনও তাঁর কাছে অলৌকিক কিছুর আশা করছিল। এই অবস্থায় গান্ধীজীকে হটানো সহজ ছিল না।

পরিবর্তনকামীরা কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কিছু করা যাবে না বুঝে 'স্বরাজ্য

দল' নামে এক নতুন দল গঠন করলেন। ১৯২৩ সালে 'স্বরাজ্য দল' বিভিন্ন প্রদেশের আইনসভা, কেন্দ্রীয় আইনসভা ও পৌর সংস্থাসমূহের নির্বাচনে বিপুল সাফল্য লাভ করতে সমর্থ হল। এর ফলে স্বভাবতই পরিবর্তন বিরোধীদের প্রভাব হ্রাস পেল। কংগ্রেসের মধ্যে মিটমাটের চেষ্টা শুরু হল।

উভয়পক্ষের মধ্যে একটা আপস মীমাংসার উদ্দেশ্যে ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন ডাকা হল। এই অধিবেশনে বুর্জোয়া রাজনীতির খেলা দেখিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গান্ধীজীকে কোণঠাসা করলেন এবং পরিবর্তন বিরোধীদের আপস করতে বাধ্য করলেন।

তখন কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পর্কে কোনরকম বাড়াবাড়ি ছিল না। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক প্রতিনিধির চাঁদা নিয়ে প্রতিনিধি কার্ড দিলে যে কেউ প্রতিনিধি হতে পারতেন। চিত্তরঞ্জন এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে দ্বিধা করলেন না। বাংলা থেকে লোক আনতে গেলে প্রচুর অর্থের দরকার, "সুতরাং কয়েকজন লোক পাঠানো হল কাশীতে এবং প্রায় সমস্ত বাঙ্গালী টোলাটাকেই খদ্দরে সাজিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হল দিল্লীতে, বেঙ্গল ডেলিগেট।

কংগ্রেসে দেশবন্ধু বললেন যদি আপনারা বলেন আমি ভোটাভুটিতে রাজি আছি। কিন্তু আমি চাইনা, কংগ্রেস ভেঙে দুখানা হয়ে যাক। আমি মিলিত সংহত কংগ্রেসই চাই।" (বিপ্লবের সন্ধানে, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৮২) ফল যা হওয়ার তাই হল। কংগ্রেসেরই দুই স্বতন্ত্র অংশ হিসেবে দুই পক্ষ নিজ নিজ কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করে যাবেন এই মর্মে আপস হল।

আসলে নো-চেঞ্জার বনাম প্রো-চেঞ্জার বিরোধ কংগ্রেসেরই অভ্যন্তরীণ বিরোধ। আন্দোলনের তৎকালীন অবস্থায় স্বরাজ্য দলের অভ্যুদয় একটা অগ্রবর্তী পদক্ষেপ বলেই গণ্য হয়েছিল, তবে এর কোনো বড় রকমের তাৎপর্য ছিল না। প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়াদের নরমপন্থী অংশ এ সময় সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করার চেষ্টা করছিল। কেন্দ্রীয় আইনসভায় লিবারেল দলের (প্রাক্তন মডারেট বা নরমপন্থীদের) ও স্বতন্ত্র সদস্যদের সমর্থনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে দেশবন্ধু অকপটভাবেই ঘোষণা করেছিলেন: "তার দল সহযোগিতা করতেই এসেছে। সরকার যদি তাদের সহযোগিতা না করে তা' হলে দেখবেন স্বরাজীরা তাদেরই লোক।"

ফরিদপুরে প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে দেশবন্ধু আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন যে, তিনি সরকারের "হৃদয়ের পরিবর্তন" লক্ষ্য করছেন। 'পরিবর্তন' ঘটেছিল ঠিকই তবে 'সে পরিবর্তন' সাম্রাজ্যবাদী সরকারের রুদ্ররূপ ধারণের ইঙ্গিত বহন করে আনল।

দেশবন্ধুর সহযোগিতার প্রসারিত হাত মুচড়ে দিয়ে সরকার স্বরাজ্য দলের সংগঠক 'যুগান্তর' দলের নেতা ও কর্মীদের ব্যাপক ভাবে গ্রেপ্তার করতে শুরু করল। ক্ষুব্ধ চিত্তরঞ্জন বললেন: স্বরাজ্য দলকে ধ্বংস করাই সরকারের লক্ষ্য।

দেশবন্ধুর জনপ্রিয়তা যখন তুঙ্গে ঠিক তখনই শুরু হয়ে গেল তার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা। বিষণ্ণ, নৈরাশ্যপীড়িত দেশবন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ১৯২৫ সালের ১৭ জুন দার্জিলিং-এ তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

স্বরাজ্য দলেরও আয়ু ফুরিয়ে এল।

অস্ত্রোপচারের কিছুকাল পরে গান্ধীজী মুক্তিলাভ করেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর প্রত্যাবর্তনের সূচনা হয় এই সময় থেকেই।

কংগ্রেস সভাপতিরূপে তিনি মহম্মদ আলিকে এক দীর্ঘ পত্রে জানান, "আমার মুক্তি আমার মনে স্বস্তি আনে নি। মুক্তির আগে আমি দায়িত্ব থেকে মুক্ত ছিলাম⋯এখন আমি যে দায়িত্বভার পালনে অক্ষম সেই দায়িত্বজ্ঞান আমাকে বিহ্বল করছে।"

হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ও দাঙ্গা গান্ধীজীকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল। কিন্তু তার মূল কারণ তিনি খুঁজে পাননি। আন্দোলনের দুর্বলতাই এর জন্য দায়ী বলে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন। আইনসভায় প্রবেশ সংক্রান্ত প্রশ্নে তিনি কোন মতামত দিতে চাননি তবে তাঁর পূর্বের বর্জন প্রস্তাবে তিনি অটল থাকেন।

কিছুকাল পরে যখন গান্ধীজী জুহুতে (বোম্বাই) বাস করতে আরম্ভ করলেন তখন দেশবন্ধু ও মতিলাল নেহরু তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে তাদের মতানুবর্তী করার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এ সময় নেতাদের মধ্যে বিরোধ বেশ তীব্র হয়ে ওঠে। গান্ধীজী তাঁর ওপর দেশের অধিকাংশ মানুষের আস্থা আছে বুঝে অবিরাম আত্মপক্ষ সমর্থনে 'ইয়ং ইন্ডিয়া' ও 'নবজীবন' পত্রিকায়

প্রবন্ধ প্রকাশ করতে লাগলেন। সবরমতি আশ্রমে ফিরে গিয়ে তিনি আসন্ন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে চারটি প্রস্তাব আনবেন বলে জানান।

১৯২৪ সালের ২৭ জুন আমেদাবাদে বৈঠক শুরু হলে মোতিলাল নেহরু গান্ধীজীর তীব্র সমালোচনা করেন। গোপীনাথ সাহা সংক্রান্ত প্রস্তাব নিয়ে তো দেশবন্ধু ও গান্ধীজীর মধ্যে গজ-কচ্ছপের লড়াই হয়। ভোটের জোরে জয়লাভ করলেও গান্ধীজী বুঝতে পারেন তিনি তাঁর আগের শক্তি হারিয়েছেন। বিশেষ করে গোপীনাথ সাহা সংক্রান্ত প্রস্তাবটি সামান্য ভোটাধিক্যে গৃহীত হওয়ায় গান্ধীজী বিচলিত হন এবং "পরাজিত ও পর্যুদস্ত" শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনি তাঁর মর্মবেদনা ব্যক্ত করেন।

যাইহোক মূলগত প্রশ্নে কোন বিরোধ না থাকায় কংগ্রেসের তথা বুর্জোয়া নেতাদের মধ্যে বিরোধ স্বল্পকাল স্থায়ী হয়।

বাংলায় সরকারের প্রচণ্ড দমননীতি সারা দেশে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। গান্ধীজী নিজে বাংলায় ছুটে আসেন। কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলির অবসান ঘটিয়ে এবং পরিবর্তনবিরোধী ও পরিবর্তনকামীদের বিরোধ মিটিয়ে ফেলে সকলকে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতারা এক বিবৃতি প্রকাশ করলেন। সকল দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্যও আহ্বান জানানো হয়।

গান্ধীজী, দেশবন্ধু ও মতিলাল নেহরু স্বাক্ষরিত আবেদনের সুপারিশগুলি বিবেচনার উদ্দেশ্যে ১৯২৪ সালের ২১ নভেম্বর একটি সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্যার দীনেশ পেতিতের সভাপতিত্বে এই সম্মেলন বাংলায় সরকারের দমননীতিকে ধিক্কার জানায় এবং কংগ্রেসের মধ্যে সকল দলকে ঐক্যবদ্ধ করার ও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানসহ স্বরাজ লাভের উপায় নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করে।

এর পরেই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে গান্ধীজী, দেশবন্ধু, মতিলালের বিবৃতি অনুমোদিত হয় এবং অ-সহযোগ আন্দোলন মুলতবী রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গান্ধীজী আবার পূর্ণ গৌরবে কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

বেলগাঁও কংগ্রেসে স্বয়ং দেশবন্ধু স্বরাজ্য দল ও স্বরাজ্য দলবিরোধীদের

মিলনের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। কংগ্রেস গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করল। স্বরাজ্য দল আইনসভায় তাদের লড়াই চালিয়ে যেতে থাকল।

ইতিমধ্যে গান্ধীজী সারা ভারতবর্ষ সফরে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর বাংলা সফরকালেই দেশবন্ধু চির বিদায় গ্রহণ করলেন। খুলনায় গান্ধীজী দেশবন্ধু সম্পর্কে বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। সমস্ত বিরোধ ও তিক্ততার অবসান ঘটল।

এদিকে স্বরাজ্য দলে ভাঙন ধরল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ঘোষিত শর্তগুলি ডঃ মুনজে, এন সি কেলকার প্রমুখ নেতারা মানতে চাইলেন না।

বাংলায় ডঃ এ সুরাবর্দি স্বরাজ্য দল ত্যাগ করলেন। স্বরাজ্য দল কংগ্রেসেরই অঙ্গ, কাজেই নেতাদের বিনা অনুমতিতে ডঃ সুরাবর্দি লাটসাহেবে সঙ্গে দেখা করায় গান্ধীজী তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। এই একটি ক্ষেত্র ছাড়া স্বরাজ্য দলের অভ্যন্তরীণ বিরোধে গান্ধীজী কখনও হস্তক্ষেপ করেন নি।

এরপর নতুন নতুন দল গড়ে উঠতে থাকে। মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল ক্রমেই কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে।

গান্ধীজী ধীর পদে অগ্রসর হলেন। কানপুর কংগ্রেসে তিনি সক্রিয়ভাবে কোন অংশগ্রহণ করলেন না। ১৯২৬ সালে তিনি পর্যটনসূচী মুলতবী রেখে সবরমতি আশ্রমের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখলেন। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে গৌহাটি কংগ্রেসে তিনি দীর্ঘকাল নীরব থাকার পর আবার সরব হয়ে উঠলেন। তখন তাঁর একমাত্র বাণী হল 'খদ্দর গ্রহণ কর। খদ্দরই স্বরাজ আনবে।' আবার পর্যটন শুরু হল। ইতিমধ্যে 'ইয়ং ইন্ডিয়া'য় তিনি কমিউনিস্ট নেতা সাচপতিওয়ালার বক্তব্য প্রকাশ করে তার জবাব দিলেন। এমনিভাবে অবিরাম পর্যটন, প্রচার ও সভাসমিতির মাধ্যমে গান্ধীজী ধীরে ধীরে আবার রাজনৈতিক মঞ্চের পাদ-প্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ালেন ইতিমধ্যে ঈশান কোণে দেখা দিল আসন্ন ঝড়ের কালো মেঘ। ভারত সরকার সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়ে ধনিকশ্রেণী থেকে আরম্ভ করে একেবারে নিঃস্ব কোটি কোটি মানুষকে দাবিয়ে রাখার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলল। সমগ্র দেশে বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু এবার গণ-বিক্ষোভ ভিন্নতর রূপ নিল। শ্রমিকশ্রেণী তখন সচেতন হয়ে উঠেছে। ধনিকশ্রেণীর শোষণ তারা বরদাস্ত করতে চাইল না। শ্রমিকরা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়বার সঙ্গে সঙ্গে

তাদের শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করল। ধর্মঘটের উত্তাল তরঙ্গ উঠল সারা দেশে।

নতুন চিন্তাধারা প্রবাহিত হল শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে। কংগ্রেসেও এর প্রতিফলন ঘটল বামপন্থী গোষ্ঠীর আবির্ভাবে। জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ১৯২৭ সালের মাদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতাই দেশবাসীর লক্ষ্য বলে ঘোষিত হল। আবার একই সঙ্গে সাইমন কমিশন বর্জন করার ও বিকল্প সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে সর্বদলীয় সম্মেলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

এই অবস্থায় গান্ধীজী আর রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকতে পারলেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি কোন সময়েই প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে যান নি। নানাভাবে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছেন নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য।

মাঙ্গালোর থেকে যেদিন গান্ধীজী নয়া দিল্লীতে পৌঁছালেন সেই দিনই তাঁর হাতে সাইমন কমিশন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি তুলে দেওয়া হল। গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করেছিলেন শুধু এই দলিল দেওয়ার জন্যই কি তাঁকে দিল্লী আসতে বলা হয়েছিল। বড়লাট আরউইন জবাব দিলেন 'হ্যাঁ'।

১৯২৭ সালের ৮ নভেম্বর সাইমন কমিশন সংক্রান্ত এই দলিল প্রকাশ করা হল। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিল। সঙ্কটকালে ধনিকশ্রেণী ও বিত্তশালী মধ্যবিত্তশ্রেণী পরিত্রাতারূপে গান্ধীজীর নেতৃত্ব মেনে নিল। সাধারণ মানুষও তাঁর উপরেই ভরসা রাখল।

১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধীজী আবার কংগ্রেসের হাল ধরলেন।

ইতিমধ্যে গরম গরম বুলি ঝেড়ে কিছু হবে না বলে তিনি বামপন্থী কংগ্রেসীদের দাবিয়ে দিয়েছিলেন। 'স্বাধীনতা'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি কূট তর্ক তুলেছিলেন। তাড়াহুড়ো করে খাড়া করা এবং না ভেবেচিন্তে পাশ করা স্বাধীনতা প্রস্তাবে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। (দ্রঃ 'ইয়ং ইন্‌ডিয়া'য় প্রকাশিত প্রবন্ধ, ১২ জানুয়ারি, ১৯২৮)

কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধীজী সুকৌশলে কংগ্রেসে বাম-দক্ষিণ বিরোধের ফয়সালা করলেন এমনভাবে যার ফলে কার্যত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব ধামাচাপা রইল এবং নেহরু রিপোর্টের ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্বশাসিত ভারত সংক্রান্ত সুপারিশ মেনে নেওয়া হল। তবু দেশব্যাপী

বিক্ষোভের দিকে দৃষ্টি রেখে গান্ধীজী বামপন্থীদের সঙ্গে আপস করতে বাধ্য হলেন। তাঁকে বলতে হল যে এক বছরের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার তাঁদের প্রস্তাব মেনে না নিলে দেশ আবার অহিংস অ-সহযোগ আন্দোলন শুরু করবে। সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল গান্ধীজীর আবেদন অগ্রাহ্য করে পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য এখনই ঘোষণা করতে হবে এই মর্মে এক সংশোধনী আনলেন।

১৩৫০-৯৭৩ ভোটে সংশোধনী অগ্রাহ্য হয়ে গেল।

গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত আন্দোলন শুরু করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু দীর্ঘ এক বছর সময় দেবার ফলে সাম্রাজ্যবাদী সরকার আঘাত হানার সুযোগ পেয়ে গেল।

এদিকে মতিলাল নেহরু তরুণদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, "জাতির ইতিহাসে একটা বছর কিছুই না।" আর গান্ধীজী তাঁর কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রস্তাবে গঠন-মূলক কাজের উপর জোর দিলেন।

ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের মধ্যে বড়রকমের পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল।

নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য সকল দলের নেতারাই উদ্যোগী হয়েছিলেন।

মুসলিম রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনে যোগ দেওয়া উচিত কি উচিত নয় এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এই প্রশ্নে মুসলমান সমাজে মতভেদ ক্রমেই তীব্র আকার ধারণ করতে থাকে। মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে মুসলমানরা কয়েকটি শর্তে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী হয়েছিল এবং কংগ্রেসও শর্তগুলি মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ১৯২৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হল না।

কলকাতা কংগ্রেসে ৫০ হাজার শ্রমিকের অভিযান এবং শ্রমিকদের অবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ভারতবর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। সেই প্রথম "স্বাধীন ভারতবর্ষের সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র" প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ঘোষিত হল। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম এক নতুন রূপ লাভ করল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সবকিছু লক্ষ্য করছিল। গান্ধীজী আবার নতুন করে আন্দোলন শুরু করতে যাচ্ছেন দেখে তারা বিচলিত হল এই

কারণে যে কংগ্রেসের অহিংস গণ-আন্দোলন এবার ভিন্নরূপ ধারণ করতে পারে। অক্টোবর মহা-বিপ্লবের চিন্তাধারা ভারতবর্ষে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকায় এবং কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রবাদীদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদীরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। গান্ধীজীর মত নেতা অবস্থা আয়ত্তে রাখতে পারবেন কিনা এই সন্দেহ তাদের মনে জেগেছিল। তবু গান্ধীজীর কার্যকলাপ তাদের আশ্বস্ত করেছিল। তারা বুঝেছিল যে গান্ধীজী একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদ, গণ-আন্দোলন কিভাবে সৃষ্টি করতে হয় তা' তিনি জানেন, আবার কিভাবে তা' নিয়ন্ত্রিত ও সংযত করতে হয় তাও তাঁর জানা আছে। কাজেই এইরকম একজন নেতার সঙ্গে মোকাবিলা করাই বাঞ্ছনীয়। কমিউনিস্ট ও সমাজবাদীদের প্রভাব বৃদ্ধি, শ্রমিকশ্রেণীর যুগপৎ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলন ধনিকশ্রেণীকে দিশাহারা করে তুলেছিল। বিত্তশালী মধ্যবিত্তরাও অস্বস্তি বোধ করছিলেন। এক সংকট মুহূর্তে গান্ধীজীই তাদের একমাত্র ভরসা হয়ে দাঁড়ালেন। গান্ধীজীই বর্তমান বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে কিছুটা ক্ষমতা আদায় করে দিতে পারবেন এই আশা তাদের মনে জাগল।

—সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মনে গান্ধীজী খুব ভরসা জাগাতে পারলেন না। শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের একাংশ ঝুঁকলেন সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে এবং আর এক অংশ ঝুঁকলেন কমিউনিজমের দিকে। জনগণকে বিপ্লবের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই উভয় অংশের লক্ষ্য হল। কিন্তু গান্ধীজীকে বাদ দিয়ে চলার মত শক্তি তাদের ছিল না। কাজেই গান্ধীজীর নেতৃত্বে কি ধরণের আন্দোলন শুরু হয় এবং কিভাবে তা কাজে লাগানো যায় তার অপেক্ষায় তারা রইলেন।

ভারতবর্ষের জনগণের মনের গভীরে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব যে কতটা বদ্ধমূল তা গান্ধীজী জানতেন। তাঁর আধ্যাত্মিকতা, তাঁর নীতিবোধ সবকিছুই ভারতীয় জনগণের আধ্যাত্মিকতা ও নীতিবোধের প্রতিফলন মাত্র। আর এই কারণেই কোটি কোটি নিরক্ষর মানুষের কাছে গান্ধীজী দেবতারূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন। গান্ধীজীর প্রথম ব্যর্থতা তাঁর মাহাত্মকে খর্ব করতে পারেনি।

"গান্হী মহারাজ, পুরনো গান্হী বাওয়া হঠাৎ কবে থেকে মহাৎমাজী হয়ে গিয়েছেন।

…নৃপ পাপ পরায়ণ ধর্ম নঁহী।[১]
করি দণ্ড বিড়ম্ব প্রজা নিতঁহী॥

সাধে কি আর মহাৎমাজী 'রংরেজে'র নিমক খেতে বারণ করেছেন। সব দেখতে পান তিনি।"

(ঢোঁড়াই চরিত মানস: প্রথম চরণ, সতীনাথ গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৪-১২৫ শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত)

(২)

যাই হোক সুভাষচন্দ্র এই সময় থেকেই গান্ধীজীর নেতৃত্বে আস্থা হারাতে থাকেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ইতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্র তাঁর নেতিবাচক দিকগুলির প্রতিও অঙ্গুলী নির্দেশ করেছেন। তিনি গান্ধীজীর তিনটি গুরুতর ভুলের উল্লেখ করেছেন তাঁর "ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে।"

প্রথমত, গান্ধীজীর হাতে নেতৃত্ব কেন্দ্রীভূত হওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, এক বছরের মধ্যে 'স্বরাজ' লাভের প্রতিশ্রুতি দেওয়া শুধু যে অ-বিজ্ঞোচিত হয়েছিল তা নয় ছেলেমানুষিও হয়েছিল এবং তৃতীয়ত, ভারতীয় রাজনীতিতে খিলাফত-এর প্রশ্নটি ঢোকানো দুর্ভাগ্যজনক হয়েছিল।

এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতভেদ তীব্র হয়ে দেখা দেয়।

সুভাষচন্দ্র হাত গুটিয়ে বসে থাকার চাইতে দেশবন্ধুর আইনসভায় প্রবেশের কর্মসূচী গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। কিন্তু এই ধরনের আন্দোলনে তাঁর কোন আস্থা ছিল না। তিনি বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ স্থাপনে উদ্যোগী হলেন।

এ সময় (১৯২৩ সালের মাঝামাঝি) কলকাতায় চেরী প্রেসে সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের এটা বড় আড্ডা গড়ে উঠেছিল। এখানে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সুভাষচন্দ্রের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তিনি

১। রাজা পাপপরায়ণ তার ধর্ম নেই।
প্রজাদের দণ্ড দিয়ে বিড়ম্বনা বেদে।—তুলসী দাস

তখন সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করছিলেন 'আত্মশক্তি' পত্রিকায়। গান্ধীজীর আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে বিদ্রূপ করে উপেন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

"স্বয়ং মহাত্মাজী বারদৌলি তালুকে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সারা দেশ উদগ্রীব হইয়া দিন গুন্‌তে লাগিল এমন সময় চৌরি-চৌরার লঙ্কাকাণ্ডে প্রমাণ হইয়া গেল যে, এ দেশের লোকগুলা সাতশত বৎসরের শিক্ষানবিস সত্বেও অহিংসা সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারে নাই। এক ঘটি দুধের মধ্যে এক ফোঁটা গোমূত্র পড়িয়া সব মাটি করিয়া দিল।" (উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ, বসুমতী সং, বর্তমান সমস্যা, পৃঃ ১১)

এই প্রবন্ধের শেষাংশে তিনি লেখেন : "কংগ্রেসের কার্য-প্রণালী এরূপভাবে যদি পরিবর্তিত করিতে পারা যায় যে, কৃষক ও শ্রমজীবীদিগের অভাব অভিযোগের প্রতিকার তাহার দ্বারা হইতে পারে, তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত হওয়াও অসম্ভব নহে।"

এ ছাড়া উপেন্দ্রনাথ নতুন দল গড়ার প্রস্তাবও করেছিলেন।

স্বভাবতই সুভাষচন্দ্র উপেন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। অনুশীলন দল সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকছে দেখে উপেন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে অনুশীলনের নেতাদের যোগ স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। অনুশীলন দল সুভাষচন্দ্রকে 'যুগান্তর' দলের প্রভাব থেকে মুক্ত করে তাদের দলের নেতারূপে বরণ করার জন্যে উদগ্রীব হয়েছিল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন পূর্ববঙ্গ সফরে বেরলেন তখন তাঁর সঙ্গে গেলেন সুভাষচন্দ্র ও কিরণশঙ্কর। উপেন্দ্রনাথও সঙ্গে থাকলেন। এই সময় জীবনলাল চ্যাটার্জী বিক্রমপুরে এক রাজনৈতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। সেই সম্মেলন চলাকালে রাতের অন্ধকারে অনুশীলন দলের নেতা প্রতুল গাঙ্গুলীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র ও উপেন্দ্রনাথের আলোচনা হয়। কিন্তু ফল কিছু হয়নি। কারণ চিত্তরঞ্জনের প্রতি সুভাষচন্দ্রের আনুগত্য ছিল অসীম, আবার 'যুগান্তর' দলই ছিল চিত্তরঞ্জনের শক্তিশালী সমর্থক দল। কাজেই সুভাষচন্দ্র অনুশীলন দলের সঙ্গে হাত মেলাতে পারলেন না। 'যুগান্তর' দলও সতর্ক ছিল। সুভাষচন্দ্রকে পাকাপাকিভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে যুগান্তর দলের নেতারা সুভাষচন্দ্রকে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ করার প্রস্তাব করলেন।

কিন্তু দেশবন্ধু, স্বরাজ্য দল কর্পোরেশন দখল করার পর, বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে প্রধান কর্মাধ্যক্ষ নিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

বীরেন্দ্রনাথ ১৯২১ সালে গান্ধীজীর অ-সহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার আগেই মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে সাফল্যলাভ করে দেশবরেণ্য নেতা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন এ ছাড়া তিনি আইনজীবী রূপেও খ্যাতি লাভ করেছিলেন এবং স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত আইনকানুন ও অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। দেশবন্ধু উপযুক্ত লোকই নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু 'যুগান্তর' দল বিপদ গুনল। বীরেন শাসমলের মত স্বাধীনচেতা মানুষকে বাগে এনে দলের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা সম্ভব ছিল না। তাই সুভাষচন্দ্রকে প্রধান কর্মাধ্যক্ষ নিয়োগ করার প্রস্তাব নিয়ে দলের নেতারা বাসন্তী দেবীর কাছে ধরনা দিলেন। সুভাষচন্দ্র বাসন্তী দেবীর অত্যন্ত স্নেহভাজন। বাসন্তী দেবী দেশবন্ধুকে চেপে ধরলেন। দেশবন্ধু ব্যাপারটা বুঝেছিলেন। যুগান্তর দলকে চটানো তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি রাজী হয়ে গেলেন।

প্রত্যাখ্যাত বীরেন্দ্র শাসমল অপমানিত বোধ করে বিপ্লবীদের উপর রুষ্ট হলেন এবং বিপ্লবীদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে বসলেন। এ নিয়ে তখন খুব হৈচৈ হয়েছিল।

ইতিমধ্যে আবার ধরপাকড়ের হিড়িক পড়ে গেল। গোপীনাথ সাহার ব্যাপার নিয়ে হৈচৈ করার জন্যে সুভাষচন্দ্রের নাম পুলিসের খাতায় উঠে গিয়েছিল। ১৯২৪ সালের ২৫ অক্টোবর সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হলেন। গ্রেপ্তার হলেন স্বরাজ্য দল ও যুগান্তর দলের বহু শীর্ষস্থানীয় নেতা।

বাংলার বিভিন্ন জেলে বন্দী রাখার পর সুভাষচন্দ্র ও বিপ্লবী নেতাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় বর্মায়।

এ সময় বাংলা তথা ভারতবর্ষের সর্বত্রই রাজনৈতিক আন্দোলনে ভাঁটা পড়েছিল। বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে কলহ দেশের আবহাওয়াকে কলুষিত করে তুলেছিল। ১৯২৫ সালের ১৬ জুন দেশবন্ধুর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে দেশের আবহাওয়ার দ্রুত অবনতি ঘটতে শুরু করেছিল।

জাতীয় আন্দোলনে ভাঁটা পড়েছে দেখে সরকার আশ্বস্ত হয়েছিল। ১৯২৭ সালে রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়ার কাজ শুরু হল।

১৯২৭ সালের ১৬ মে সুভাষচন্দ্র মুক্তি লাভ করলেন।

দেশে ফিরে সুভাষচন্দ্র ও 'যুগান্তর' দলের নেতারা দেখলেন যে গান্ধীজী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে 'ত্রিমুকুট' পরিয়ে কংগ্রেসের একচ্ছত্র নেতা করে দিয়ে গেছেন।

'যুগান্তর' দল কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য সক্রিয় হয় উঠল। ফলে অনুশীলন দলের সঙ্গে বিরোধ আবার তীব্র আকার ধারণ করল। সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন দুই দলের দ্বন্দ্বের মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন। এর ফলে বাংলার তৎকালীন রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করলেন 'পঞ্চ প্রধান' (বিগ ফাইভ): ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, তুলসী গোঁসাই, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও শরৎচন্দ্র বসু।

স্বরাজ্য দলে এঁরাই ছিলেন দেশবন্ধুর বিশ্বস্ত অনুগামী ও পরামর্শদাতা। বিত্তশালী এই পাঁচ নেতা স্বরাজ্য দল তথা কংগ্রেসের হাল ধরেছিলেন।

যুগান্তর দলের সাহায্যেই প্রধানত দেশবন্ধু স্বরাজ্য দল গড়তে পেরেছিলেন কাজেই পঞ্চপ্রধানের সঙ্গে যুগান্তর দলের সুসম্পর্ক অক্ষুন্ন ছিল।

সুভাষচন্দ্রকে সর্বভারতীয় নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুগান্তর দলের চেষ্টা যুগান্তর-অনুশীলন তথা সুভাষ-যতীন্দ্রমোহন দ্বন্দ্বকে কিরকম রাজনৈতিক রূপ দিয়েছিল তা উল্লেখ করে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন:

"…কংগ্রেসের ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের লড়াই বাংলা দেশে, সেনগুপ্ত-সুভাষ লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে বিরাট আকার ধারণ করল। সরস্বতী প্রেস থেকে তখন "স্বাধীনতা" নামক সাপ্তাহিক কাগজ বেরিয়েছে। তাতে একবার লেখা হল, আসলে সেনগুপ্ত-সুভাষ লড়াইটা হচ্ছে ব্রিটিশ ইম্পিরিয়্যালিজমের সঙ্গে স্বাধীনতাবাদী কংগ্রেসের লড়াই—সেনগুপ্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির লোক সুতরাং হাইকম্যাণ্ডের ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের পক্ষপাতী। আর তার মানেই ব্রিটিশ ইম্পিরিয়্যালিজমের বন্ধু; আর সুভাষবাবু ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের প্রতীক। সুতরাং ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস ফল ত ব্রিটিশ ইম্পিরিয়্যালিজমের শত্রু।"

(বিপ্লবের সন্ধানে: পৃঃ ১৪৯)

যাইহোক, সুভাষচন্দ্র খুব সতর্কভাবে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক মতও এই সময় একটা রূপ পরিগ্রহ করছিল। সমাজতন্ত্রবাদ, ফ্যাসিবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদকে তিনি বোঝবার চেষ্টা করছিলেন।

যুগান্তর দল তাঁর সমর্থক হলেও তিনি শুধু যুগান্তর দলের উপর ভরসা রাখেন নি। অনুশীলন দল গোড়া থেকেই গান্ধীজীর কর্মনীতির বিরোধী ছিল, কাজেই গান্ধীজীর প্রতি বিশ্বস্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের উপর অনুশীলনের নেতারা ভরসা রাখতে পারছিলেন না। ফলে দুই দলই সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিল। সুভাষচন্দ্র তখন বাংলার রাজনীতি সম্পর্কে রীতিমত ওয়াকিবহাল, কাজেই কোন দলকেই তিনি চটালেন না।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত সাইমন কমিশন সারা দেশে বিক্ষোভের ঢেউ তুলল। দলমতনির্বিশেষে সকলেই এর বিরোধিতা করলেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই দলাদলি ও কোন্দল মিটিয়ে দেশকে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করল। সাম্প্রদায়িক বিরোধেরও অবসান ঘটল। দেশে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করল।

১৯২৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করে সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল সর্ব-ভারতীয় নেতারূপে স্বীকৃতি লাভ করলেন।

এই সময়েই প্রথম গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতবিরোধ স্পষ্টরূপে আত্ম-প্রকাশ করে। তরুণদের নেতারূপে সুভাষচন্দ্র সারা ভারত যুব সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে তাঁর ভাষণে রাজনীতির ধুলোমাটি ও ঝড়ঝাপটা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য যারা পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন তাদের তীব্র সমালোচনা করে যুগান্তর দলের নেতাদের রীতিমত চমকে দিয়েছিলেন। কারণ তখনও (এবং পরেও) যুগান্তরের নেতাদের অরবিন্দ ভক্তি অটুট ছিল। সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকেও চটিয়ে ছিলেন আবার যুগান্তর দলকেও বিব্রত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এ সময় সুভাষচন্দ্র তাঁর শক্তি ও প্রভাবকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করেই অগ্রসর হচ্ছিলেন। কাজেই কোন-পক্ষকেই তিনি পরোয়া করেন নি। গান্ধীজী কলকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সামরিক পরিচ্ছদ পরিহিত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ও সামরিক কায়দাকানুন

লক্ষ্য করে কলকাতা কংগ্রেসকে 'সার্কাস' বলে মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর সংযমের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত গান্ধীভক্ত লোকও গান্ধীজীর এই ধরনের মন্তব্যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

যুগান্তরের নেতাদের ধারণা হয়েছিল যে, তারাই সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের নরমপন্থী প্রবীণ নেতাদের খপ্পর থেকে ছাড়িয়ে আনতে পেরেছিলেন (দ্রঃ ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি", ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৯৫), কিন্তু ধারণাটা ঠিক নয়। সুভাষচন্দ্র তাদের সমর্থনলাভের উদ্দেশ্যেই যুগান্তরের নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন এবং কোন কোন বিষয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম নেতারূপে আবির্ভূত হয়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও ছাত্র আন্দোলনেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে লাগলেন। আবার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করে চলতে লাগলেন।

যুগান্তর ও অনুশীলন উভয় দলের নেতারা এখন থেকে সুভাষচন্দ্রকে রীতিমত সমীহ করে চলতে থাকলেন। চৌরি-চৌরার ঘটনা হল কষ্টিপাথরে যাচাই। যাতে দেখা গেল যে, কী গান্ধীজী, কী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র, কী বাংলার বিপ্লবী নেতারা কেউই তাঁদের শ্রেণীগণ্ডী অতিক্রম করতে পারেন নি।

গান্ধীজী তাঁর অহিংস আন্দোলন কলুষিত করার অভিযোগে চৌরি-চৌরার সংগ্রামী কৃষকদের ধিক্কার দিলেন। দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র চৌরি-চৌরা হাঙ্গামার অজুহাতে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করায় রুষ্ট হলেন, কিন্তু কৃষকদের সম্পর্কে একটি কথাও বললেন না এবং বাংলার বিপ্লবীরাও চৌরি-চৌরার বীর কৃষকদের সম্পর্কে নীরব রইলেন।

যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মেরুদণ্ড হল কৃষককুল, তাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও আত্মদান সম্পর্কে ভারতবর্ষের জাতীয় নেতাদের এই উপেক্ষা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হলেন জীবনলাল চ্যাটার্জী। যুগান্তরের কর্মী হলেও তিনি তখন কমিউনিজম-এর দিকে ঝুঁকেছেন এবং স্বরাজ্য দলের কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে 'ভ্যানগার্ড' পত্রিকাও বিক্রি করতেন। জীবনলাল নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মধুপুর, দেওঘর, জামসেদপুর, লক্ষ্মী-সরাই প্রভৃতি অঞ্চলে ঘুরে মুন্সীগঞ্জে

নিজেদের কর্মস্থলে পৌঁছিয়ে চৌরি-চৌরায় ১৭২ জন কৃষকের মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদে এক বিরাট জনসভা করেন।

(৩)

বাংলার বিপ্লবী দলগুলির অবস্থা ও মনোভাব সম্পর্কে জানতে হলে এই সময়কার রাজনৈতিক অবস্থা অনুধাবন করা দরকার।

এ সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন বাংলার একচ্ছত্র নেতা। গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে চৌরি-চৌরার ঘটনার পর। দেশবন্ধু স্বরাজ্য দল গঠনে উদ্যোগী হলে সুভাষচন্দ্র ও যুগান্তর দল তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যুগান্তর দলের ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হয়ে ওঠে।

বাংলায় বিপ্লববাদী তৎপরতার সূচনাকাল থেকেই চিত্তরঞ্জন বিপ্লবকামীদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন সমিতির তিনি ছিলেন অন্যতম কর্মকর্তা। মাণিকতলা বোমার মামলায় অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করে আইনজীবীরূপে চিত্তরঞ্জন খ্যাতি লাভ করেন এবং বিপ্লবীদের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সমর্থন করতেন না।

বাংলার বিপ্লবীদের সম্পর্কে তিনি তাঁর অভিমত অকপটে ব্যক্ত করেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি বলেছিলেন: "এদের অনেককে আমি অত্যন্ত ভালবাসি, কিন্তু এদের কাজ দেশের পক্ষে ভয়ানক মারাত্মক। এই অ্যাকটিভিটিতে সমস্ত দেশ অন্তত পঁচিশ বছর পেছিয়ে যাবে। তা ছাড়া এর মস্ত দোষ এই যে, স্বরাজ পাবার পরেও এ জিনিস যাবে না, তখন আরও স্পর্ধিত হয়ে উঠবে, সামান্য মতভেদে একেবারে 'সিভিল ওয়ার' বেধে যাবে। খুনোখুনি, রক্তারক্তি আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি, শরৎবাবু।" (স্মৃতিকথা, শরৎ রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩২)

গান্ধীজীর চেষ্টায় 'যুগান্তর' দল কংগ্রেসে যোগ দিলে চিত্তরঞ্জন খুশি হয়েছিলেন। কারণ এর ফলে বাংলায় তথা ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁরই শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। অ-সহযোগ আন্দোলনের সময় 'যুগান্তর' দল বাংলায় কংগ্রেস সংগঠনকে মজবুত করে গড়ে তোলে। চিত্তরঞ্জন তাদের এই তৎপরতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। এর উপর আইনসভায় প্রবেশের প্রশ্ন নিয়ে

গান্ধীজী ও তাঁর সমর্থকদের মধ্যে প্রবল বিরোধ দেখা দিলে 'যুগান্তর' দল যখন তাঁকে সর্বতোভাবে সমর্থন করল তখন তিনি 'যুগান্তর' দলকে তাঁর কাছে টেনে নিলেন। চিত্তরঞ্জনের 'স্বরাজ্য দল' গঠনের সমস্ত দায়িত্ব তিনি 'যুগান্তর' দলের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল।

'যুগান্তর' দল এই সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে সারা বাংলায় নিজেদের সংগঠন গড়ে তুলতে সমর্থ হল। সুভাষচন্দ্রকেও তারা তাদের সংগঠনশক্তির জোরে প্রভাবিত করে দলের প্রকাশ্য নেতারূপে গ্রহণ করলেন।

'যুগান্তর' দলের জন্যেই তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের কর্মকর্তা হতে পারেন নি জানতে পেরে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ক্ষেপে গিয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি বলে বসলেন, 'বিপ্লবীরা দেশের জন্যে ডাকাতি শুরু করে শেষ পর্যন্ত পেশাদার চোর-ডাকাতে পরিণত হয়েছে।'

দেশপ্রাণ শাসমলের এই মন্তব্য বিপ্লবী মহলে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল এবং এই সময় থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে নানারকম কুৎসা রটাতে থাকে। বিপ্লবী মহলের একাংশ এমন শাসমলবিদ্বেষী হয়ে ওঠে যে, রাজনৈতিক মামলায় বীরেন্দ্রনাথের মত অভিজ্ঞ আইনজীবীর সাহায্য গ্রহণ করতেও তারা গররাজী হয়। প্রদ্যোৎকুমারের মামলা এর একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত।

বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে নিয়ে যে বাদ-বিতণ্ডা সে যুগে শুরু হয়েছিল আজও তার জের চলছে।

(১৯৮২ সালের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিপত্রই এর প্রমাণ)।

বাংলার কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের একাংশও বীরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করতে কসুর করে নি।

যাই হোক, 'যুগান্তর' দল এইভাবে পুরোপুরি বুর্জোয়া রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে নেমে পড়ল। বিপ্লবের আদর্শ, লক্ষ্য সবই তখন পরিত্যক্ত।

'যুগান্তর' দলের বহু কর্মী ও সমর্থক কলকাতা কর্পোরেশনে চাকরি পেলেন। কিন্তু দলের নেতাদের আশা পূর্ণ হল না। "বড় চাকরি বণ্টন মারফৎ দলের কিছু অর্থসংস্থানের আশা স্বাভাবিক। কিন্তু চাকরি বণ্টনের পরে দেখা যায়, অনুগত অনুগৃহীত বিপ্লবের বন্ধু 'কালেভদ্রে' কিছু চাঁদা এবং মাঝে মাঝে কিছু চা-সিঙ্গাড়া ছাড়া বিপ্লবের জন্যে আর কিছু ছাড়তে নারাজ।" (বিপ্লবের সন্ধানে —নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৮৯)

দলের অবস্থা লক্ষ্য করে বিক্ষুব্ধ ডাঃ যদুগোপাল লিখেছেন : "কর্পোরেশনে স্বরাজ্য পার্টির ঢোকা শেষ পর্যন্ত দেশের রাজনীতির পক্ষে অকল্যাণকর হয়েছে। বাংলার রাজনীতি তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে আর আত্মকলহে আমাদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ নিয়োজিত হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদ তেমন ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করে নি। বাংলার যত নেতা আপনার এলাকা ছেড়ে এই দিকে চেয়ে থেকেছেন ও কলকাতায় থেকে সময় নষ্ট ও কার্যহানি করতে বাধ্য হয়েছেন। বহু ভালো লোকের দুর্নাম হবার কারণ এই কর্পোরেশনী রাজনীতি। বহু সুনামের জ্যান্ত কবর এখানে হয়েছে। যে পার্টি ফাণ্ড বা দলের ভাণ্ডারের আশায় এখানে যাওয়া হয়েছিল তা নিষ্ফল হয়েছে। বাজারে রব উঠেছে পার্টি ফাণ্ড নয়, পকেট ফাণ্ড।'

(বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি---পৃঃ ৪২০-৪২১)

এদিকে অ-সহযোগ আন্দোলনের কালে ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান 'অনুশীলন' দলের চোখ খুলে দিয়েছিল। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে 'অনুশীলন' দল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অবশ্য এ ব্যাপারে চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য দল গঠনেরও একটা বড় ভূমিকা ছিল। সম্ভবত 'অনুশীলন' দলের নেতারা দেশবন্ধুর গান্ধী-বিরোধী কর্মপন্থা অনুসরণে উৎসাহিত বোধ করেছিল। এছাড়া যুগান্তর দলের প্রভাব প্রতিপত্তি তাদের স্তম্ভিত করে তুলেছিল। তাই গয়া কংগ্রেসের অধিবেনকালে পুলিনবিহারী দাসের ঘাড়ে কংগ্রেস-বিরোধিতার সব দোষ চাপিয়ে 'অনুশীলন' দলের চারজন নেতা প্রতুল গাঙ্গুলী, নরেন্দ্রমোহন সেন, রমেশচন্দ্র আচার্য ও রমেশচন্দ্র চৌধুরী তাঁদের স্বাক্ষরিত এক ইস্তাহার বের করে পাপস্খলন করলেন।

সাম্রাজ্যবাদী সরকার ঘুমিয়ে ছিল না। স্বরাজ্য দলের পিছনে বিপ্লবীরা রয়েছে দেখে সরকার উদ্বিগ্ন হয়েছিল এবং আঘাত হানার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে প্ররোচক চর (এজেণ্ট প্রভোকেটার) নিয়োগ করে সরকারপক্ষ কিছু সন্ত্রাসবাদী তরুণকে ফাঁদে ফেলতে সক্ষম হয়। শাঁখারিটোলা পোস্ট অফিস ডাকাতি ও সোনা ডাকাতিতে এর পরিণতি ঘটে।

১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের বিশেষ দিল্লী অধিবেশনে গান্ধীজী ও চিত্তরঞ্জনের মধ্যে আপস-রফা কালেই বাংলার ১৭ জন বিপ্লবী নেতার নামে ৩ নং রেগুলেশন ওয়ারেণ্ট জারি হয় এবং ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, জ্যোতিষ ঘোষ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, প্রতুল গাঙ্গুলী, জীবনলাল চ্যাটার্জী,

সতীশ পাকড়াশী, বিপিন গাঙ্গুলী, ভূপতি মজুমদার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে গোপী-শা নামে এক তরুণ টেগার্ট সাহেব ভ্রমে আর্নেস্ট ডে নামক একজন নিরীহ শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোককে হত্যা করে। সঙ্গে সঙ্গে অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, কিরণ মুখোপাধ্যায়, সতীশ চক্রবর্তী, গোপেন রায় ও অরুণ গুহকে ঐ আইনেই বন্দী করা হয়।

কংগ্রেস ও বিপ্লবী সংগঠন একই সঙ্গে বজায় রেখে কর্মতৎপরতা চালানোর চেষ্টা সরকার এইভাবে প্রতিহত করে।

সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সুপরিকল্পিত আক্রমণে বিপর্যস্ত বিপ্লবীরা উপলব্ধি করলেন যে, মিলেমিশে কাজ না করলে পস্তাতে হবে। 'অনুশীলন' দলই সবচেয়ে বিপাকে পড়েছিল। 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে মিটমাট করে কেবলমাত্র গুছিয়ে বসতে না বসতেই সরকার আঘাত হানায় নেতারা খুব মুশকিলে পড়ে গিয়েছিলেন। এছাড়া অ-সহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করার কালেই দলের মধ্যে ভাঙ্গন ধরেছিল। যশোর-খুলনায় 'অনুশীলন' দলের অধিকাংশ কর্মী 'যশোর-খুলনা যুব সমিতি' গঠন করে দলের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখেই স্বতন্ত্র হয়ে যান এবং অ-সহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেন। এই অবস্থায় 'অনুশীলনে'র নেতারা বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবশ্যকতা উপলব্ধি করলেন। মেদিনীপুর জেলে 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলনে'র নেতাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হল। 'যুগান্তরে'র পক্ষে ডাক্তার যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও নরেশ চৌধুরী এবং 'অনুশীলনে'র পক্ষে প্রতুল গাঙ্গুলী ও ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ) একত্রে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে দুটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হল: (১) সামরিক ধাঁচে সারা দেশে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ও (২) 'বিদেশী সরকারকে মনি না' এই আন্দোলন।

উভয় বিপ্লবী দলকে ঐক্যবদ্ধ করার তৃতীয় চেষ্টা সফল হল মনে করেছিলেন ডাঃ যাদুগোপাল, কিন্তু তাঁর এই ধারণা পরে ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। স্বরাজ্য দলকে তথা বিপ্লবী দলগুলিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সরকার যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল তার আর একটি কারণও ছিল। অক্টোবর মহা-বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী

শক্তিবর্গের মনে দারুণ আতঙ্ক জাগিয়েছিল। ১৯২১ সালে ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তন এবং 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের (তখন তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যতম নেতা) যোগ সরকারকে বিচলিত করে তোলে। জেলে জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসার ডাঃ যদুগোপালকে জানান যে, রুশিয়ার সঙ্গে বিপ্লবীদের যোগ স্থাপিত হয়েছে জেনেই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এই সময় থেকেই একদিকে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন এবং অপরদিকে কমিউনিজম-এর প্রভাব বিপ্লবী দলগুলির নেতাদের মধ্যে—নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় "দাদাদের মধ্যে রীতিমত ভাব-বিরোধের সৃষ্টি করেছিল।"

প্রকৃতপক্ষে এ সময় বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে রীতিমত সংকট দেখা দেয়।

সশস্ত্র বিপ্লবের লক্ষ্য ত্যাগ করা হচ্ছে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়, কিছু সংখ্যক প্রবীণ ও তরুণ বিপ্লবীর মনে। ফলে 'বিদ্রোহী সংসদ' গঠিত হয় যার ফলে সরকারের আঘাত হানার সুযোগ হয়, আবার অন্যদিকে 'যুগান্তর' দলের নেতারা আরও বেশি করে কংগ্রেসের দিকে ঝোঁকেন। 'অনুশীলন' দল 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেও নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং বিপ্লবী কর্মতৎপরতাও চালিয়ে যায়।

গান্ধীজীর আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল। এক বছরের মধ্যে স্বরাজ মেলেনি। কাজেই 'যুগান্তর' দলের আর কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না, তবু সশস্ত্র বিপ্লবের পথে 'যুগান্তর' পা বাড়ালো না।

অবশ্য, বিপ্লবী সংগঠনগুলি—প্রধানত আশ্রমের আকারে—বজায় রাখা হয়েছিল। 'যুগান্তর' দল এ সময় ভরসা রেখেছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উপর।

১৯২৪ সালে শচীন সান্যাল উত্তরপ্রদেশ থেকে কলকাতায় আসেন এবং 'অনুশীলন' দলের সহযোগিতায় এক নতুন বিপ্লবীদল গড়ে তোলেন—এর নাম হয় 'হিন্দুস্থান সেবা দল'।

এই সময় থেকে বাংলায় এক বিচিত্র ও জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। কংগ্রেসের মাধ্যমে নিজ নিজ দলের প্রভাব বিস্তার ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন' দল তীব্র প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে, তরুণ কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে থাকে, এখানে ওখানে ছোট ছোট বিপ্লবীদল গড়ে উঠতে

থাকে, আর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপার নিয়ে খুনোখুনি পর্যন্ত হয়। স্বরাজ্য পার্টির ভাবমূর্তিও ক্রমে ম্লান হয়ে আসতে থাকে।

'যুগান্তর' দলের বন্দী নেতারা চুপ করে বসে থাকেন নি। বর্মার বেসিক সেন্ট্রাল জেল থেকে ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও জীবনলাল চ্যাটার্জী 'মোমেরিয়াল টু হোয়াইট হল' নামে ২৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক বিবরণী সুকৌশলে বাইরে পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হন। এতে সরকারের প্ররোচক-চর সংক্রান্ত বহু তথ্য ফাঁস করে দেওয়া হয়। এর ফলে এদেশে ও বিদেশে খুব হৈ চৈ পড়ে যায় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বেশ বেকায়দায় পড়ে।

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে 'যুগান্তর' দলের এবং অবনী মুখার্জীর সঙ্গে 'অনুশীলন' দলের যোগ স্থাপিত হয় এই সময়েই। এর ফলে উভয় দলের মধ্যে যেমন রেষারেষি চলে তেমনই সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারাও উভয় দলকে প্রভাবিত করে। 'যুগান্তর' দল 'জনগণের জন্য স্বরাজে'র কথা বললেও কমিউনিজমকে গ্রহণ করতে রাজী হয় নি। আবার 'অনুশীলন' দল ঝুঁকে পড়ে ট্রটস্কিবাদের দিকে।

"মডারেট আর বিপ্লবপন্থীদের মত অসহযোগীরাও ভেবেছিলেন যে, দেশের অন্তত বার আনা লোককে বাদ দিয়ে তাঁরা ইংরেজ রাজত্বের চারটে খুঁটো সরিয়ে নিয়ে কাজ হাসিল করবেন।

কিন্তু তা হল না। যারা পেটের জ্বালায় ক্ষেপে উঠেছিল তারা চৌরি-চৌরায় আগুনের অক্ষরে অসহযোগের উপর লিখে দিলে—আমরা এখনও বেঁচে আছি; আমাদের বাদ দিলে চলবে না।"

(পথের সন্ধান—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ, বসুমতী সং)

চৌরি-চৌরায় 'আগুনের অক্ষরে' লেখা কথাগুলি সকলেরই চোখে পড়েছিল। ধনিক ও ভূম্যধিকারীদের বুক কেঁপে উঠেছিল, সাম্রাজ্যবাদীদের মুখ ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল এবং মধ্যবিত্তশ্রেণীও আতঙ্কিত হয়েছিল।

গান্ধীজী চৌরি-চৌরার কৃষকদের ধিক্কার দিলেন, অহিংসার উপর জোর দিলেন এবং সব কিছুর দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হলেন।

১৯২২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি কারারুদ্ধ জওহরলালকে গান্ধীজী লিখলেন… "বারুদে আগুন ধরিয়ে দেবার মত শক্তিশালী দিয়াশলাই-এর মত চৌরি-চৌরার

খবর এল এবং আগুন জ্বলল। আমি তোমাকে বলতে চাই যে, যদি আন্দোলন মুলতবী রাখা না হত তাহলে আমরা অহিংস সংগ্রাম নয়, মূলত সহিংস সংগ্রামেরই নেতৃত্ব করতাম।”

১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেস গান্ধীজীকে আরও সতর্ক করে দিল। তিনি বুঝলেন যে, নতুন শক্তির অভ্যুদয় ঘটেছে।

গান্ধীজী তাঁর কর্মনীতিতে অটল থেকেও নতুনকে স্বাগত জানালেন। নতুন শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে আনাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। যে গান্ধীজী গোপীনাথ সাহা সংক্রান্ত প্রস্তাব নিয়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিলেন সেই গান্ধীজীই ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পুলিস সুপার সনডার্স নিহত হওয়ার পর বলতে দ্বিধা করলেন না যে, “পাঞ্জাব সরকারের স্বৈরাচারী কর্মনীতির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যদি এই হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকে তা'হলে আমি আশ্চর্য হব না।”

সহিংস পন্থা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যাহত করবে এ কথা বলতেও গান্ধীজী ভুললেন না কিন্তু বিপ্লবীদের সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন তাঁর বিবৃতিতে লক্ষ্য করা যায়।

কমিউনিজম-এর প্রভাব যে তরুণদের উপর বাড়ছে তা' লক্ষ্য করে গান্ধীজী কমিউনিজম বা বলশেভিজমের নীতিতে নৈতিক দিক থেকে সমর্থন জানালেন, তবে অহিংস কর্মপন্থার মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধনের চেষ্টা করা উচিত এ কথা বলতেও ভুললেন না। বলশেভিকরা তাদের নীতি রূপায়িত করার জন্য হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করছে জেনে গান্ধীজী বললেন: “এমনটা যদি হয়ে থাকে তা'হলে আমার এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, বলশেভিক রাজ বর্তমান রূপে স্থায়ী হতে পারবে না। কারণ আমার দৃঢ় প্রত্যয় হল এই যে, হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত কোন কিছুই স্থায়ী হয় না।”

এরই সঙ্গে তিনি আদর্শের জন্য লেনিনের মত মানুষ সহ অসংখ্য নরনারীর অকুণ্ঠ আত্মত্যাগের উল্লেখ করে বললেন, “তাঁদের আত্মত্যাগ চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবে এবং কালক্রমে আদর্শকে ক্রত বিশুদ্ধ করে তুলবে।”

এইভাবে যখন গান্ধীজী নতুন ভাবধারার দিকে লক্ষ্য রেখে একটা মধ্যপন্থা অনুসরণের চেষ্টা করছেন ঠিক তখনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আঘাত হানল।

গান্ধীর এক পক্ষকাল বর্মা সফরকালে ভারতবর্ষে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব

হল। ১৯২৯ সালের ২০ মার্চ সরকার অকস্মাৎ সংগঠিত শ্রমিকদের উপর আঘাত হানল তাদের ৩৬ জন শ্রেষ্ঠ নেতাকে গ্রেপ্তার করে যাদের প্রায় অর্ধেকই ছিলেন কমিউনিস্ট। …এই গ্রেপ্তার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গান্ধীজী বললেন : "শ্রমিক নেতাদের বা তথাকথিত কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার প্রমাণ করল যে, সরকার আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে এবং এমন সব লক্ষণ প্রমাণ করেছে যা দেখতে আমরা অভ্যস্ত ও যা সন্ত্রাসবাদের কালের সূচনা করছে।… অবশ্য একটা বিচারের প্রহসন অনুষ্ঠিত হবে। অভিযুক্তরা যদি বুদ্ধিমান হন তাহলে ফাঁদে পা দেবেন না এবং আইনজীবীদের সাহায্য নিয়ে প্রহসন অনুষ্ঠানে সাহায্য করবেন না। বরং তাঁদের সাহসের সঙ্গে কারাবরণ করতে হবে। আর এই সময়েই হাজার হাজার লোকের মানা আসবে শুধু ঝুঁকি নিতে নয়, কারাদণ্ডের সম্মুখীন হতে ও তা বরণ করতে, যদি আইনের আবরণে এই আইনহীনতার রাজ্যের চিরতরে অবসান না ঘটে।

আমার মনে হয় যে, এইসব মামলার উদ্দেশ্য কমিউনিজম নিধন নয়, সন্ত্রাস সৃষ্টি করা।"

সরকারের আসল মতলব হল মুক্তি আন্দোলন দমন করা—দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথা ঘোষণা করে গান্ধীজী বললেন : "সরকার, এইসব কাজের দ্বারা যদি আমাদের আগামী বছর ব্যাপক আকারে আইন অমান্য আন্দোলন করতে হয় তাহলে, সেই আন্দোলনের পন্থাগুলি সুগম করে দিচ্ছে।"

(মহাত্মা টেনডুলকর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬)

গান্ধীজী পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, আপসের কোন আশা নেই এবং সাম্রাজ্যবাদ তার শক্তির পরিচয় দিতে দৃঢ় সঙ্কল্প, জনগণও তার মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত।

গান্ধীজী বুঝতে পেরেছিলেন যে এক নতুন চিন্তাধারা জনগণকে আন্দোলিত করছে, আঘাতের জবাবে আঘাত হানার জন্য জনগণ তৈরি হতে যাচ্ছে।

গান্ধীজী, জনগণ তাঁর অহিংস অ-সহযোগ আন্দোলন থেকে সরে যাবে, পথভ্রষ্ট হবে এই আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন।

তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে আমেদাবাদ, খেরা প্রভৃতি স্থানে জনগণ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের আক্রমণে উত্তেজিত হয়ে পালটা আঘাত হেনেছিল অমৃতসর ও কাসুরেও হাঙ্গামা হয়েছিল। সবশেষে ঘটেছিল

চৌরি-চৌরার সংঘর্ষ। গান্ধীজী অহিংস ও নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহ আন্দোলন থেকে পথভ্রষ্ট জনগণকে 'জনতা' (mob) বলে অভিহিত করেছিলেন এবং প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ ১৯১৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি পাঁচদিন অনশনে ছিলেন। তিনি আন্দোলনের ডাক দিয়ে 'হিমালয় প্রমাণ ভুল' করেছেন এমন কথাও বলেছিলেন।

কিন্তু এবার তাঁকে নতুন পরিস্থিতিতে তাঁর নিজস্ব আন্দোলনের ধারা বজায় রাখার জন্য নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দিল।

এদিকে সরকার মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা করার ও শ্রমিকবিরোধ আইন পাস করার সঙ্গে সঙ্গে জননিরাপত্তা আইন পাস করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। বাধা এল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি (অধ্যক্ষ) বিটলভাই প্যাটেলের দিক থেকে। তিনি জানালেন যে, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালে জননিরাপত্তা সংক্রান্ত বিলটি আলোচনা করতে দেওয়া যায় না। তাঁর আপত্তি অগ্রাহ্য করে সরকার ১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল জোর করে বিলটি পাস করিয়ে নিল। অধ্যক্ষ প্যাটেল সেইদিন যখন জননিরাপত্তা বিল সম্পর্কে তাঁর রুলিং দিতে ওঠেন সেই সময়েই দর্শক-গ্যাল্যারি থেকে দুটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয় এবং কাল ইস্তাহার ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অর্থমন্ত্রী স্যার জর্জ মুসটারের আসনের কাছেই বোমাটি ফাটে। হট্টগোলের মধ্যে সকলেই পালিয়ে যান। কেউ আহত হয় নি, হলেও আঘাত গুরুতর হয় নি। আসলে সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদেই দুটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, কাউকে হতাহত করার জন্য নয়। কিন্তু সরকার তখন উন্মত্ত। বড়লাট কঠোর সুরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের উভয় সভার যুক্ত অধিবেশনে অধ্যক্ষ কর্তৃক বিধিবহির্ভূত ঘোষিত জননিরাপত্তা বিলটি অধ্যাদেশ রূপে (অর্ডিন্যান্স) জারি করলেন। বোমার উল্লেখ করতেও বড়লাট ভুললেন না। বোমা নিক্ষেপের অভিযোগে আগেই ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

এই ঘটনার পরই গান্ধীজী মন্তব্য করেন : "বোমা নিক্ষেপকারীরা স্বাধীনতার নামে বোমা ছুঁড়ে সেই স্বাধীনতার আদর্শকেই হেয় করেছে।"

"সরকার যদি ঘাবড়ে গিয়ে পালটা পাগলামি করে তাহলে বোকামি করবে। তারা যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে বুঝবে যে, বোমা নিক্ষেপকারীদের উন্মত্ততার জন্য তারা কম দায়ী নয়।"

গান্ধীজী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, সরকার জনগণের দাবি মেনে নিলেই বোমাবাজীর ব্যাপার আর ঘটবে না। কিন্তু এরই সঙ্গে তিনি স্বীকার করলেন যে, "এই আশা করা বৃথা, কারণ সরকারের তা করার অর্থ হল শুধু অর্থনীতির পরিবর্তন নয় হৃদয়েরও পরিবর্তন। এমন কোন পরিবর্তন যে আসন্ন এমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।"

এই সময় গান্ধীজীর মনোভাব লক্ষ্য করলে পরিষ্কার দেখা যায় যে, তিনি কি কমিউনিস্ট কি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী কাউকেই তাঁর অহিংস নীতি পরিহার করার জন্য নিন্দা করেন নি, তিনি সবকিছুর জন্য সরাসরি দায়ী করেছেন সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে। শুধু তাই নয়, তিনি এই প্রথম স্বীকার করলেন যে, তাঁর অহিংস অ-সহযোগ আন্দোলন যার মূল কথা হল শত্রুপক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানো তা ব্যর্থ হয়েছে, সরকারের হৃদয় পরিবর্তনের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

এ সবই নতুন পরিস্থিতির দিকে তাঁর নীতিকে যারা পছন্দ করছে না অথচ যারা সত্যই মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে চায় তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাঁর কর্মসূচী বহাল রাখা।

১৯২৯ সালের ১২ জুন দিল্লীর ঐতিহাসিক মামলায় ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। তাঁদের বিবৃতি সারা দেশের মুক্তিকামী তরুণদের মনে আগুন জ্বালিয়ে দিল। সাম্যবাদ প্রভাবিত এই বিবৃতিতে শোনা গেল এক নতুন সুর—"বিপ্লব মানবজাতির অধিকার। স্বাধীনতা সকলেরই হরণের অযোগ্য জন্মগত অধিকার। শ্রমিকই হল সমাজের প্রকৃত ধারক। জনগণের সার্বভৌমত্বই হল শ্রমিকদের চূড়ান্ত ভবিতব্য। · ইনকিলাব জিন্দাবাদ।"

এর পরেই দমননীতির বিরুদ্ধে গর্জে উঠল লক্ষ লক্ষ শ্রমিক। ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মতো সারা দেশে। দেশ জুড়ে শুরু হল ধরপাকড়। বইপত্র বাজেয়াপ্ত করার হিড়িক পড়ে গেল। সান্ডারল্যাণ্ডের "ইণ্ডিয়া ইন বনডেজ" প্রকাশ করার অপরাধে খ্যাতনামা সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হল। বাংলায় সুভাষচন্দ্র প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা বন্দী হলেন।

সনডার্স হত্যার পর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় জড়ানো হল ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, যতীন দাস প্রমুখ বহু দেশপ্রেমিককে। রাজনৈতিক বন্দীদের

প্রতি কর্তৃপক্ষের আচরণের প্রতিবাদে তাঁরা অনশন-ধর্মঘট শুরু করলেন। ১৩ সেপ্টেম্বর ৬১ দিন ধর্মঘটের পর শহীদের মৃত্যুবরণ করলেন যতীন দাস। সারা দেশে উঠল বিক্ষোভের ঢেউ, কলকাতার বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দিল ৫ লক্ষ মানুষ।

গান্ধীজী মন্তব্য করলেন : "যে মানুষ স্বাধীনতা চায় তাকে বিরাট ঝুঁকি নিতে হবে, সবকিছু বাজী ধরতে হবে।"

কিন্তু তাঁর কর্মসূচী অপরিবর্তিত রইল। খাদি ব্যবহার, অস্পৃশ্যতা বর্জন, সাম্প্রদায়িক ঐক্য ইত্যাদির উপরেই গান্ধীজী জোর দিলেন।

গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে, আর আন্দোলন শুরু না করে উপায় নেই। দেশবাসীকে তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে তিনি বর্মা সহ সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করলেন, শত শত সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হল।

১৯২৯ সালের ২৪ মে বোম্বাইতে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে গান্ধীজীর প্রতিরোধ-পরিকল্পনা আলোচিত হল। গান্ধীজী সাড়ে সাত লক্ষ নর-নারীকে কংগ্রেসের সদস্য করে সমগ্র দেশের প্রতিটি গ্রামে কংগ্রেস সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানালেন।

তাঁকে কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানো হলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন তিনি 'ঘটনাবলীর অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছেন না।' কাজেই এখন তরুণদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তিনি সভাপতি পদের জন্য জওহরলালের নাম প্রস্তাব করলেন।

জনগণ আন্দোলন শুরু করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে একথা কিন্তু গান্ধীজী স্বীকার করলেন না, তিনি বললেন : "যারা আমার শর্তাবলী মেনে নিয়ে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করতে প্রস্তুত তাদের কিভাবে নেতৃত্ব দেওয়া যায় তা আমি জানি। কিন্তু দিগবলয়ে এমন কোন লক্ষণ আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

ইতিমধ্যে বড়লাট লর্ড আরউইনের ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস সংক্রান্ত ঘোষণা রাজনৈতিক মহলে আলোড়নের সৃষ্টি করল। সরকার ও নেতাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকল, কিন্তু লর্ড আরউইন যখন গোল টেবিল বৈঠকে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস ভিত্তি করে আলোচনা হবে কিনা গান্ধীজীর এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না তখন আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু নেতারা হাল

ছাড়লেন না। একটা কিছু হবে এই আশায় মডারেট নেতারা আলোচনা অব্যাহত রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা হওয়ার আগে গান্ধীজীও তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন এবং ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস সংক্রান্ত আলোচনায় ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে রচিত ইস্তাহারে অন্যদের সঙ্গে স্বাক্ষরও দিয়েছিলেন। বড়লাট লর্ড আরউইনের সঙ্গে আলোচনার পর গান্ধীজী বুঝলেন যে আন্দোলন শুরু করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বড়লাটের ট্রেন লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হয়েছিল তা গান্ধীজীকে অত্যন্ত বিচলিত করে। সারা দেশে হিংসার আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়ছে দেখে তিনি উদ্বিগ্ন এই কথা বলে গান্ধীজী জানালেন যে সারা দেশে সফর করে তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, দেশের অধিকাংশ মুক্তিকামী মানুষ হিংসা চায় না। তিনি দৃঢ়ভাবে জানালেন যে অহিংসা স্থায়ী আসন লাভ করেছে, এখানে ওখানে বোমা নিক্ষেপে তার কোন ব্যত্যয় হবে না। "আমরা এখন নতুন যুগে প্রবেশ করছি। দূরবর্তী লক্ষ্য নয়, আমাদের আশু লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা।"

এই প্রথম গান্ধীজী 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র কথা বললেন এবং একথাও বললেন যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এই পূর্ণ স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে হবে। হিংসা ও সন্ত্রাসবাদ নয়, নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহের মধ্যমে শত্রুপক্ষের হৃদয় জয় করতে হবে।

বোঝা গেল গান্ধীজী আবার আন্দোলন শুরু করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।

ধনিকশ্রেণী একটা রফার আশায় মডারেট নেতাদের সাহায্য গ্রহণ করে যখন ব্যর্থকাম হল তখন জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রেখে আন্দোলন শুরু করার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিল। আর এর জন্য গান্ধীজীর উপর নির্ভর করা ছাড়া ধনিকশ্রেণীর কোন উপায় ছিল না। তাই সময় থাকতেই ধনিকশ্রেণী গান্ধীজীর পিছনে এসে দাঁড়াল। গান্ধীজী আর যাই করুন তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করবেন না এ বিশ্বাস তাদের ছিল। চৌরি-চৌরা পর্বে এ অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করেছিল। সেই পর্বে আন্দোলন প্রত্যাহারের পরামর্শ শেঠজীরাও দিয়েছিল এবং গান্ধীজী তাঁর নীতির প্রতি অবিচল থেকে সে পরামর্শ গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। কারণ তাঁর নীতি ও শেঠজীদের পরামর্শের মধ্যে কোন অসঙ্গতি ছিল না।

গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র ও বাঙলার বিপ্লবীরা
(তৃতীয় পর্ব)
[১৯২৯—১৯৩৪]

ঐতিহাসিক লাহোর কংগ্রেসে গান্ধীজী নিজেই উত্থাপন করলেন পূর্ণ স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব। প্রস্তাবে সমস্ত আইনসভা ও সরকারী কমিটি, নির্বাচন প্রভৃতি বয়কটের আহ্বান জানানো হল এবং অবস্থা বুঝে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সত্যাগ্রহ আন্দোলন—কর বন্ধ আন্দোলনসহ—শুরু করার ক্ষমতা দেওয়া হল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে।

১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর রাত ১২টার পর বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে প্রস্তাব গৃহীত হল—সেই প্রথম নতুন যুগের রণধ্বনি শোনা গেল—'ইনকিলাব জিন্দাবাদ।'

সরকার তখন আঘাত হানার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ভীত ও উদ্বিগ্ন নরমপন্থীরা মাদ্রাজে এক সম্মেলনে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস লাভের জন্য সকল দলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার জন্য আহ্বান জানাল। লাহোর কংগ্রেসের উল্লেখ করে মডারেট নেতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বললেন: "এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে আমরা এক অভূতপূর্ব সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছি।"

ভারতবর্ষের বুর্জোয়া বা মধ্যশ্রেণী সেদিন সত্যই এক অভূতপূর্ব সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জনগণের প্রবল অসন্তোষ ও বিক্ষোভের বারুদের স্তূপের উপর বসে বুর্জোয়া নেতারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। নরমপন্থীরা আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে একটা কিছু পাওয়ার আশা ত্যাগ করতে পারে নি। গরমপন্থীরা গণ-বিক্ষোভের ভয় দেখিয়ে বেশি কিছু আদায় করে নিতে পারবে বলে ভেবেছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী মহল থেকে কোন সাড়া না পেয়ে উভয় পক্ষই বিপদ গুনেছিল। অবশেষে নিরুপায় হয়ে কংগ্রেস নেতারা যখন পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করতে বাধ্য হল তখন দাবি আদায়ের পন্থা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হল। গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামীরা বড় রকমের কিছু করে ফেলতে আগ্রহী ছিলেন না। ধনিকশ্রেণী এ বিষয়ে তাঁদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল। গান্ধীজী কালক্ষেপ করার পক্ষপাতী, তাই তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ধামাচাপা দিয়ে আবার একবার আপস-আলোচনায় উদ্যোগী হলেন।

১৯৩০ সালের ৯ জানুয়ারি গান্ধীজী মার্কিন পত্রিকা "নিউ ইয়র্ক ওয়ার্লড" পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর এক বিবৃতিতে জানালেন: "স্বাধীনতা প্রস্তাবে কারুর ভয় পাওয়ার কিছু নেই।" ৩০ জানুয়ারি "ইয়ং ইন্ডিয়া" পত্রিকায় গান্ধীজী তাঁর ন্যূনতম ১১ দফা দাবি পেশ করে জানিয়ে দিলেন যে, সরকার দাবিগুলি মেনে নিলে আইন অমান্য আন্দোলন করা হবে না।

মনে রাখতে হবে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির ধারাকে বাদ দিয়েও ১১ দফা দাবি হয় নি এবং এ ভাবে কোন দাবি উত্থাপনের ক্ষমতাও কংগ্রেস গান্ধীজীকে দেয় নি। তবু গান্ধীজীর নেতৃত্বের উপর আস্থা রেখে সকলে নীরব রইলেন।

এরপর ফেব্রুয়ারি মাসে সবরমতিতে কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামীদের হাতে আন্দোলন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হল অর্থাৎ কোন নির্বাচিত কংগ্রেস কমিটির আন্দোলন পরিচালনার অধিকার থাকল না। অহিংস আন্দোলনে যাদের অটুট বিশ্বাস আছে শুধু তারাই আন্দোলন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এই যুক্তিতেই উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

গান্ধীজী বেশ সুপরিকল্পিতভাবেই অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে আপসের আশা নেই এবং সরকার কঠোর দমননীতি অনুসরণ করতে দৃঢ়সঙ্কল্প। অন্যদিকে গণবিক্ষোভ মারাত্মক বিস্ফোরণের আকার ধারণ করতে চলেছে।

তিনি সরকারের দমননীতি এবং গণবিক্ষোভ উভয় ধরনের হিংসার মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে তাঁর নেতৃত্বে লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সাতঙ্কে লক্ষ্য করল লক্ষ লক্ষ মানুষ অহিংস লবণ সংগ্রহ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে সারা দেশে এক ধরনের বিদ্রোহের সূচনা করেছে যা সাম্রাজ্যবাদের ভিতকে টলিয়ে দিতে পারে।

গান্ধীজীর হিসেবেও ভুল হয়েছিল। তাঁর ঐতিহাসিক ডান্ডি অভিযান গণবিক্ষোভের বারুদের স্তূপে অগ্নিসংযোগ করবে এ কথা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি।

সাম্রাজ্যবাদ আন্দোলন শুরু হওয়ার আগেই আঘাত হেনেছিল। সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। সংগ্রামী নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করে সাম্রাজ্যবাদীরা আন্দোলনকে পঙ্গু করে দিতে চেয়েছিল।

১৯৩০ সালের ৬ এপ্রিল গান্ধীজী লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করলেন। ডান্ডি

অভিযান সত্যই ঐতিহাসিক অভিযানে পরিণত হল দেশব্যাপী বিক্ষোভের মধ্যে দিয়ে।

গান্ধীজী ছাত্রদের গোলামখানা বর্জনের, আইনজীবীদের আদালত বর্জনের এবং সরকারী কর্মচারীদের পদত্যাগ করে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানালেন।

লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন সরকার পক্ষকে রীতিমত বিচলিত করেছিল, কাজেই নির্মম আঘাত হেনে আন্দোলন দমনের চেষ্টাও শুরু হয়ে গেল, রক্ত স্রোতে ভেসে গেল বহু অঞ্চল। অহিংস আন্দোলনের কাঠামোর মধ্যে আন্দোলনকে ধরে রাখা সম্ভব হল না। গান্ধীজী আর আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নন এই কথা সরকার স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করল এবং ৫ মে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হল।

প্রতিবাদে সমগ্র ভারতবর্ষ হরতাল পালন করল। সাম্রাজ্যবাদ ক্ষিপ্ত হয়ে নির্মম দমননীতি অনুসরণ করল। এর ফলে নানা স্থানে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠল।

এবার আর একদল যুবকের অসংগঠিত ও স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ নয়, সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী, জনগণ ও সৈন্যবাহিনীর বিক্ষোভ সংগঠিতরূপেই ফেটে পড়ল।

মহারাষ্ট্রের শিল্পনগরী সোলাপুরে শ্রমিকদের আম-হরতাল নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে। বর্বর দমননীতির জবাবে জনগণের পূর্ণ সমর্থনে শ্রমিকশ্রেণী সোলাপুর থেকে সরকারী কর্মকর্তা ও পুলিস বাহিনীকে পলায়ন করতে বাধ্য করল। বহু শ্রমিক শহীদ হলেন। শহর জনগণের হাতে থাকল বেশ কয়েকদিন। শেষ পর্যন্ত সামরিক শাসন জারি করে শহর আবার দখল করতে হয়েছিল। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল ৪ নেতা!

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পেশোয়ারে যে ঘটনা ঘটল তা সাম্রাজ্য-বাদীদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিল। স্থানীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে গণ-বিক্ষোভের ঝড় উঠলে সাঁজোয়াবাহিনী পাঠানো হয়েছিল। জনতা একটি সাঁজোয়া গাড়ি পুড়িয়ে দিলে নির্মম গুলিবর্ষণে হতাহত হয় শত শত লোক। এর ফলে গাড়োয়ালী বাহিনীর মধ্যে দেখা দেয় বিদ্রোহ। ১৮শ রয়্যাল গাড়োয়ালী ২য় রাইফেল্‌স্‌-এর ব্যাটালিয়নের ২টি প্লেটুন জনতার উপর গুলিবর্ষণ করতে অস্বীকার করে জনতার সঙ্গে যোগ দেয়।

আতঙ্কে দিশাহারা কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ সমস্ত ফৌজ ও পুলিস সরিয়ে নেন। পেশোয়ার জনগণের হাতে চলে যায়। পুনরায় পেশোয়ার দখলের জন্য পাঠানো হয় শক্তিশালী ব্রিটিশবাহিনী ও বিমানবহর। বিনা প্রতিরোধেই শহর পুনরাধিকার হয়। জনগণ মোটামুটিভাবে সম্পূর্ণ অহিংস ছিল। বিদ্রোহী সৈন্যদের সামরিক আদালতে বিচার করে একজনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে ও ১৫ জনকে দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের সমস্ত দাবি সরকার প্রত্যাখ্যান করে।

বাংলার চট্টগ্রামে বিপ্লবীরা সূর্য সেনের (মাস্টার দা) নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বিপ্লবের সৃষ্টি করে।

গান্ধীজী তাঁর অহিংসা নীতিতে অটল ছিলেন। কাজেই তিনি সোলাপুরে 'গান্ধীরাজ' প্রতিষ্ঠাকে ধিক্কার জানালেন, বললেন "সোলাপুরে গণহিংসার যে তাণ্ডব হয়েছে, তাতে আমি গভীরভাবে বিচলিত।" (কারাগার থেকে ইংরেজ সাংবাদিকের কাছে দেওয়া বিবৃতি। ১৯৩০ সালের ১৫ মে তারিখের ডেইলি হেরাল্ডে প্রকাশিত)।

চট্টগ্রামের ঘটনা গান্ধীজীকে বাংলার বিপ্লবীদের সম্পর্কে উদ্বিগ্ন করে তোলে এবং স্বভাবতই তিনি এর বিরোধিতা করে বিবৃতি দেন।

কিন্তু পেশোয়ারের ঘটনায় জড়িত গাড়োয়ালী সৈন্যদের সম্পর্কে তাঁর বিবৃতিতে যে যুক্তি দেখানো হল তা নিম্নরূপ:

১৯৩২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি গান্ধীজী 'লে মঁদ' নামক ফরাসী পত্রিকার প্রতিনিধির এক প্রশ্নের জবাবে বলেন:

"যে সৈন্য গুলিবর্ষণ করতে অস্বীকার করে, তার গৃহীত শপথ অমান্য করে, সেই সৈন্য অপরাধজনক অবাধ্যতার জন্য দোষী। আমি রাজকর্মচারী ও সৈন্যদের অবাধ্যতা করতে বলতে পারি না, কারণ—যখন আমি ক্ষমতাসীন হব তখন এই সব রাজকর্মচারী ও সৈন্যদেরই আমাকে কাজে লাগাতে হবে এমন সম্ভাবনা বর্তমান। আমি যদি তাদের অবাধ্য হতে শেখাই তা হলে আমার আশঙ্কা আমি যখন ক্ষমতাসীন হব তখন তারা ঐ রকম আচরণই করবে।"

অর্থাৎ কর্মরত অবস্থায় কোন সৈন্য বা রাজকর্মচারীর অবাধ্যতা বরদাস্ত করা যায় না।

যে সরকারকে 'শয়তান সরকার' বলে তিনি অভিহিত করেছিলেন সেই

সরকারের সঙ্গে অহিংসভাবে আদেশ পালন না করা তিনি সমর্থন করলেন না। সাম্রাজ্যবাদী সরকার তাঁর মন্তব্যে খুশি হয়েছিল, আর খুশি হয়েছিল ধনিকশ্রেণী এবং মডারেট নেতৃবৃন্দ, দেশবাসী হতাশ হয়েছিল। কারণ এরা সকলেই একটি আপস করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল।

সরকার গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করার সময় পরিষ্কারভাবেই জানিয়ে দিয়েছিল যে আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা গান্ধীজীর ক্রমেই কমে আসছে, কাজেই তাঁর উপর আর ভরসা রাখা যায় না। অতএব তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল, তবে "বন্দী থাকাকালে তাঁর স্বাস্থ্য ও সুখ-সুবিধার জন্য সব রকম ব্যবস্থা করা হবে।"

অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামীরাও খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন, কাজেই আবার আপস-আলোচনার পালা শুরু হল। মডারেট নেতাদের এবং ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর প্রতিনিধিরা গান্ধীজীর কাছে আনা-গোনা শুরু করল।

শেষ পর্যন্ত ১৯৩১ সালের ২৬ জানুয়ারি গান্ধীজীকে বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হল এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকও করতে দেওয়া হল। ৪ মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। আইন অমান্য আন্দোলনও সাময়িকভাবে মুলতবী রাখা হল। প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তিতে সরকারেরই জয় হয়েছিল, কিন্তু গান্ধীজীর অনুগামীরা চুক্তিকে এক বিরাট জয় বলেই প্রচার করলেন। [সরকারের দমননীতি অব্যাহত রইল, সাম্প্রদায়িক বিরোধ মাথাচাড়া দিল, গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হল। গান্ধীজী খালি হাতে ফিরে এলেন। আবার আন্দোলনের কথা উঠল কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী সরকারের চক্রান্ত রোধ করা গেল না। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ব্যবস্থা চালু হয়ে গেল। অনুন্নত হিন্দুদের হিন্দু সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা রোধের জন্য গান্ধীজী আমরণ অনশন করার ফলে পুণা চুক্তি স্বাক্ষরিত হল এবং গান্ধীজী অনশন ত্যাগ করলেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ সময় তাঁর কাছে ছিলেন।

নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে কংগ্রেস গান্ধীজীর নেতৃত্বে আপস-রফার দিকেই এগুতে লাগল।]

রাজনৈতিক দিক থেকে অধিক সচেতন মানুষেরা ক্ষুব্ধ হল এবং গান্ধীজীর বিরুদ্ধে এখানে ওখানে বিক্ষোভও দেখা গেল, তবু বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের

কাছে গান্ধীজী সর্বসম্মত নেতা রূপে স্বীকৃত হলেন। কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ গান্ধীজীর সঙ্গে চুক্তি করে তাঁকে এক নতুন মর্যাদা দিয়েছিল। এই প্রথম দেশবাসী দেখল যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সর্বশক্তিমান নয়, তাকেও আপস করতে হয়। পরাজয়ের গ্লানি জনসাধারণ বোধ করল না। কিছুই যে পাওয়া গেল না একথাও তাদের মনে হল না। করাচী কংগ্রেসে গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুমোদিত হল। কিছুই পাওয়া গেল না এবং জনগণের সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল জেনেও বামপন্থীরা কোন প্রতিবাদ জানাতে পারল না। প্রকৃতপক্ষে জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য সংগ্রামী নেতারা নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন।

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক থেকে গান্ধীজী শূন্য হাতে ফিরে আসার পরই সাম্রাজ্যবাদ আবার আঘাত হানল। ৯ মাস যুদ্ধবিরতি সরকারকে প্রস্তুত হওয়ার যথেষ্ট সময় দিয়েছিল।

(১)

১৯৩২ সালের ৪ জানুয়ারি সাম্রাজ্যবাদ মোক্ষম আঘাত হানল। গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হল, কংগ্রেস সংগঠন বে-আইনী ঘোষিত হল, গণ্ডা গণ্ডা অর্ডিন্যান্স জারি করে সর্ববিধ স্বাধীনতা হরণ করা হল এবং দেশ জুড়ে ধরপাকড় ও অত্যাচারের তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল।

গান্ধীজী আন্দোলন শুরু করার দরকার হবে না বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন, আবার বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতেও চেয়েছিলেন কিন্তু সে সবে 'ভবী ভুলল না'!

দেশবাসী নেতৃত্বহীন অবস্থাতেও আত্মসমর্পণ করল না, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলল দীর্ঘকাল ধরে। কলকাতায় বে-আইনী কংগ্রেসের যখন অধিবেশন হয় তখন ১ লক্ষ ২০ হাজার নরনারী কারারুদ্ধ, হাজার হাজার মানুষের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, লাঠি গুলি, পিটুনী, পুলিস-অভিযান অব্যাহত, গ্রামের পর গ্রামের উপর চাপানো হয়েছে পাইকারী জরিমানা।

নেতারা গান্ধীজীর নির্দেশে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা দূরে থাক, কোন উৎসাহও দিলেন না। গোপনে কিছু করা চলবে না বলে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে

ফতোয়া দেওয়া হল, তাদের স্বার্থ বিরোধী কিছু করা হবে না বলে জমিদারদের আশ্বাস দেওয়া হল।

নতুন বড়লাট লর্ড উইলিংডন গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানোর সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসকে চিরতরে খতম করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। তিনি যখন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করলেন তখনই গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে, আক্রমণ আসন্ন। তাই, ৩ জানুয়ারি সকালে তিনি দেশবাসীকে বিদ্বেষ, ঘৃণা ও হিংসা পরিহার করে এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

দেশবাসী সাড়া দিয়েছিল, কিন্তু কংগ্রেসের কাছ থেকে সংগ্রামের কোন নির্দেশ পাওয়া গেল না।

নেতৃত্বহীন আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একে একে তার মারণাস্ত্রগুলি প্রয়োগ করতে শুরু করল।

১৯৩২ সালের ১৭ আগস্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা" ঘোষণা করল। এতে অনুন্নত হিন্দুদের স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীরূপে গণ্য করা হয়।

১৮ আগস্ট গান্ধীজী জানালেন যে তিনি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে আমরণ অনশন শুরু করবেন।

অবশ্য, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা হল না, শুধু অনুন্নত হিন্দুদের সম্পর্কিত বাঁটোয়ারা মেনে নেওয়া হল না।

২০ সেপ্টেম্বর থেকে অনশন শুরু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে গান্ধীজী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে লিখলেন, "অনুন্নত শ্রেণীগুলির জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী গঠনে আমি বোধ করছি যে, হিন্দুত্ব ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং এতে অনুন্নত শ্রেণীগুলির কোন উপকারই হবে না।"

শেষ পর্যন্ত একটা আপস হল। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্ন দলের নেতারা মিলে অস্পৃশ্যতা বর্জন করা হবে বলে ঘোষণা করল এবং অনুন্নত সাম্প্রদায়গুলির নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে আইনসভায় তাদের আসন আরও কিছুটা বাড়িয়ে দিয়ে পুণা চুক্তি সম্পাদিত হল। হিন্দুদের "যুক্ত নির্বাচক মণ্ডলী" মেনে নেওয়া হল। ব্রিটিশ সরকার এই চুক্তি মেনে নেওয়ায় গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করলেন।

ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাবিত নতুন শাসন সংস্কার কংগ্রেস অগ্রাহ্য করেছিল অথচ তারই একটি অংশের সংশোধনের দাবিতে গান্ধীজীর আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বহু মানুষের মনে বিস্ময় জাগিয়েছিল। তারা বুঝেছিলেন যে, গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস নতুন শাসন সংস্কারকে মেনে নিতে চলেছে। এ নিয়ে বিক্ষোভেরও সৃষ্টি হয়েছিল।

গান্ধীজী চৌরি-চৌরা পর্বের মত এই পর্বেও ক্রমে রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে হরিজন আন্দোলন ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে তাঁর সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করলেন।

১৯৩৩ সালের মে মাসে দেশবাসীর পাপ মোচনের জন্য গান্ধীজী আবার অনশন করলে সরকার তাঁকে মুক্তি দিল। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে সরে যাচ্ছেন বুঝে সরকার খুশিই হয়েছিল।

তাঁর অনশনকালে দেশও উত্তেজনা ও উদ্বেগপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে থাকবে এবং এই অবস্থায় আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না এই অজুহাত দেখিয়ে গান্ধীজী আন্দোলন মুলতবী রাখতে বলেন এবং তদনুযায়ী ছয় সপ্তাহের জন্য আন্দোলন মুলতবী রাখা হল।

জুলাই মাসে গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তাঁকে জানান হল যে আন্দোলন প্রত্যাহার করা না হলে বড়লাট তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন না। তখন কংগ্রেস নেতারা গণ-আন্দোলন বন্ধ করে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। সমস্ত কংগ্রেস সংগঠনও ভেঙে দেওয়া হল। কিন্তু সরকার কোন সাড়া দিল না।

স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা তাদের সম্পত্তি হারিয়েছে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করলে বোম্বাই সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। অল্পকাল পরেই গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়া হয়, কিন্তু নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার অভিযোগে আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আদালতে তাঁকে এক বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। হরিজনদের সেবা সংক্রান্ত কাজ তিনি বন্দী অবস্থায় চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি চান। অনুমতি না পেয়ে গান্ধীজী অনশন শুরু করেন এবং অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ায় সরকার ২৩ আগস্ট বিনাশর্তে তাঁকে মুক্তি দেয়। দণ্ডের মেয়াদ পূর্ণ হয়নি, কাজেই তিনি কোন রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে

পারেন না এই যুক্তি দেখিয়ে গান্ধীজী পুরোপুরি হরিজন আন্দোলনে নেমে পড়েন।

২৫ আগস্ট গান্ধীজী বলেন: "কারাবাস ও অনশনের সম্ভাব্য পুনরাবৃত্তি অপেক্ষা আমি অনেক বেশি আগ্রহের সঙ্গে শান্তিকামনা করব।"

ইতিমধ্যে আন্দোলন চলতে চলতে ক্রমে অচল হয়ে এল।

১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে গান্ধীজী এক বিবৃতিতে গণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ব্যর্থতার জন্য জনসাধারণকেই দায়ী করলেন। তারা যথাযথভাবে আন্দোলন চালাতে পারে নি বলেই তাদের আন্দোলন "শাসকদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে নি। এক এক বার এক একজন যোগ্য লোকের মধ্যেই সত্যাগ্রহ সীমাবদ্ধ রাখা দরকার।"

"বর্তমান অবস্থায় মাত্র একজনেরই এবং আমারই আপাতত আইন অমান্য আন্দোলনের দায়িত্ব বহন করা উচিত।"

এরপর আর গণ আইন-অমান্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

১৯৩৪ সালের মে মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পাটনা অধিবেশনে বিনা শর্তে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস লড়বে এই সিদ্ধান্তও গৃহীত হল।

১৯৩৪ সালের জুন মাসে সরকার কংগ্রেসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করল, কিন্তু লালকোর্তা ও কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সংগঠন অবৈধই রয়ে গেল।

গান্ধীজী রাজনীতি থেকে সরে আসছিলেন এবার আনুষ্ঠানিকভাবেই তিনি কংগ্রেসের সদস্যপদে ইস্তফা দিলেন।

আপাতত তাঁর কাজ সমাধা হয়েছে এই যুক্তি দেখিয়ে রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগকালে গান্ধীজী স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়েছিলেন যে, "বহু কংগ্রেস কর্মী ও আমার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ক্রমেই বাড়ছে।" তিনি বললেন যে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, "অধিকাংশ কংগ্রেসকর্মীর কাছে অহিংসা একটা "রণনীতি মাত্র, যৌথ মতবাদ" নয়।

তিনি এ কথাও বললেন যে, কংগ্রেসের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলির সংখ্যা ও প্রভাব বেড়ে চলেছে, "তারা যদি কংগ্রেসে প্রাধান্য লাভ করে—যা তারা করতে পারে—তা হলে আমি কংগ্রেসে থাকতে পারব না।"

কথাগুলির মধ্যে রাজনীতির কোন মারপ্যাঁচ ছিল না। গান্ধীজী অকপটেই—তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন।

তিনি বার বার বলেছেন যে অহিংসা ও প্রেমই তাঁর মূলমন্ত্র। অহিংস ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের হৃদয় জয় করে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়াই তাঁর লক্ষ্য।

যে সরকারকে তিনি 'শয়তান' আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হন নি তার বিরুদ্ধেও তিনি কোন বিদ্বেষ পোষণ করেন নি।

এক কথায় গান্ধীজী চেয়েছিলেন রাজনীতিকে এক উচ্চ নৈতিক স্তরে তুলতে।

ব্রিটেনের কমিউনিস্ট নেতা ও সুপণ্ডিত রজনীপাম দত্ত গান্ধীজীর মূল বক্তব্য এবং সেই বক্তব্য অনুযায়ী তাঁর কাজের সিদ্ধান্তকে উপলব্ধি করতে না পেরে গান্ধীজীর তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং ১৯৩৪ সালে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন এক যুগের সূচনা হয়েছে বলে ধরে নিয়েছিলেন।

১৯৩০-৩৪ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে মুক্তি সংগ্রাম অতি প্রবল হয়ে ওঠে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষ মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আন্দোলনের মধ্যে দেখা দিয়েছিল নতুন ভাবধারা এবং এই নতুন ভাবধারা হল সমাজতন্ত্র তথা কমিউনিজমের ভাবধারা। এই নতুন ভাবধারা গান্ধীজী সহ বহু কংগ্রেস নেতাকে যেমন উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল তেমনি সাম্রাজ্যবাদী সরকারকেও বিচলিত করে তুলেছিল।

গান্ধীজী তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেসকে তথা গণ-আন্দোলনকে পরিচালিত করে নতুন ভাবধারাকে প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন। আর সাম্রাজ্যবাদ সরাসরি আঘাত হেনে নতুন ভাবধারাকে বিলুপ্ত করতে চেয়েছিল। এই উদ্দেশ্যেই কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়।

—গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন সরকারকে কিছুটা স্বস্তি দিলেও শেষপর্যন্ত এই স্বস্তি স্থায়ী হয় নি। দেশে অসন্তোষের বারুদের স্তূপে গান্ধীজীর আন্দোলন যে অগ্নিসংযোগ করতে পারে এ অভিজ্ঞতা সাম্রাজ্যবাদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। এর ফলে সরকার উভয় সংকটে পড়েছিল। গান্ধীজী শান্তিপ্রিয় ও আপসকামী এবং তিনিই দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতা এবং যে গণ-আন্দোলন

তিনি সৃষ্টি করেছেন তা' নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা একমাত্র গান্ধীজীরই আছে এ কথা বুঝে সরকার গান্ধীজীকে কোন সময়েই একেবারে সরিয়ে দিতে চায় নি। তাই তাঁকে গ্রেপ্তার করলেও মুক্তি দিতেও সরকার দ্বিধা করে নি।

কিন্তু গণ-আন্দোলনের প্রবণতা বিশেষ করে সোলাপুর ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ঘটনাবলী সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। গান্ধীজীর প্রভাব কমছে এমন আশঙ্কা সরকারকে পেয়ে বসে। এর ফলে এক এক সময় কংগ্রেসকে ও গণ-আন্দোলনকে খতম করার কথাও সরকার ভাবে।

এর ফলেই ১৯৩০-১৯৩৪ সালের মধ্যে অসংখ্য দমন নীতিমূলক অধ্যাদেশ ও আইন জারি করা হয়।

সরকারের গোপন রিপোর্টে সরকারের মনোভাব বেশ স্পষ্টভাবেই অভিব্যক্ত হয়।

১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার পর গান্ধীজী যখন বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে চান তখন তাঁকে লেখা চিঠিতে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয় যে, আইন অমান্য আন্দোলন সম্পূর্ণ সংবিধান-বিরোধী (অর্থাৎ বে-আইনী) কাজেই এই আন্দোলনের সঙ্গে আপসের কোন প্রশ্নই ওঠে না। এই আন্দোলন প্রত্যাহার সম্পর্কে সরকার কোন আলাপ-আলোচনা করতে পারে না।

চিঠিতে আরও লেখা হয় যে, ১৯৩২ সালের ২০ এপ্রিল ভারত সচিব কমন্স সভায় বলেছেন যে, কংগ্রেসের সহযোগিতা লাভের শর্তে কংগ্রেসের সঙ্গে দরকষাকষির কোন প্রশ্নই ওঠে না।

(দ্রঃ ব্রিটিশ সিক্রেট রিপোর্টস—ইণ্ডিয়ান মেজর নন্ ভায়োলেন্ট মুভমেণ্টস—১৯১৯-১৯৯৪—সম্পাদনা—পি এন চোপরা)

কংগ্রেস বিনাশর্তে আন্দোলন প্রত্যাহার করলে এবং নতুন শাসন সংস্কার ব্যবস্থা মেনে নিলে সরকার কংগ্রেসকে শায়েস্তা করা গেছে ভেবে কংগ্রেসকে বৈধ বলে ঘোষণা করে। আবার গণ-আন্দোলন নতুন আকারে দেখা দিতে পারে এবং বৈপ্লবিক রূপ পরিগ্রহ করতে পারে এমন আশঙ্কাও তাদের ছিল। তাই গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসকে তারা একেবারে খতম করতে চায়।

শেষপর্যন্ত প্রয়োজন হলে কংগ্রেসের সঙ্গে একটা রফা করে ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হবে এমন ধারণাও তাদের হয়েছিল। কারণ গান্ধীজী অহিংস ও নিরুপদ্রব আন্দোলন ছাড়া অপর কোন আন্দোলনকে আমল দিতে না চাওয়ায় সরকার খুশি হয়েছিল।

—ধনিকশ্রেণীও গান্ধীজীর উপর ভরসা রেখেছিল। শেঠজীরা বুঝেছিল গান্ধীজীকে বাদ দিয়ে তারা কিছু করতে পারবে না। তাই গান্ধীজীর মত ও পথকে তারা সর্বতোভাবে সমর্থন জানাল।

—শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর অগ্রগামী জাতীয়তাবাদী মহলে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ বেশ দানা বেঁধে উঠেছিল। এই মহলে সুভাষচন্দ্র ও জওহরলালের প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা বিশেষ করে কমিউনিজম-এর ভাবধারাও শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং শ্রমিকশ্রেণী ও শোষিত জনগণের মধ্যে এক নতুন চেতনার সৃষ্টি হয়।

সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থকদের তৎপরতাও এ সময় বৃদ্ধি পায়।

—মুসলমানদের একটি বড় অংশ এই সময় কংগ্রেসকে সমর্থন করতে অস্বীকার করে এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধ ক্রমেই প্রবল হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদী সরকার এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করে এবং কংগ্রেস তা মেনে নিতে বাধ্য হয়। মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ ক্রমেই কংগ্রেসের আন্দোলন থেকে দূরে সরে যেতে থাকে।

—অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়গুলির মধ্যেও অসন্তোষ ও বিক্ষোভের আগুন ধোঁয়াতে শুরু করে। এর সুযোগ গ্রহণ করে হিন্দু সমাজে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদী সরকার তাদের স্বতন্ত্র সত্তা পোষণ করে সংরক্ষণ নীতি ঘোষণা করে। গান্ধীজীর অনশন এই চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে সমর্থ হলেও নির্বাচনের ক্ষেত্রে কংগ্রেস সমর্থিত অনুন্নত হিন্দু প্রার্থীদের নিয়ে রীতিমত অসন্তোষ দেখা দেয় ড. আম্বেদকর প্রমুখ নেতাদের মধ্যে।

এর ফল কংগ্রেসের পক্ষে বেশ ক্ষতিকর হয়েছিল যার জের এখনও চলছে।

—তবু ১৯৩০-৩৪ সালে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নিপীড়িত, অবহেলিত ও নিরক্ষর কোটি কোটি মানুষের মনে গান্ধীজীর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা অটুট থাকে। গান্ধীজী তাদের কাছে সাধু সন্ত রূপেই প্রতিভাত হন এবং তাদের জন্য একমাত্র তিনিই কিছু করতে পারেন এই দৃঢ় প্রত্যয় তাদের হয়।

"গান্হী মহারাজ, পুরনো গান্হী বাওয়া হঠাৎ কবে থেকে মহাত্মাজী হয়ে গিয়েছেন।"

গান্ধীজী হরিজন আন্দোলন করায়, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় সনাতনীদের আক্রোশ, গান্ধীজীকে হত্যার চেষ্টা (১৯৩৪ সালের ২৫ জুন), পুণায় গান্ধীজীকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হয়। তিনি অল্পের জন্য বেঁচে যান। সাধারণ মানুষের বিশেষ করে হরিজন বলে অভিহিত অস্পৃশ্য হিন্দুদের মনে গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা গভীরতর হয়।

মোটের উপর জঙ্গী দেশপ্রেমিক মহল এবং বামপন্থীরা গান্ধীজীর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেও তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কাছে অবিসংবাদিত নেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত রইলেন।

(২)

চৌরি-চৌরার ঘটনার পর থেকেই গান্ধীজীর নেতৃত্বের উপর সুভাষচন্দ্রের আস্থা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছিল। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে তিনি প্রথম বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে ধরলেন। সেদিন জওহরলাল ও অন্যান্য বাম কংগ্রেসীরা তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে তিনি কংগ্রেসের মূল প্রস্তাবের যে সংশোধনী উত্থাপন করেন জওহরলাল তা সমর্থন করেন। ১৩৫০-১১৭৩ ভোটে সংশোধনী অগ্রাহ্য হলেও ঐক্যবদ্ধ বাম কংগ্রেসীদের শক্তি সেদিন কংগ্রেস নেতাদের বিচলিত করেছিল।

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

১৯২৩ সালের মার্চ মাসের শেষদিকে রংপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র জানিয়েছিলেন সংগ্রামের আহ্বান। তিনি সেদিন যে ভাষণ দেন তাতে নতুন যুগের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল। এশিয়ার নবজাগরণের উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন যে ভারতবর্ষ এশিয়ার নবজাগরণের জোয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। লেনিন রাশিয়ায় যে নতুন রাষ্ট্র গড়ে তুলেছেন তার কথাও তিনি সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজনের কথাও জোর দিয়ে বলেন।

লাহোর কংগ্রেসের পর আবার নতুন করে যখন আন্দোলন শুরু হল তখন

সারা দেশে বিপুল গণ-বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়ে সাম্রাজ্যবাদী সরকার আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কিন্তু আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্বাহ্ণে গান্ধীজীর আচরণ সুভাষচন্দ্রকে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ করেছিল। গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামীরা আন্দোলন শুরু করার আগে আর একবার আপসের চেষ্টা করলেন। ১৯২৯ সালের ৩১ অক্টোবর বড়লাট লর্ড আরউইন ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস সম্পর্কে সরকারের মনোভাব ব্যক্ত করার পর নরমপন্থী নেতারা ছুটোছুটি শুরু করে দিলেন। গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতারা কোন একটি ইস্তাহার রচনা করলেন। এই ইস্তাহারে কি কি শর্তে ভারতবাসী সরকারের সঙ্গে আপস করতে পারে তা জানিয়ে দেওয়া হল। স্বাক্ষর দিলেন গান্ধীজী, তেজ বাহাদুর সপ্রু, বিজয়মোহন তানবীর, মতিলাল নেহরু, শ্রীমতী বেসান্ত, ড. আনসারি এবং জওহরলাল নেহরু (প্রথমে আপত্তি জানানোর পর)।

বিক্ষুব্ধ সুভাষচন্দ্র সই দিতে অস্বীকার করলেন। সই দিলেন না ড. কিচলু এবং আবদুল বারি।

লাহোর কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে শেষ পর্যন্ত যখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হল এবং সারা দেশে গণ-বিক্ষোভ ব্যাপক ও তীব্র আকার ধারণ করল তখন সরকার একটা মিটমাটের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। দূতিয়ালী শুরু হল এবং গান্ধীজী সরকারের বিপর্যস্ত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ না করে কার্যত আত্মসমর্পণ করলেন। স্বাক্ষরিত হল গান্ধী-আরউইন চুক্তি। সুভাষচন্দ্র স্তম্ভিত, মর্মাহত।

গভীর ক্ষোভে তিনি লিখেছেন: "যারা একটা মিটমাটের জন্য মরে যাচ্ছিলেন দিল্লীর সেই সব ধনী, অভিজাত ও রাজনীতিকদের দ্বারা মহাত্মা পরিবেষ্টিত হয়েছিলেন এবং ওয়ার্কিং কমিটিতে এমন একজন যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষ ছিলেন না যিনি জোরের সঙ্গে তার মতামত মহাত্মাকে জানাতে পারতেন। এমন কি যে জওহরলাল নেহরু এটা করতে পারতেন এ সময় তিনি তা করতে ব্যর্থ হলেন…।"

সুভাষচন্দ্র এরপর বিভিন্ন যুব সম্মেলনে গান্ধী-আরউইন চুক্তির তীব্র সমালোচনা করে যুব সমাজকে নতুন করে সংগ্রাম শুরু করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। যুব সমাজে তখন প্রবল উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল, অনেকে কংগ্রেস ত্যাগ করে নতুন সংগঠন গড়তে চেয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রই তাদের নিরস্ত

করেন। তিনি কংগ্রেসকেই বিপ্লবী সংগঠনে রূপান্তরিত করার জন্য সকলকে সচেষ্ট হতে বলেন।

গান্ধীজীর প্রবল প্রভাব সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের কোন সন্দেহ ছিল না। গান্ধী-আরউইন চুক্তিকে সাধারণ মানুষ যে একটা বড় রকমের জয় বলেই গ্রহণ করেছে একথাও তিনি বুঝেছিলেন। কিন্তু তার জন্য তিনি গান্ধীজীর কর্মনীতিকে সমর্থন জানাতে প্রস্তুত ছিলেন না।

এই সময় একটি ঘটনা ঘটে যার উল্লেখ এখানে করা প্রয়োজন। সুভাষচন্দ্র যে তাঁর আন্দোলনের পদ্ধতি ও তাঁর কর্মনীতি সমর্থন করতে পারছেন না একথা গান্ধীজী বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। সুভাষচন্দ্র সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হতে পারেন এ রকম আশঙ্কা তাঁর মনে দেখা দিয়েছিল।

গান্ধীজী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বা মহাসভার একচ্ছত্র নেতা। কাজেই ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি প্রদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে ওয়াকিবহাল থাকার আবশ্যকতা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। বাংলা ও পাঞ্জাব তাঁর কাছে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই দুটি প্রদেশে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরাই ছিলেন জাতীয় আন্দোলনের মেরুদণ্ড। তারা কংগ্রেসকে তাদের অভীষ্ট সিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাদের লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করা। গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত অহিংস গণ-আন্দোলনকে সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত করার উদ্দেশ্যে তারা এই আন্দোলনে সর্বতোভাবে অংশগ্রহণ করেন।

বাংলায় তো বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরাই কংগ্রেসের মেরুদণ্ড। তাই বাংলার হালচাল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার উদ্দেশ্যে গান্ধীজী তাঁর বিশ্বস্ত শিষ্য কৃষ্ণ দাস ওরফে দেবেন্দ্রকুমার সিংহ রায়কে বাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে সবকিছু জানবার দায়িত্ব অর্পণ করে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠানর নির্দেশ দেন।

কৃষ্ণ দাস সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর বাংলার হালচাল সম্পর্কে গান্ধীজীর কাছে এক রিপোর্ট পাঠান ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। চিঠির আকারে লিখিত এই রিপোর্টটি সরকার আটক করে। পরে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বিপ্লবীদের যোগ আছে একথা প্রমাণ করার

উদ্দেশ্যেই চিঠিটি আটক করা হয়, কিন্তু যেভাবেই হোক চিঠিটি বেপাত্তা হয়ে যায় (বিষয়টি অনুসন্ধানযোগ্য)।

মূল চিঠি হারিয়ে গেলেও চিঠির নকল একটা রাখা হয়েছিল। তা' থেকে জানা যায় যে, কৃষ্ণ দাস সুভাষচন্দ্রের সঠিক মূল্যায়ন করেছিলেন। তিনি গান্ধীজীকে জানাতে চেয়েছিলেন যে, সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে 'যুগান্তর' দলের যোগ আছে এবং সুভাষচন্দ্রের অনুগামীরা সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থক।

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে গান্ধীজীর উদ্বেগের কারণ ছিল। ১৯২৮ সালের পর থেকেই দেশের হাওয়া গরম হয়ে উঠেছিল। শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গাড়োয়ালী সৈন্যদের বিদ্রোহ, চট্টগ্রামে ভারতবর্ষের প্রথম সুপরিকল্পিত সশস্ত্র অভ্যুত্থান (সাময়িক হলেও), সোলাপুরে গণ-অভ্যুত্থান শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নয় ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর বুকেও কাঁপন ধরিয়েছিল।

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আশঙ্কা আছে এই ভয় দেখিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে ক্ষমতা আদায়ের চেষ্টা আর সত্যিকারের সশস্ত্র অভ্যুত্থান আর এক কথা। সশস্ত্র অভ্যুত্থান যদি ঘটে তবে কার হাতে ক্ষমতা যাবে কে জানে? কাজেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মত ভারতীয় ধনিকশ্রেণীও 'যেন-তেন-প্রকারেণ' গণ-অভ্যুত্থান ও সশস্ত্র বিপ্লব ঠেকানোর জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। এ ব্যাপারে গান্ধীজীই ছিলেন তাদের ভরসা। গান্ধীজীও সুভাষচন্দ্রের মত নেতাদের ও বিপ্লবী দলগুলিকে আয়ত্তে আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

যুগান্তর দল সম্পর্কে গান্ধীজীর মনে কোন উদ্বেগ ছিল না কারণ এই দলের নেতারা অনেক আগেই তাঁর আদর্শ ও কর্মপন্থা অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে সর্বতোভাবে সমর্থন করে বাংলায় কংগ্রেসের আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। গান্ধীজীর ভাবনা ছিল সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে। সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব এবং তাঁর সঙ্কল্পের দৃঢ়তা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। বাংলায় কংগ্রেসের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পিছনে কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মপন্থাবিরোধী অনুশীলন দল আছে জেনেও

গান্ধীজী বিচলিত হন নি কারণ যতীন্দ্রমোহনের আনুগত্য সম্পর্কে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর যখন যুগান্তর ও অনুশীলনের মধ্যে বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে এবং কংগ্রের মধ্যেও তা প্রতিফলিত হয় তখন গান্ধীজী যতীন্দ্র-মোহনকে 'ত্রিমুকুট' পরিয়ে দিয়ে অর্থাৎ একাধিকবার বাংলার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, স্বরাজ্য দলের নেতা এবং কলকাতা পৌর সংস্থার মেয়র পদে অভিষিক্ত করতে দ্বিধা করেন নি। আসলে গান্ধীজী ভেবেছিলেন যে, যতীন্দ্রমোহন সুভাষচন্দ্রের প্রভাব খর্ব করতে পারবেন তাই তার উপর সর্বময় নেতৃত্ব অর্পণ করে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু বাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞতাই তাঁর এই সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত হয়েছিল।

যতীন্দ্রমোহন বাংলার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন সন্দেহ নেই কিন্তু বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় তিনি ভারতীয় ধনিক ও বণিকদের আস্থা অর্জন করতে পারেন নি। জমিদার মহলেও তার কোন প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল না। অথচ বাংলার কংগ্রেসে জমিদারদের প্রভাব ছিল খুবই বেশি। দেশবন্ধুর অনুগামী বিত্তশালী 'পাঁচ নেতা' (বিগ ফাইভ)—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, তুলসী গোস্বামী, নলিনীরঞ্জন সরকার, শরৎচন্দ্র বসু ও নির্মলচন্দ্র চন্দ্র।

যতীন্দ্রমোহন একজন শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নেতা এবং গান্ধীজীর একান্ত আস্থাভাজন কাজেই যুগান্তর দল তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতো কিন্তু অনুশীলন দল তার সমর্থক না হওয়ায় তারা কংগ্রেসী রাজনীতির ক্ষেত্রে তার বিরোধিতা করতে থাকে। এর ফল খুবই খারাপ হয়েছিল। বাংলায় কংগ্রেসের প্রভাব দারুণভাবে হ্রাস পায়। এক মেদিনীপুর ছাড়া প্রায় সমস্ত জেলাতেই কংগ্রেস সংগঠন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায়। বাংলা কংগ্রেসে সেনগুপ্ত বিরোধীরা অর্থাৎ অনুশীলন দলের কর্মীরা সেনগুপ্তের তীব্র বিরোধিতা করতে থাকেন যার ফলে ১৯২৯ সালের ১৭ই নভেম্বর যতীন্দ্রমোহন প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক কমিটি থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই কমিটিতে তিনি আর কখনও স্থান পাননি। ১৯৩০ সালে যতীন্দ্রমোহন কলকাতা পুরসভার মেয়র নির্বাচিত হলেও কারারুদ্ধ থাকার জন্য আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে অসমর্থ হওয়ায় তার নির্বাচন বাতিল হয়ে যায়। সুভাষচন্দ্র নিজে প্রার্থী হওয়ায় যতীন্দ্রমোহনকে আবার নির্বাচনে দাঁড় করানোও সম্ভব হয়নি।

যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর বাংলা কংগ্রেসে দলাদলি ও তার পরিণতি সম্বন্ধে গান্ধীজী গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। বাংলায় কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি সত্ত্বেও জনগণ তাদের লড়াই চালিয়ে যায়। ১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে পুলিস মিছিলে যোগদানকারী সকলের উপর নির্মমভাবে লাঠি চালায়। মেয়র সুভাষচন্দ্র সহ বহু বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ও কর্মী আহত হন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একজন সাধারণ কয়েদীর চাইতেও খারাপ ব্যবহার করা হয়। ফলে সারা বাংলায় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

সুভাষচন্দ্রের উপর সরকার তীব্র দৃষ্টি রেখেছিল। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে যিনি পালটা সরকার গঠনের প্রস্তাব এনেছিলেন তাঁর সম্পর্কে সরকারের উদ্বিগ্ন থাকার যথেষ্ট কারণ ছিল। ইতিমধ্যে গোলটেবিল বৈঠক প্রভৃতির পালা চুকে গিয়ে গান্ধীজী যখন হরিজন সমস্যার প্রতি তাঁর সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করলেন এবং আন্দোলন মূলতবী রাখা হল তখনকার অবস্থার উল্লেখ করে সুভাষচন্দ্র সক্ষোভে মন্তব্য করেন: "আইন অমান্য আন্দোলনই বটে।" (দ্য ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল ১৯২০-১৯৪০, পৃঃ ২৮৭)

১৯৩২ সালে আবার আন্দোলন শুরু হলে একেবারে প্রথম থেকেই সরকার পক্ষ প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করে। বাংলায় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা তৎপর হয়ে ওঠেন। এর ফলে দমননীতির প্রচণ্ড আঘাত নেমে আসে বাংলার উপর। চট্টগ্রাম, ঢাকা ও মেদিনীপুরকে কার্যত সামরিক বাহিনী ও পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ভারত সরকারের আইনের তূণ থেকে ব্রহ্মাস্ত্রের পর ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করা হয় অহিংস ও সহিংস উভয় প্রকার আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য। বাংলায় অসংখ্য আইন জারি করে নাগপাশে বেঁধে ফেলা হয় জনগণকে। এই অবস্থায় গান্ধীজীর অনশন এবং পরে ফলশ্রুতিরূপে পুণা চুক্তি সম্পাদিত হওয়া সুভাষচন্দ্রের মতে আন্দোলনকে 'পথভ্রষ্ট' করে। তিনি চুক্তির ইতিবাচক দিকগুলি মেনে নিয়েও স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে এর ফল হয়েছিল গুরুতর।

১৯৩১ সালের 'স্বাধীনতা দিবসে' বে-আইনী মিছিলের নেতৃত্ব গ্রহণের অভিযোগে সুভাষচন্দ্রের ছয় মাস কারাদণ্ড হয়েছিল। ১৯৩২ সালে আবার আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্বাহ্নেই কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

বাংলায় সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতাদের বন্দী করা হয় শরৎ চন্দ্র বসুকে তাঁর কার্শিয়াং-এর বাড়িতে অন্তরীণ করা হয়।

কারাগারে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের গুরুতর অবনতি ঘটে। চিকিৎসকরা তাঁকে মুক্তি দেওয়ার সুপারিশ করেন। সরকার সুভাষচন্দ্রকে দেশের মধ্যে রাখা নিরাপদ বলে মনে করল না। স্থির হল তাঁকে ইয়োরোপে পাঠানো হবে, তবে খরচপত্র সুভাষচন্দ্রকেই বহন করতে হবে।

সুভাষচন্দ্র বন্দী হয়েছিলেন ৩ আইনে (Regulation 3)। সুভাষচন্দ্রকে বিদেশে পাঠানোর ব্যাপার নিয়ে অনেক হাঙ্গামা হল। সরকার দুইজন বিচারপতির অভিমত জানতে চাইল। বিচারপতি কে সি নাগ ও বিচারপতি এ সি ব্ল্যাংক সুভাষচন্দ্রকে অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক বলে মন্তব্য করলেন এবং তাঁকে ঐ আইনে আটক রাখা ঠিকই হয়েছে বলে মন্তব্য করলেন। তারা বললেন যে, সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে এবং তাঁর কার্যকলাপ ব্রিটিশ ডোমিনিয়ানের নিরাপত্তা গুরুতরভাবে বিপন্ন করছে। ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর বিচারপতিদ্বয় স্বয়ং তাদের রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টে সুভাষচন্দ্রকে ইয়োরোপে পাঠানো যেতে পারে এমন একটা ইঙ্গিতও দেওয়া হল। অনেক শলাপরামর্শ ও টাল বাহানার পর ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সুভাষচন্দ্রকে সোজা বোম্বাইতে নিয়ে গিয়ে জাহাজে তুলে দেওয়া হল। ইংল্যাণ্ডে ও জার্মানীতে তিনি যেতে পারবেন না পাসপোর্টে এ কথাও বলে দেওয়া হল। সুভাষচন্দ্র পৌঁছুলেন গিয়ে ভিয়েনায়। ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার অনুমতি না পেলেও শেষ পর্যন্ত জার্মানীতে যাওয়ার অনুমতি তিনি পেয়েছিলেন।

ভিয়েনায় উপনীত হওয়ার অল্পকাল পরেই লণ্ডনে এক রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য সুভাষচন্দ্র আমন্ত্রিত হলেন। কিন্তু লণ্ডনে যাওয়ার তাঁর উপায় নেই, তাই তিনি তাঁর লিখিত সভাপতির ভাষণ পাঠিয়ে দিলেন। সম্মেলনে ভাষণটি নিয়ে খুব হৈ চৈ পড়ে যায়।

সুভাষচন্দ্রকে কেন ইংল্যাণ্ডে যেতে দেওয়া হচ্ছে না এই প্রশ্ন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় বার বার তোলা হয়। জবাবে স্যার হ্যারি হেগ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, সুভাষচন্দ্রকে শুধু স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যেহেতু সুভাষচন্দ্র বৈপ্লবিক ও হিংসাত্মক আন্দোলনের

সঙ্গে জড়িত সেইহেতু চিকিৎসার জন্য ছাড়া অন্য দেশে তাঁরা যাওয়া ব্রিটিশ সরকার বাঞ্ছনীয় মনে করে না।

লণ্ডন সম্মেলনে পঠিত সুভাষচন্দ্রের ভাষণ সাম্রাজ্যবাদী মহলে রীতিমত আতঙ্ক সৃষ্টি করে এবং সামুদ্রিক গুপ্ত আইনের বলে ভাষণটির কপি ভারতবর্ষে পাঠানো নিষিদ্ধ করা হয়।

বিপ্লবী পার্টি গঠনের আবশ্যকতার উপর সুভাষচন্দ্র জোর দেন। পার্টির নাম দিলেন "সাম্যবাদী সংঘ"। সুভাষচন্দ্র পরে বলেছিলেন যে প্রাচীন ভারতবর্ষে বৌদ্ধ যুগে সাম্যের ধারণা ছিল, তাই তিনি কোন ইয়োরোপীয় শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে 'সাম্য' কথাটি ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র মার্কসবাদ পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি এবং তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা অনুযায়ী মার্কসবাদকে একটি ভারতীয় রূপ দিতে চেয়েছিলেন। অবশ্য তিনি দল গঠন করতে চেয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিরই অনুকরণে। 'সাম্যবাদী সংঘ' কংগ্রেস ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষকসভা প্রভৃতি সংস্থায় অংশগ্রহণ করবে এবং সমস্ত গণ-সংগঠনে তার প্রভাব বিস্তার করে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে এই কথা তিনি বলেছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের ভাষণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী মহলে রীতিমত উদ্বেগ ও ভীতির সঞ্চার করেছিল। তখনই তারা 'সাম্যবাদী সংঘ' নামক দলটিকে বে-আইনী ঘোষণা করার কথা ভেবেছিল। গোয়েন্দা বিভাগের গোপন রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, বোস "বিদেশে নিরাপদে থেকে নিজেকে স্পষ্টতঃই আগামী ভারতীয় বিপ্লবের লেনিনরূপে বিজ্ঞাপিত করতে চাচ্ছেন।" (দ্রঃ সুভাষচন্দ্র দুটি বছর, কৃষ্ণা বসু, দেশ, ২৩ জানুয়ারি, ১৯৮২)

সুভাষচন্দ্র যখন তাঁর ভাষণ লেখেন তখন ভারতবর্ষে আন্দোলন মূলতবী রাখা হয়েছে। এই ঘটনার উল্লেখ করে সুভাষচন্দ্র লেখেন: "...ভারতবর্ষ এক আশ্চর্য দেশ" কি অজুহাতে আন্দোলন মূলতবী রাখা হল তা তিনি বুঝতে পারেন নি। তিনি পরিষ্কারভাবেই বলেছিলেন যে আন্দোলন আপসহীন বা আপসকামী হতে পারে, কিন্তু গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন এর কোনটিই নয়।

ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যেকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে সুভাষচন্দ্র দেখিয়ে-

ছিলেন আপসহীন সংগ্রাম ছাড়া সাম্রাজ্যবাদকে হটানো যাবে না। অতএব এমন দল গড়তে হবে যা আপসহীন সংগ্রামে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারবে।

সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর বিপুল প্রভাব লক্ষ্য করে এমনও আশা করেছিলেন যে, গান্ধীজী হয়তো শেষ পর্যন্ত আপসহীন সংগ্রাম সমর্থন করবেন। কিন্তু গান্ধীজীর নেতৃত্বের উপর তিনি তখন আস্থা হারিয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালের মে মাসে গান্ধীজীর অনশন ; তাঁর মুক্তিলাভ ও আন্দোলন মুলতবী রাখার খবর পেয়ে তিনি এবং বিঠলভাই প্যাটেল (সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দাদাও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার খ্যাতনামা অধ্যক্ষ) এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন যে, আইন অমান্য আন্দোলনরূপ স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং নতুন নেতৃত্বে কংগ্রেসকে ঢেলে সাজান দরকার।

সুভাষচন্দ্র সাহসের সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নতুন সংগ্রামী আবহাওয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর প্রচেষ্টা শুরু করলেন কিন্তু গান্ধীজীর বিপুল প্রভাব অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না।

তাঁর মনোভাব সম্পর্কে বাংলার বিপ্লবীদের একাংশের মধ্যে যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল তার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'যুগান্তর' দলের এককালের শীর্ষস্থানীয় কর্মী ও পরে কমিউনিস্ট মতাবলম্বী নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

"এই সময়ে (৩২-৩৩) সুভাষচন্দ্র ইয়োরোপে ছিলেন। ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃতি ও পরিণতি দেখে তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন কংগ্রেস অহিংসা নীতি ছেড়ে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ ধরতে পারে কিনা।"

এই গ্রন্থ লিখে তিনি বিশ্ববিখ্যাত রোমা রেঁলার সঙ্গে দেখা করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, ভারতের সংগ্রামে যদি অহিংসা নীতির অযোগ্যতা প্রমাণিত হয়, যদি অহিংসা নীতি স্বাধীনতা অর্জনে ব্যর্থ হয়, তাহলে আমাদের পক্ষে অন্য পন্থা অবলম্বন করা কি অন্যায় হবে ?

তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'না, অন্যায় হবে না।'

"সুভাষচন্দ্র সশস্ত্র বিপ্লবের কথা ভাবেন অথচ কংগ্রেসের নামেই সেটা করতে চান, মহাত্মার আশীর্বাদের মোহ কিছুতে ত্যাগ করতে পারেন না, তাঁর ব্যর্থতার মূল এইখানে।" (বিপ্লবের সন্ধানে, পৃঃ ২১৫)

সুভাষচন্দ্র দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, সন্দেহ নেই, কিন্তু একারণে নয়। জওহরলালের

মত আধুনিক মানুষ সুভাষচন্দ্রের মতে গান্ধীজীর পরেই যিনি ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় নেতা তিনি পর্যন্ত অনেক কথা বলেও গান্ধীজীর নেতৃত্বকেই মেনে চলেছিলেন। এই অবস্থায় সরাসরি বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে ধরা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

যাই হোক সুভাষচন্দ্রের ভাষণ প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং কংগ্রেসের প্রবীণ নেতারা রীতিমত বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে উদ্বেগ ও আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল।

ইয়োরোপে থাকাকালে সুভাষচন্দ্র একাধিকবার ফ্যাসিস্ট নায়ক মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। জার্মানীতেও গিয়েছিলেন একাধিকবার। ইয়োরোপে যে আর একটি মহাযুদ্ধ আসন্ন একথা বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু অক্টোবর মহা-বিপ্লবের পর সমগ্র পৃথিবীর রাজনীতি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে এবং তার ফলে প্রথম মহাযুদ্ধের সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘটনাবলী একইরকম হওয়ার সম্ভাবনা নেই এ কথা তিনি বুঝতে পারেন নি। ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের চরিত্রও তাঁর কাছে সম্যক উদ্ঘাটিত হয়নি। ফলে ফ্যাসিজম-নাৎসীজম তাঁর কাছে উগ্র বা জঙ্গী জাতীয়তাবাদরূপেই প্রতিভাত হয়েছিল। কমিউনিজম ও অক্টোবর মহা-বিপ্লবও তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। তাই দেখা গেল সুভাষচন্দ্র কমিউনিজম ও ফ্যাসিজম-এর মধ্যে একটা সমন্বয়সাধন করার কথা ভাবছেন।

তাঁর প্রস্তাবিত নতুন বিপ্লবী দলের কর্মসূচীতে তিনি একদিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পূর্ণ সাম্যের কথা বলেছেন, আবার অপরদিকে 'এক জাতি, এক নেতা ও এক দলে'র ধ্বনি তুলেছেন।

ইয়োরোপে প্রায় তিন বছর বাস করে ইতালি, জার্মানী, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ঘুরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নে সকলকে আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর সক্রিয় সহযোগী ছিলেন ঝাকেরভাই প্যাটেল। তিনি অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক মাস ভারতবর্ষের পক্ষে প্রচার চালান এবং গুরু পরিশ্রমের ফলেই শহীদের মৃত্যু বরণ করেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সুভাষচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "দ্য ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল" রচনা করেন।

এই গ্রন্থে তিনি ১৯৩৩-৩৪ সালকে 'পরাজয় ও আত্মসমর্পণে'র বছর বলে চিহ্নিত করেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই সুভাষচন্দ্রের একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য তিনি যে কোন উপায় অবলম্বন করতে প্রস্তুত। তাঁর এই দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় পেয়ে সেদিন উদ্বিগ্ন হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী সরকার ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ।

গান্ধীজী তখন কংগ্রেস ছেড়ে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, কিন্তু তার আগে কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র নতুন করে রচনা করে গান্ধীজীর অনুগামী নেতাদের অবস্থান দৃঢ়তর করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে গান্ধীজীর যোগ রয়েছে অক্ষুণ্ণ। অর্থাৎ যে কোন সঙ্কটের অবস্থায় গান্ধীজী আবার কংগ্রেসের হাল ধরতে পারেন।

দেশের এই পরিস্থিতি উপলব্ধি করে সুভাষচন্দ্র নতুন বিপ্লবী দল গঠনের উপরেই ভরসা রাখলেন।

ইয়োরোপের আকাশে তখন মহাযুদ্ধের ঘনঘটা। ব্রিটিশ সরকার নাৎসী জার্মানীকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত। এই কারণেই তারা সুভাষচন্দ্রের জার্মানী ও ইতালিতে বার বার সফর নিয়ে মাথা ঘামায় নি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রতিহত করার কথাই তখন তারা ভাবছে এবং তার কর্মসূচীও তৈরি হয়ে গেছে।

(৩)

১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সূর্য সেন (মাস্টার দা), অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, নির্মল সেন প্রমুখ অন্তরীণ দশা থেকে মুক্তিলাভ করে আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন। এদের উদ্যোগেই শরীরচর্চা কেন্দ্র, কংগ্রেস অফিস প্রভৃতি খোলা হয়। সূর্য সেনই প্রথম ১৯২৯ সালে চট্টগ্রামে কংগ্রেস অফিস খোলেন, তার আগে সেখানে কোন কংগ্রেস অফিস ছিল না।

১৯২৯ সালের মে মাসে বিভিন্ন সম্মেলন উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ে তোলা হয়।

এরপর থেকেই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা শুরু হয় এবং বিভিন্ন দলের সঙ্গে যোগ রেখে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা চলে। যুগান্তর দলের নেতারা সশস্ত্র

অভ্যুত্থানের পর তা' তাদের দলের কৃতিত্ব বলে দাবি করলেও আসলে অসহযোগ আন্দোলনে বিপ্লবী দলগুলির যোগদানের পর থেকেই বিপ্লবী তরুণদের মনে অসন্তোষের আগুন ধোঁয়াচ্ছিল। 'দাদারা' কিছু করতে বলে না এই ধারণা অনেকের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে।

দেশবন্ধু বেঁচে থাকতেই 'যুগান্তর' দল অস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে কঠোর বিধিনিষেধ জারি করেছিল। ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন: "আমার তো স্বতঃসিদ্ধি মূলসূত্র ধরা আছে: বিপ্লব যজ্ঞবাদ। এর জন্য আমরা যথেষ্ট সংযম রক্ষা করে চলার ব্যবস্থা রেখেছিলাম। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের কোন অনুমতিই কাউকে দেওয়া ছিল না। পাছে বে-হিসাবী, বেতালাভাবে কেউ কেউ নিয়মভঙ্গ করে ফেলে সে জন্য 'সামরিক বিভাগ' আমি নিজের হাতে রেখেছিলাম।

এখন শুধু কংগ্রেসের মারফত স্বাধীনতার বাণী বহন করে জনগণের মধ্যে ঢুকে পড়তে হবে। কংগ্রেসে ঢুকেছিলাম আমরা, এ কথা ঠিক। কিন্তু আমাদের একটা আলাদা বিপ্লবী কর্তৃপক্ষ আড়ালে রাখা ছিল। কেননা তখনও তো কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করে নি। তাই তার সঙ্গে বিনা সঙ্কোচে, বিনা শর্তে মিশে যাওয়া চলে না।" (বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, পৃঃ ৪০৫)

দেশবন্ধুর কাছে সমস্ত বিপ্লবী দল বৈপ্লবিক তৎপরতা কিছুকালের জন্য চালাবেন না বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল 'যুগান্তর' ছাড়া অন্যান্য দল সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নি এমন অনুযোগও ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় করেছেন।

বলা বাহুল্য 'যুগান্তরে'র অনেক তরুণ বিপ্লবী ব্যবস্থাটা পছন্দ করেন নি এবং তাদের খুশি রাখার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে 'এ্যাকশনে'র ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

অনুশীলন দল যুগান্তর দলের অনুসরণ না করলেও বাংলায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে বিশেষ কোন তৎপরতার পরিচয় দেয় নি বা দিতে পারে নি। তবে পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে অনুশীলন দলের যোগ ছিল।

অবস্থা যখন এই রকম তখন ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে বিপ্লবী দলগুলির ঐক্যবদ্ধভাবে সুভাষবাবুর নেতৃত্বে সামরিক কায়দায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন বিপ্লবীদের মনে বিশেষ উৎসাহ জাগায় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনের হিড়িক পড়ে যায়। এ ব্যাপারে সব থেকে বেশি কৃতিত্ব দেখায় চট্টগ্রাম।

এই ব্যাপারে তাদের কোন অবদান ছিল না। সূর্য সেনের নেতৃত্বে তাঁর সহকর্মীরা গোপন সংগঠন গড়ে তোলা, সামরিক শৃঙ্খলা স্থাপন ও সুপরিকল্পিত-ভাবে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৯৩০ সালের ৮ এপ্রিল চট্টগ্রামে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে, যুগপৎ রেলওয়ে স্টেশন অস্ত্রাগার ও পুলিস অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত এবং টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস অধিকৃত হয়।

সূর্য সেনের নেতৃত্বে গঠিত 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি (ভারতীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনী) এই অভ্যুত্থান ঘটায়, কোন পার্টির নাম তাঁরা গ্রহণ করেন নি।

সূর্য সেন ও তাঁর সহকর্মীরা এক সময় যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করতেন একথা ঠিক কিন্তু যুগান্তরের নেতাদের অগ্রাহ্য করে স্বাধীনভাবেই কাজ করেছিলেন।

চট্টগ্রামে একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে এটা যুগান্তর দলের নেতারা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তরুণ বিপ্লবীদের শান্ত রাখার উদ্দেশ্যে একটা প্ল্যানও ছকে ফেলেছিলেন। চট্টগ্রামের 'অভ্যুত্থান' সিগন্যাল স্বরূপ হবে এবং যুগপৎ বিভিন্ন অঞ্চলে সাহেব মারার কার্যসূচী অনুসরণ করতে হবে—এই ছিল প্ল্যান। ছেলেরা নিজ নিজ ঘাঁটিতে নিজস্ব প্ল্যান তৈরি করে কাজে নেমে পড়বে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কাজ শুরু হতে না হতেই সব ভেস্তে গিয়েছিল, কারণ চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের পরেই পুলিস খুব সতর্ক হয়ে যায় এবং কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

চট্টগ্রামে সশস্ত্র অভ্যুত্থান যখন সারা দেশে প্রবল আলোড়ন তুলেছে, তখনই দেখা যায় যে, বাংলা কংগ্রেসে সুভাষ-যতীন্দ্রমোহন বিরোধ—যা ছিল প্রকৃত পক্ষে সুভাষ-গান্ধীজী বিরোধ—চরমে উঠেছে। বিরোধ মীমাংসার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বাংলায় তখন কংগ্রেসের দপ্তর সুভাষ সমর্থকদের হাতে। বহুবার তদন্ত করেও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এমন কি স্বয়ং মতিলাল নেহরুও সুভাষচন্দ্রের সমর্থকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের আবেদনক্রমে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি শ্রীএম এস অ্যানেকে আবার তদন্ত চালানোর নির্দেশ দেয়।

প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীঅশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী লিখেছেন : "১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে কলিকাতায় আসিয়া বেলতলা মহারাষ্ট্র ভবনে বিচারালয় স্থাপন করেন। সে এক বিরাট ব্যাপার। বাংলাদেশের সকল জেলা হইতেই কাগজপত্র লইয়া কংগ্রেস নেতারা কলিকাতায় উপস্থিত। অধিকাংশেরই অবস্থান কংগ্রেস অফিসে। বিচারের সময় সেনগুপ্ত মহাশয়ের দলের পক্ষ সমর্থন করেন শ্রীনিশীথচন্দ্র সেন (ব্যারিস্টার) ও তাঁহার জুনিয়ারগণ এবং সুভাষচন্দ্র বসুর পক্ষ সমর্থন করেন বহু জুনিয়র সহ শ্রীশরৎ চন্দ্র বসু মহাশয়।"

(স্মরণিকা : শহীদ তারকেশ্বর সেন)

এই বিচার বা তদন্ত চলাকালেই হিজলী বন্দী নিবাসে গুলি চলে। তারকেশ্বর সেন ও সন্তোষ মিত্র শহীদ হন, আহত হন বহু রাজবন্দী। সমগ্র বাংলার মানুষ প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ নিজে ময়দানের শোকসভায় উপস্থিত হয়ে যে ভাষণ দেন এবং তাঁর যে বিখ্যাত কবিতা 'প্রশ্ন' পাঠ করেন তা হাজার হাজার মানুষের মনে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

হিজলার ঘটনাই সমস্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং যুগান্তর-অনুশীলন তথা সুভাষ-যতীন্দ্রমোহন বিরোধের অবসান ঘটায়। দুই দল থেকে ১৫ জন করে সদস্য নিয়ে নতুন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়। নির্মলচন্দ্র চন্দ্র সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি এবং নিশীথচন্দ্র সেন ও অশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী যুগ্ম সম্পাদক মনোনীত হন।

হিজলীর ঘটনার ফলে কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটলেও যুগান্তর ও অনুশীলন দলের মধ্যে মিলন ঘটানো সম্ভব হয়নি।

উভয় দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টা করে যুগান্তর দলের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় সক্রিয় রাজনীতি পরিহার করেন। তিনি লিখেছেন : "জীবনে যা মূলমন্ত্র ধরেছি তাকে খুইয়ে আত্মঘাতী রাজনীতিতে অংশ নিলাম না। সাধের বাংলায় কর্মক্ষেত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখলাম। স্থির করলাম যে দলই সাহায্য নিতে আসবে তাকেই সাধ্যমত সাহায্য করব।"

(বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, পৃঃ ৪৫৪)

তারকেশ্বর সেন সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অরুণচন্দ্র গুহ লিখেছেন :

"যুগান্তর দল তখন দ্বিমুখী কর্মধারা চালাচ্ছিল। বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে

কয়েকজন রইলেন কংগ্রেসের আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে। অপর দিকে কয়েকজন রইলেন অহিংস বিপ্লবী কর্মধারা নিয়ে।"

দ্বিমুখী কর্মধারার উদাহরণস্বরূপ অরুণচন্দ্র গুহ মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার অন্তর্গত চেচুয়াহাট গ্রামের 'যুগান্তরে'র কর্মী বলেন, গোস্বামীর নেতৃত্বে পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের এবং ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে মেদিনীপুরের জেলা শাসক পেডীর হত্যার উল্লেখ করেছেন। (প্রকৃতপক্ষে পেডীর কৃতিত্ব বি ভিব লিঃ)। (স্মরণিকা: শহীদ তারকেশ্বর সেন)

১৯৩১ সালের ২৭ জুলাই ২৪ পরগণার জেলা জজ গার্লিক নিহত হন যুগান্তর দলের কর্মী কানাই ভট্টাচার্যের হাতে। তিনি পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। দীর্ঘকাল তার পরিচয় কেউ জানতে পারে নি। সম্ভবত যুগান্তর দলের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের এইটিই শেষ নিদর্শন। কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করার পর কংগ্রেসের মধ্যেই যুগান্তর দলের অবলুপ্তি ঘটে।

অনুশীলন দলও কংগ্রেসের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় বৃত থাকে। তবে পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ রেখে অনুশীলন দল ভগৎ সিংকে সাহায্য করে। লাজপৎ রায়ের উপর পুলিসের আক্রমণ ও তার ফলে তাঁর মৃত্যু হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্টিক রিপাবলিক্যান পার্টির মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং ভগৎ সিং-এর প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসংকল্প হন। লাজপৎ রায়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী স্কটকে হত্যা করতে গিয়ে তার এক সহকারীকে হত্যা করেন।

ভগৎ সিং সাহেবের ছদ্মবেশে কলকাতায় পালিয়ে আসেন। কলকাতা কংগ্রেসেও (১৯২৮) তিনি উপস্থিত ছিলেন। অনুশীলন দলের নেতা প্রতুল গাঙ্গুলী তাঁকে একটি রিভলভার দেন। ব্যবস্থা পরিষদ ভবনে বোমা বিস্ফোরণের পর যখন ভগৎ সিং ধরা পড়েন তখন তিনি ঐ রিভলভারটি পুলিসের হাতে তুলে দেন। ভগৎ সিং গান্ধীজীর কর্মনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন।

পাঞ্জাবের ও উত্তর প্রদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ রাখার মধ্যেই অনুশীলন দলের বৈপ্লবিক তৎপরতা সীমাবদ্ধ থাকে।

এ সময় মুক্তিসংঘ নামে পরিচিত বিপ্লবী গোষ্ঠী কলকাতা কংগ্রেসের পর বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বি ভি) নামে খ্যাত হয় এবং হেমচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে পূর্ণোদ্যমে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। ১৯৩২-৩৩ সালে এই গোষ্ঠীর

কর্মীদের হাতে মেদিনীপুরে তিন তিন জন ম্যাজিষ্ট্রেট নিহত হয়। এটি বাংলায় সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার ক্ষেত্রে একটি রেকর্ড। এ ছাড়া পূর্ববঙ্গের ঢাকা প্রভৃতি স্থানে একাধিক ইংরাজ রাজকর্মচারী হতাহত হন। এক কথায় বলা যায় যে, যুগান্তর ও অনুশীলন যখন কার্যত বৈপ্লবিক কার্যকলাপ পরিহার করতে চলেছে তখন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এক নতুন পরিসর লাভ করে।

গান্ধী-আরউইন চুক্তির শর্তাদি তাঁদের ক্ষেত্রে বলবৎ নয় এবং তাঁদের ইচ্ছামত কাজ করবেন বলে বিপ্লবীরা সরকারকে জানিয়ে দেওয়ার পর ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি ব্রিটিশ সরকার বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা করে।

বকসা ক্যাম্পে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মাধ্যমে এই বোঝাপড়ার প্রস্তাব 'অনুশীলন' দলের নেতা প্রতুল গাঙ্গুলীর কাছে উত্থাপন করা হয়।

বিপ্লবী বন্দীরা কয়েকটি শর্তে প্রস্তাবটি নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে রাজি হন। শর্তগুলি হল : (১) বিনাশর্তে বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে, (২) সূর্য সেনের (মাস্টার দা) বিরুদ্ধে জারি করা সমস্ত হুকুমনামা ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বিনাশর্তে প্রত্যাহার করতে হবে, (৩) মীমাংসা চেষ্টা ব্যর্থ হলে সূর্য সেনকে নিরাপদে তাঁর জায়গায় ফিরে যেতে দেওয়া হবে, (৪) আলোচনা সম্পূর্ণ গোপনে চলবে এবং সরকার ও বিপ্লবীদের মধ্যে পত্রালাপ সিল-মোহর করা খামের মাধ্যমে করতে হবে।

বকসা ক্যাম্পের সব বিপ্লবী দল ও উপদলের বৈঠকে সকলের পক্ষ থেকে আলোচনা চালানোর দায়িত্ব অর্পণ করা হয় 'যুগান্তর' দলের সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (মধুদা) এবং 'অনুশীলন' দলের প্রতুল গাঙ্গুলীর উপর।

যতীন্দ্রমোহনকে সব কথা জানানো হয় এবং তিনি বকসা ত্যাগ করার সময় বলে যান যে তিনি দার্জিলিং-এ বাংলার লাট স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসনকে এ বিষয়ে অবহিত করার পর ইংল্যাণ্ডে চলে যাবেন। কারণ গান্ধীজী তাকে সেই রকম নির্দেশ দিয়েছেন। সেখানে তিনি দেশের পরিস্থিতি ও বিপ্লবীদের সঙ্গে আলোচনার ফলাফল নিয়ে কথাবার্তা বলবেন।

কয়েকদিন পরে প্রতুলবাবুরা ক্যাম্প-কম্যাণ্ডান্টের বাংলার স্বরাষ্ট্রসচিব উইলিয়াম প্রেন্টসের এক পত্র পেলেন।

পত্রের মূল কথা ছিল এই যে, মীমাংসা সম্পর্কে বিপ্লবীরা যে প্রস্তাব পেশ

করেছেন তা অস্পষ্ট, কাজেই তাঁরা যদি একটা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করেন তা হলে স্বয়ং পররাষ্ট্র সচিব বকসায় তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত আছেন। পত্রে সূর্য সেন সম্পর্কে একটি কথাও বলা হয়নি।

কম্যাণ্ডান্ট ফিকে সাহেব চিঠিটায় কিছু রদবদল করেছেন বলে বিপ্লবী নেতাদের সন্দেহ হয়। তাঁরা পত্রের জবাবে জানালেন যে, তাঁরা কয়েকটি শর্তে আলোচনা করতে রাজি হয়েছিলেন, তাঁরা কোন প্রস্তাব সরকারের কাছে পেশ করেন নি। আলোচনার প্রস্তাব করা হয়েছে সরকার পক্ষ থেকে।

এখানেই সরকার ও বিপ্লবীদের মধ্যে আলোচনা প্রচেষ্টার অবসান ঘটে।

আসলে সরকার দেখাতে চেয়েছিল যে, বিপ্লবীরাই সরকারের সঙ্গে একটা মীমাংসা করতে চায়, সরকার নয়। (বিপ্লবীর জীবন দর্শন, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, পৃঃ ৩৫১-৩৫৫)

বলাবাহুল্য সরকারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র ও বাঙলার বিপ্লবীরা

(৪র্থ পর্ব)

[১৯৩৫-১৯৪২]

গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবনের ট্র্যাজিডির সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত অহিংস অ-সহযোগ আন্দোলনের গোড়া থেকেই। সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে জনগণ হিংসা ও অহিংসার সীমারেখা বারবার মুছে ফেলছিল। গান্ধীজী তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে গিয়ে বারবার ব্যর্থকাম হচ্ছিলেন এবং আন্দোলন শুরু করে 'হিমালয়তুল্য ভুল' করেছেন বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।

চৌরি-চৌরার ঘটনা তাঁকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল, কিন্তু ১৯৩০-৩১ সালের ঘটনাবলী তাঁকে একেবারে বিমূঢ় করে দিল। যা ছিল এতদিন স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ তা পরিণত হল সংগঠিত ও সচেতন বিক্ষোভ ও প্রতিরোধে। সারা দেশে জঙ্গী জাতীয়তাবাদ ও কমিউনিজমের শক্তি প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছে দেখে গান্ধীজী বুঝলেন যে নতুন করে আন্দোলন শুরু করলে তা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তাঁর থাকবে না।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কথাটা আগেই বুঝেছিল এবং স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্তও করেছিল।

যাই হোক গান্ধীজী আর আন্দোলনের ঝুঁকি নিতে চাইলেন না এবং এ ব্যাপারে জঙ্গী জাতীয়তাবাদী সুভাষচন্দ্রের মত স্বল্প সংখ্যক কংগ্রেস নেতা ছাড়া আর সকলেই গান্ধীজীর সিদ্ধান্তে খুশি হলেন। তারা তখন নতুন সংবিধানে যতটুকু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা কাজে লাগাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। এবার শুরু হল নিয়মতান্ত্রিক লড়াই।

গান্ধীজী কংগ্রেস ত্যাগ করে হরিজন, খাদি, কুটিরশিল্প সম্প্রসারণ ইত্যাদি আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অবশ্য কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর যোগ

অক্ষুণ্ন ছিল। রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁর মতামত প্রকাশেও তিনি কখনও বিরত হন নি।

১৯৩৪ সালের ২৩শে ডিসেম্বর গান্ধীজী আগাথা হ্যারিসনকে লেখা এক চিঠিতে স্যার স্যামুয়েল হোর প্রস্তাবিত নতুন শাসন সংস্কারের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি চিঠিতে এই অশ্বাস দেন যে তিনি তাড়াহুড়ো করে কিছু করবেন না। তাঁর অভিপ্রায় সম্পর্কে তিনি আগে-ভাগেই সব জানিয়ে দেবেন, আর সবই তো ঈশ্বরের হাতে—চিঠির শেষাংশে তিনি এই কথা লেখেন।

১৯৩৫ সালের নতুন শাসন সংস্কার দেশ অগ্রাহ্য করে এমন কি মডারেট নেতারাও ধিক্কারে সোচ্চার হয়ে ওঠেন।

১৯৩৫ সালের ৩রা জানুয়ারি কার্ল হীরকে লেখা এক চিঠিতে গান্ধীজী জানান যে তিনি শ্বেতপত্র ও জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটির রিপোর্ট'কে একটি অখণ্ড দলিল রূপেই অনুধাবন করেছেন এবং গ্রহণযোগ্য কিছুই দেখতে পান নি চিঠিতে তিনি মডারেট নেতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর অভিমত উদ্ধৃত করেন। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বলেছিলেন যে, দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাহ্য করে যারা একটা সংবিধান জারি করেছেন তাদের সঙ্গে সহযোগিতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তিনি বলেন এই সহযোগিতাকে "আমি বলব আত্মহত্যা।"

এইসব চিঠিপত্র থেকে বোঝা যায় যে, গান্ধীজী কংগ্রেস ছাড়লেও রাজনীতি ছাড়েন নি। রাজনৈতিক সমস্ত ঘটনার উপর তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন। নতুন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার তিনি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন নি, তবু সরকারের মনোভাব পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি একেবারে আশা ছাড়েন নি। ১৯৩৫ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তিনি শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লাকে লিখেছেন যে, স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার হেনরি ক্রেগকে চিঠি লেখার কথা তিনি ভাবছেন।

গান্ধীজীর কার্যকলাপ ও বিভিন্ন সময়ের উক্তি ও বিবৃতি বেশ গভীরভাবেই অনুধাবন করছিল ভারতীয় ধনিকশ্রেণী এবং ভারত সরকার। তিনি যে নতুন কোন আন্দোলন শুরু করতে চাইছেন না এটা জেনে উভয় পক্ষই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। আর এরই সঙ্গে শুরু হয়েছিল গান্ধীজী ও সরকারের মধ্যে বিড়লাজীর দূতিয়ালী। দেখা যায় যে, শেঠজীর উপর গান্ধীজীর আস্থা ছিল অপরিসীম। তিনি শেঠজীকে জানিয়েছিলেন যে, স্যার হেনরি ক্রেগকে তিনি কোন চিঠি লিখলে তা আগে তিনি শেঠজীর কাছে পাঠিয়ে দেবেন এবং শেঠজী

যদি তা পছন্দ না করেন তাহলে চিঠিটা স্যার হেনরী ক্রেগের কাছে যেন পাঠানো না হয়।

এর পরেই বিড়লাজীর মধ্যস্থতায় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও স্যার ক্রেগের এক বৈঠক হয়। বৈঠকের বিস্তারিত বিবরণ গান্ধীজীকে জানানো হয়। গান্ধীজী ১৮ই ফেব্রুয়ারি সর্দার বল্লভভাইকে লেখা এক চিঠিতে আলোচনা চালিয়ে যেতে বলেন। এর আগে সরকারের পক্ষে থেকে একটা চা পার্টিতে গান্ধীজী ও কংগ্রেস বিধায়কদের আমন্ত্রণ করে আপস-আলোচনার সূত্রপাত করার চেষ্টা ছিল রাজা সানির মাধ্যমে। তবে গান্ধীজী ও কংগ্রেস এম এল এ-রা আমন্ত্রণ গ্রহণ না করায় কিছুই হয় নি। তবে উভয় পক্ষই যে ক্রমেই কাছাকাছি আসছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

১৯৩৫ সালের ২৫ শে জুলাই ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে নতুন শাসনতান্ত্রিক সংস্কারকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৩৫ সালের ২৯শে আগস্ট শিবপ্রসাদ গুপ্তকে লেখা এক চিঠিতে জানান যে তিনি ওয়ার্কিং কমিটিতে যোগ না দিলেও কংগ্রেসের আইনসভায় প্রবেশের সিদ্ধান্তে সম্মতি দিয়েছেন।

গান্ধীজী বুঝেছিলেন দেশবন্ধুর অনুসৃত পথেই এখন চলতে হবে, তবে এক ভিন্ন ও অনুকূল পরিস্থিতিতে। অনুকূল এই কারণে যে, ব্রিটিশ সরকার যতই তর্জন-গর্জন করুক না কেন আসলে তারা জঙ্গী জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থীদের ক্রমবর্ধমান শক্তি লক্ষ্য করে আতঙ্কিত। তাই কোনভাবে একটা আপস করতে তারা ব্যগ্র।

গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামীরা এবং ভারতীয় ধনিকশ্রেণীও একই কারণে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল, কাজেই আপসের একটা সূত্র উদ্ভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল ছিল।

অবশ্য গান্ধীজীর জঙ্গী জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থীদের, বিশেষ করে কমিউনিস্টদের সম্পর্কে উদ্বেগের কারণ ছিল ভিন্ন।

কোন আন্দোলন শুরু করলেই তা তৎকালীন পরিস্থিতিতে অনিবার্যভাবে হিংসাত্মক আন্দোলন হয়ে উঠবে এই আশঙ্কা তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়েছিল।

১৯৩৫ সালের ৭ই মার্চ আগাথা হ্যারিসনকে লেখা এক চিঠিতে অকপটে জানিয়েছিলেন যে "বর্তমান মুহূর্তে আমি দ্বিগুণ সতর্কতা অবলম্বন করেছি

শুধুমাত্র এই কারণে যে আমার নিজের অহিংসাই এখন বিচারের সম্মুখীন।… যে জ্ঞান আমি আমার সামনে রেখেছি তা থেকে একচুলও সরে যাওয়ার চাইতে আমি বরং আমার ব্যর্থতাকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করব।"

অহিংসা তাঁর মূলমন্ত্র, তা থেকে তিনি বিচ্যুত হতে পারেন না, কাজেই হিংসা দেখা দিতে পারে এমন কোন আন্দোলন তিনি শুরু করতে পারেন না একথা গান্ধীজী বারবার জানিয়েছেন।

কিন্তু তিনি একথা বুঝতে পারেন নি অথবা বুঝতে চাননি যে, তাঁর অহিংসা নীতির সুযোগ গ্রহণ করেছে দুটি পক্ষ—ভারতীয় ধনিকশ্রেণী ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। এর ফল তাঁর পক্ষে হয়েছিল মারাত্মক। অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে অহিংসা ও প্রেমের নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে তিনি ভেসে গিয়েছিলেন বুর্জোয়া রাজনীতির পঙ্কিল স্রোতে।

১৯৩৪ সালের শেষ দিকে আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কার্যকলাপ দেশবাসীর মনে কোন রেখাপাত করে নি। কাজেই কংগ্রেস নেতারা সতর্ক হয়েছিলেন। গান্ধীজীই ছিলেন এর মূলে। তিনি বুঝেছিলেন যে নতুন পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজন যে নেতৃত্ব যুগপৎ প্রবীণ নেতাদের ক্ষমতা বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে উদীয়মান জঙ্গী জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থীদের সামাল দিতে পারবে। এই কারণেই তিনি জওহরলালকে নেতার পদে বসিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত সমীচীন হয়েছিল এবং সত্যসত্যই নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস নববলে বলীয়ান হয়ে উঠেছিল।

১৯৩৬ সালে লখনৌ ও ফৈজপুর কংগ্রেসের প্রগতিশীল কর্মসূচী জনগণের মনে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল।

অবশ্য এতে ধনিকশ্রেণীর নেতারা খুশি হন নি। জওহরলালের নেতৃত্বে কংগ্রেস কমিউনিজম-এর দিকে ঝুঁকবে এই আশঙ্কায় তারা বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন।

১৯৩৪ সালের ২৯শে মে "টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া"য় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে কাওয়ামজি জাহাঙ্গীর বলেন: "নেহরু একজন পুরোদস্তুর কমিউনিস্ট"। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ভারত সরকারও অনুরূপ ধারণা পোষণ

করতো এবং তারা মীরাট-ষড়যন্ত্র মামলায় নেহরুকে আসামী করতে চেয়েছিল। ব্যারিস্টার জে পি মিত্রের আপত্তির ফলে শেষ পর্যন্ত জওহরলালকে আর মামলায় জড়ানো হয় নি।

ফৈজপুর কংগ্রেসের পর কমিউনিস্টরা জওহরলালকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানালে ধনিকশ্রেণীর নেতারা আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে যান এবং পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস প্রমুখ নেতারা জওহরলাল, কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জেহাদ ঘোষণা করেন। শেষরক্ষা করেন গান্ধীজীর আস্থাভাজন ধনপতি শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লা। তিনি পুরুষোত্তম ঠাকুরদাসকে কড়া ধমক দিয়ে এক চিঠিতে (২৬শে মে, ১৯৩৬) লেখেন "আপনারা ধনতন্ত্রের বিরোধী শক্তিগুলিকেই চাঙ্গা করে তুলছেন।"

বিড়লাজী সকলকে বুঝিয়ে বললেন যে ভয় পাওয়ার কোন হেতু নেই। নেহরুকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি জানালেন যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে দক্ষিণপন্থীদের পুরো প্রাধান্য রয়েছে ওয়ার্কিং কমিটির ১৮ জন সদস্যের মধ্যে ১০ জনই দক্ষিণপন্থী এবং নির্বাচনে প্রার্থী নির্বাচন ও অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের উপর। অতএব মাভৈ।

ধনিকশ্রেণীর নেতারা আশ্বস্ত হলেন এবং জওহরলালকে সংবর্ধনা জানিয়ে প্রচুর অর্থ তাঁর হাতে তুলে দিলেন কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য। ফাঁড়া কেটে গেল। গান্ধীজী নিশ্চিন্ত হলেন।

প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল জয় সাম্রাজ্যবাদীদের স্তম্ভিত করে দিল। এবার তারা নতুন কৌশল অবলম্বন করল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে কংগ্রেসের শর্তগুলি মেনে নেওয়া হল। কংগ্রেসও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে বিলম্ব করল না।

কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের শর্ত ইত্যাদি সব কিছুই ঠিক করে দিয়েছিলেন গান্ধীজী অর্থাৎ কংগ্রেসে তাঁর নেতৃত্ব অক্ষুণ্ন ছিল।

১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে উত্তরপ্রদেশ (এখন যুক্ত প্রদেশ), বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশায় কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হল। অল্পকাল পরে উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশেও কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। অর্থাৎ

১১টি প্রদেশের মধ্যে ৭টি প্রদেশ কংগ্রেস মন্ত্রিসভার শাসনাধীন হয়। কিন্তু কংগ্রেস মন্ত্রিসভা যে প্রকৃতপক্ষে সত্যিকারের সংসদীয় সরকার নয় এ বিষয়ে গান্ধীজী সচেতন ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি এমনভাবে কাজ করবে যাতে সত্যিকারের স্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি ভারত শাসন আইন যারা রচনা করেছিল তাদের বাসনাই পূর্ণ করছে।

বন্দী মুক্তি, কৃষি সংস্কার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ উন্নয়ন ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভাগুলি কিছুটা সাফল্য অর্জন করলেও শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী নীতিই অনুসৃত হতে থাকল।

কংগ্রেস নেতাদের মনোভাব প্রতিফলিত হয় বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের এক উক্তিতে। তিনি বলেন "বর্তমান অবস্থায় কোন চরমপন্থী কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব নয়, যুক্তিযুক্ত নয়। বর্তমান শাসনবিধির আওতায় কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কিছু সেবাধর্ম ছাড়া আর কিছুই করার ক্ষমতা নেই। আর চরমপন্থী কর্মসূচী গ্রহণ করতে গেলে শ্রেণী সংঘর্ষই ডেকে আনা হবে আর তৃতীয় পক্ষ তার সুযোগ নেবে।"

বিশেষ কিছু যে করা যাবে না এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসন যথারীতি বহাল থাকবে একথা শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতও স্বীকার করেছিলেন।

পরে তিনি পরিষ্কারভাবেই বলেছিলেন যে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তাঁর যে সংশয় ছিল তা যে ঠিক একথা তিনি বুঝতে পেরেছেন। "...কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী কিছু খুচরো কাজ করতে পেরেছে। আর তাতে লোকের হতাশ প্রাণে একটু আশার সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু মূল ব্যাপারটা ঠিক আগের মতই আছে। বর্তমান শাসনবিধির আওতায় কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী সে বিষয়ে কিছুই করতে পারবে না।" (মডার্ণ রিভিউ নোট, জুলাই, ১৯৩৮)

১৯৩৭ সালের শাসনবিধির আওতায় যে কিছুই করা যাবে না একথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে গান্ধীজী ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসের 'হরিজন' পত্রিকায় লেখেন যে, শাসনবিধি রচয়িতাদের অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য নয়, কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছে। ঐ শাসনবিধির স্থান ভারতবর্ষের নিজস্ব শাসনবিধি-প্রবর্তনের গতি ত্বরান্বিত করবে।

কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই হল না। এবং তা নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে প্রবল বাদ-বিতণ্ডার সৃষ্টি হল।

কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি কাজ চালিয়ে যেতে লাগল এবং গান্ধীজী তার সমর্থনে বললেন: "স্বাধীনতার দিক থেকে শাসনবিধি মোটেই সন্তোষজনক নয়। কিন্তু এতে তরবারির শাসনের স্থানে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়েছে। তিন কোটি লোকের ভোটাধিকার এবং তাদের হাতে ব্যাপক (?) ক্ষমতা দান ছাড়া অন্য কিছু বলা চলে না।"

দেখা গেল, গান্ধীজী মাথা ঠাণ্ডা রেখে ধীরপদে নিয়মতান্ত্রিক পথ অনুসরণেরই পক্ষপাতী। নতুন শাসন সংস্কারের তীব্র সমালোচনা করলেও তিনি আর কোন আন্দোলন শুরু করতে চান না।

এদিকে জনগণের মধ্যে জেগেছে বিরাট আশা। তারা তাদের দাবিদাওয়া আদায় করার জন্য লড়াই শুরু করে দিয়েছে এবং সঙ্গতভাবেই আশা করেছে যে, কংগ্রেস সরকারগুলি তাদের সমর্থন করবে।

শ্রমিকশ্রেণীই এগিয়ে চলেছিল। ১৯৩৭ সালে ধর্মঘট তুঙ্গে উঠল। ৯০ লক্ষ কাজের দিন নষ্ট হল ধর্মঘটী শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়াল ৬ লক্ষ ৪৭ হাজার!

কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির দাবি মেনে নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করল। ট্রেড ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দান ও মজুরী বৃদ্ধির দাবির বিরোধিতা করে যুক্ত প্রদেশে মিল মালিকরা শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য হল। কিন্তু শিল্প বিরোধের ক্ষেত্রে মাদ্রাজ সরকার হস্তক্ষেপ করে শ্রমিকদের বিরোধিতা করতে থাকায় এবং বোম্বাইতে সরকার শ্রমিক দমননীতি অনুসরণ করায় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হল।

১৯৩৮ সালের শেষদিকে বোম্বাই শিল্প-বিরোধ বিলে শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার গুরুতরভাবে ক্ষুণ্ণ করার প্রচেষ্টা প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি করে। বিলে আপস-মীমাংসার ব্যবস্থা রূপায়ণের উদ্দেশ্যে চার মাসের জন্য ধর্মঘট বে-আইনী করার একটি ধারা রাখা হয়। ইউনিয়নের স্বীকৃতি সম্পর্কেও বিলে জটিল কয়েকটি ধারা রাখা হয়।

ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের প্রতিবাদের ফলে বিলের কিছু কিছু রদবদল করা হলেও মূল বিলটি অক্ষুণ্ণই থাকে। বিলের প্রতিবাদে ১৯৩৮ সালের ৭ই নভেম্বর প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ধর্মঘট ঘোষণা করে। শ্রমিকদের বিক্ষোভ

মিছিলের উপর পুলিস গুলি বর্ষণ করে, ফলে একজন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়।

কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার এই দমননীতি প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। এ সময় গান্ধীজী কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর সমর্থনে বলেন, "রাষ্ট্রের পক্ষে ন্যূনতম হিংসার প্রয়োজন আছে" (Minimum violence is a necessity of the State)।

দেখা গেল গান্ধীজী অহিংসা মন্ত্রের উদ্গাতা হয়েও রাষ্ট্র বা সরকারের ক্ষেত্রে হিংসাত্মক আচরণ করার প্রয়োজন স্বীকার করেছেন। তিনি যে একজন বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ রূপেই উক্তরূপ উক্তি করেছেন এটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

যাই হোক, এসব সত্ত্বেও কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা বহুল পরিমাণে অক্ষুন্নই রইল। যারা একদিন জেল খেটেছেন, নির্যাতন বরণ করেছেন তারাই কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন দেখে দেশের মানুষ তাতে একটা জয়েব আনন্দ অনুভব করেছিল। সাম্রাজ্যবাদ নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে এমন একটা ধারণাও তাদের হয়েছিল। নতুন আস্থা ও সঙ্কল্প নিয়ে তারা এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।

জনগণের মনোভাব লক্ষ্য করেই গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের সভাপতি রূপে মনোনীত করেন। এর ফলে সুভাষচন্দ্র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি নির্বাচিত হন। দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সুভাষচন্দ্র উগ্রতা পরিহার করবেন গান্ধীজীর মনে এই আশা ছিল। বুঝতে পারা যায় যে, সুভাষচন্দ্রের দৃঢ়তা সম্পর্কে তাঁরা কোন ধারণা ছিল না। এটা প্রকৃতপক্ষে তাঁর রাজনৈতিক অপরিপক্কতারই প্রমাণ। বুর্জোয়া কায়দায় সুভাষচন্দ্রকে গান্ধীজী তাঁর নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর সুভাষচন্দ্র গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে মিলে-মিশেই কাজ করেছিলেন। এমন কি বোম্বাই-এ শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধে তিনি একটি কথাও বলেন নি। তাই গান্ধীজী ধরে নিয়েছিলেন যে সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেই কাজ করে যাবেন। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যেই গান্ধীজী উপলব্ধি করলেন যে সুভাষচন্দ্র ভিন্ন পথের পথিক।

সুভাষচন্দ্র হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীলদের প্রভাব বেশ বেড়ে যায়। এর ফলে দেশীয় রাজ্য প্রজা

সংগঠনগুলির সঙ্গে কংগ্রেসের যোগ ঘনিষ্ঠ হয়েছিল যুগপৎ সাম্রাজ্যবাদরা ও সাম্রাজ্যবাদের লালিত স্বৈরাচারী রাজন্যবৃন্দের প্রবল গণ-আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। এছাড়া সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগেই গৃহীত একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে ভারতবর্ষে কোন যুদ্ধ বাধলে কখনই ব্রিটেনের পক্ষ অবলম্বন তো করবেই না বরং যুদ্ধে ভারতবর্ষের লোকবল ও সহায়-সম্পদ নিয়োজিত করায় বাধা দেবে।

গান্ধীজী ক্রমেই বিচলিত হয়ে উঠতে থাকেন। কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতারা তখন নতুন শাসনবিধির বাকিটা অর্থাৎ ফেডারেশন অংশটি গ্রহণের দিকে ঝোঁক দিলেন। মাদ্রাজের সত্যমূর্তি তো প্রকাশ্যেই ফেডারেল প্ল্যান মেনে নেওয়ার পক্ষে ওকালতি শুরু করে দিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র তাকে কড়া ধমক দিলেন।

গান্ধীজীর জ্ঞাতসারেই সব ঘটছিল। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস নেতা ও খ্যাতনামা ব্যারিস্টার ভুলাভাই দেশাই-এর সঙ্গে স্যার ফ্রেডারিখ্ হোয়াইটের যুক্ত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার খবর, ১৯৩৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে "ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান"-এ স্যার রাসব্রব উইলিয়াম-এর প্রবন্ধ (যাতে লেখা হয় যে, "কয়েক মাসের মধ্যে কংগ্রেস নেতৃত্বের দক্ষিণপন্থী নেতাদের মনোভাব এতটাই বদলে গেছে যে, মনে হয় মহাত্মা গান্ধী যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাকেও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মতই কার্যকর করতে এগিয়ে আসবেন")। সহকারী ভারত সচিব মুইর হেডের সঙ্গে গান্ধীজীর গোপন আলোচনা (যে আলোচনায় গান্ধীজীর খাস মুন্সীকেও যোগ দিতে দেওয়া হয় নি) পরিষ্কারভাবেই কংগ্রেসের মতিগতি কিরকম দাঁড়াচ্ছে তার ইঙ্গিত বহন করে আনে।

এই অবস্থায় সুভাষচন্দ্রই কংগ্রেস নেতাদের কাছে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ালেন। স্বয়ং গান্ধীজী সুভাষচন্দ্র যাতে আর কংগ্রেস সভাপতি হতে না পারেন তার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন। কিন্তু ১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাসে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনকালে অঘটন ঘটে গেল। গান্ধীজীর মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়া সুভাষচন্দ্রের কাছে ১৫৭৫—১৩৭৬ ভোটে হেরে গেলেন। এই প্রথম কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল। বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ সমর্থনেই সুভাষচন্দ্র জয়লাভ করেন। কিন্তু গান্ধীজীকে তিনি চটাতে চাইলেন না। তিনি তাঁর আশীর্বাদ কামনা করলেন।

গান্ধীজীর মত মহাপ্রাণ মানুষ তখন পুরোপুরি বুর্জোয়া রাজনীতির আবর্তে পড়ে মন্তব্য করলেন "পট্টভির পরাজয় আমার পরাজয়।" এরপর সুভাষচন্দ্রকে অপসারিত করার উদ্দেশ্যে যে চক্রান্ত শুরু হয়ে গেল তাকে জঘন্য ছাড়া আর কোন বিশেষণে বিভূষিত করা যায় না।

গান্ধীজী তাঁর অহিংসার উন্নত আদর্শের সঙ্গে বাস্তব রাজনীতিকে খাপ খাইয়ে নিতে পারলেন না। সব চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হল এই যে, সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেস হিংসার পথ অনুসরণ করতে পারে এই আশঙ্কায় গণতন্ত্রের রীতিনীতি বিসর্জন দিতে গান্ধীজী কুণ্ঠিত হলেন না। তিনি নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করলেও সব কিছুই চলছিল তাঁরই অনুমোদনক্রমে'

সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে তাঁর পক্ষে টানবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। নতুন ওয়ার্কিং কমিটিতে তিনি যে ১৫ জন সদস্য মনোনীত করেন তাদের ১২ জনই ছিলেন পুরাতন ও গান্ধীজীর অনুগামী কংগ্রেস নেতা। মাত্র ৩ জন ছিলেন নতুন এবং বামপন্থার সমর্থক।

ফল কিছুই হল না। ১২ জন সদস্য পদত্যাগ করলেন একযোগে "যাতে সুভাষচন্দ্র সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে পারেন।" অভিমানহত সুভাষচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে সভাপতির পদে ইস্তফা দিলেন। ঠিক এইটিই গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামীরা চেয়েছিলেন।

সমস্ত শালীনতা বিসর্জন দিয়ে কংগ্রেস নেতারা কলকাতায় এ আই সি সি-র অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের জন্য কোন অনুরোধ না জানিয়ে তাড়াহুড়া করে তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন।

নাটকের এইখানেই শেষ নয়। এ আই সি সি-র সেই অধিবেশনেই সম্পূর্ণ অবৈধভাবে রাজেন্দ্রপ্রসাদকে কংগ্রেসের সভাপতি করা হল। সভানেত্রী ছিলেন সরোজিনী নাইডু। তিনি দ্বিধাহীনভাবেই ঘোষণা করেছিলেন:

"অবৈধতার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার দায়িত্ব নিয়েই আমি এই নতুন সভাপতি নির্বাচনের অনুমতি দিচ্ছি, কারণ সভাপতির পদ একদিনও খালি রাখা উচিত হবে না।"

গান্ধীজী যে বেশ সক্রিয়ভাবেই সুভাষ বিতাড়নে অংশ নিয়েছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

পট্টভি সীতারামাইয়ার পরাজয়ের পর গান্ধীজী এক বিবৃতি প্রকাশ করে

বলেন যে 'কংগ্রেস দুর্নীতিগ্রস্ত সংগঠন' এবং এতে "ভুয়া সদস্য" রয়েছে। তাঁর অনুগামীরা যদি কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠের কর্মনীতি না মেনে নিতে পারেন তাহলে তাঁরা কংগ্রেস ত্যাগ করবেন এমন হুমকিও বিবৃতিতে দেওয়া হয়।

গান্ধীজী লিখেছিলেন: "কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন যারা ইচ্ছা করেই কংগ্রেসের বাইরে থাকবেন কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব তারাই সবচেয়ে বেশি করবেন। কাজেই যারা কংগ্রেসের মধ্যে থেকে স্বস্তি পাবেন না তারা বেরিয়ে আসতে পারেন।"

পরিষ্কারভাবেই কংগ্রেস ভেঙে দেওয়ার হুমকি। ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধীজী যোগ দিলেন না। তিনি তাঁর যোগদানের অক্ষমতা জানিয়ে লিখলেন যে, "অন্য কর্মনীতি নির্ধারণ করা হলেও তাদের কথা ও কাজে কোন উগ্রতা দেখা দেবে না, চিন্তায় কোন হিংসার মনোভাব থাকবে না।"

ওয়ার্কিং কমিটি থেকে যারা পদত্যাগ করেছিলেন তাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের আলোচনা ব্যর্থ হলে গান্ধীজীকে ত্রিপুরীতে যাওয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান হয় কিন্তু গান্ধীজী জানালেন "যথাসময়ে এখানে পৌছানো অসম্ভব। ডাক্তাররা কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন। তাঁদের অনুমতি পেলেই আমাকে রাজকোটের ব্যাপারটা শেষ করার জন্য দিল্লী রওনা হতেই হবে।"

সুভাষচন্দ্র এ সময় খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর লিখিত অভিভাষণ কংগ্রেসে পড়ে শোনান হয়। সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণে ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র দেওয়ার আহ্বান জানান।

সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে বিচলিত গান্ধীজীর অনুগামীরা ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের হাত-পা বেঁধে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রস্তাব পাশ করালেন। এই সব প্রস্তাবে (বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে গৃহীত) গান্ধীজীর নেতৃত্বে অনুসৃত মৌল কর্মনীতিগুলি দৃঢ়ভাবে মেনে চলা হবে বলে ঘোষণা করা হল এবং পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটির প্রতি আস্থা প্রকাশ করা হল। আর একই সঙ্গে সুভাষচন্দ্রকে গান্ধীজীর ইচ্ছানুযায়ী নতুন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মনোনীত করার জন্য অনুরোধ জানান হল। এরপর গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র পীড়িত অবস্থাতেও বার বার আলোচনা করেন। আপসের জন্য তাঁর সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এ কাহিনী আগেই বলা হয়েছে।

কংগ্রেস নেতাদের সংগ্রামবিমুখতা সুভাষচন্দ্রকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল।

কংগ্রের নেতৃত্বের অনুমতি ছাড়া কোন গণ-আন্দোলন করা চলবে না—এই মর্মে কংগ্রেস যে প্রস্তাব গ্রহণ করে সুভাষচন্দ্র তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সংগঠিত করলেন। তখন তিনি তাঁর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন 'ফরওয়ার্ড ব্লক'ও গঠন করেন। শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে সুভাষচন্দ্রকে তিন বছরের জন্য কংগ্রেসের কোন কর্তৃস্থানীয় পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হল।

সুভাষচন্দ্র তখনও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। শৃঙ্খলাভঙ্গের বিধি অগ্রাহ্য করে সুভাষচন্দ্র সভাপতি রয়ে গেলেন। তখন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পট্টভি সীতারামাইয়াকে সভাপতি ও সুরেন্দ্রমোহন ঘোষকে সম্পাদক নিযুক্ত করে এডহক কমিটি গঠন করলেন। বাংলায় দুই কংগ্রেসের মধ্যে লড়াই চলল।

সুভাষচন্দ্রকে আয়ত্তে আনতে না পেরে গান্ধীজী এমনই সুভাষবিরোধী হয়ে ওঠেন যে, তাঁর সম্বন্ধে অত্যন্ত অপমানজনক উক্তি করতেও দ্বিধা করেন নি। সুভাষচন্দ্রের মত একজন শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হল "যাই হোক সুভাষচন্দ্র তো দেশের শত্রু নন" (**After all Subhas is not an enemy of the Country**)।

গান্ধীজীর উত্তেজনার যতই কারণ থাক এ ধরনের উক্তি যে অত্যন্ত অসমীচীন হয়েছিল একথা বহু দেশপ্রেমিকই স্বীকার করেছিলেন।

গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রের মতিগতি সম্পর্কে বহুদিন থেকেই সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র কথায় ও কাজে তাঁর অহিংসানীতির বিরোধিতা করেন নি। তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম চালানোর পক্ষপাতী ছিলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনকেই তিনি ব্যাপক গণ-আন্দোলনের রূপ দিতে চেয়েছিলেন। তা হলে গান্ধীজীর এই বিরূপতার কারণ কি ?

কারণ গান্ধীজী প্রথম থেকেই গণ-আন্দোলনকে একটা কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেছিলেন। সেই কাঠামোর গণ্ডীর বাইরে চলে গেছে বলে তিনি একাধিকবার আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। আন্দোলন যদি হিংসাশ্রয়ী নাও হয় তা হলেও এটা তাঁর নির্ধারিত কাঠামোর বাইরে চলে যেতে পারে এই আশঙ্কা তিনি বারবার করে এসেছেন। সুভাষচন্দ্র কোন রকম হিংসার আশ্রয় না নিয়ে আম হরতাল বা সর্বব্যাপী ধর্মঘট, খাজনা ও ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে যদি সারা দেশে বিরাট গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি

করেন তা হলে গান্ধীজী যা চান আন্দোলন তার গণ্ডী ছাড়িয়ে এক বিপজ্জনক আকার ধারণ করবে। এই আশঙ্কাটা তাঁর মনে প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই আশঙ্কার মূলে ছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে গান্ধীজীর নিজস্ব ধারণা। এই ধারণার মূলে যা ছিল সোভিয়েত পণ্ডিত আর এ উলিয়ানভস্কি তা চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যাখ্যাটি এইরূপ :

গান্ধীজী দেশের স্বাধীনতা কামনা করেছিলেন এবং সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য গণ-আন্দোলনের আবশ্যকতা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই আন্দোলন যুগপৎ সমাজতন্ত্রবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয় এটা চান নি। তাঁর মধ্যবিত্তসুলভ কল্পনাশ্রয়ী 'রামরাজ্য' নির্মম শোষণে জর্জরিত লক্ষ লক্ষ কৃষক ও ভূমিহীন মানুষকে উদ্দীপিত করেছিল। তাই তারা গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অ-সহযোগ আন্দোলনে। তাদের সক্রিয় সহযোগিতা কংগ্রেসকে অপরিমিত শক্তি জুগিয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন ব্যতিরেকেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এগিয়ে গিয়েছিল।

এ ব্যাপারে জাতীয় বুর্জোয়া বা ভারতীয় ধনিকশ্রেণী গান্ধীজীর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত ছিল ; তাই এই শ্রেণী গান্ধীজীর প্রধান সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়। গান্ধীজীর আপস-নীতি জাতীয় বুর্জোয়ার আপস-নীতিরই প্রতিফলন।

অবশ্য গান্ধীজী শোষিত জনগণের কথা ভেবেছিলেন। তাদের সমস্যাগুলি স্বাধীনতা লাভের পর সমাধান করা সঙ্গত বলে তিনি বিবেচনা করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর মতবাদ কল্পনাশ্রয়ী হলেও ধনিকশ্রেণীর স্বার্থানুগ ছিল না। ভারতবর্ষের বিশেষ পরিস্থিতিতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে গণ-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাকে কাজে লাগাতে ধনিকশ্রেণী কোন চেষ্টাই বাকি রাখেনি।

সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গান্ধীজীর আন্দোলন যদি বিশাল আপসহীন গণ-আন্দোলনের রূপ লাভ করে তা হলে গান্ধীজীর সঙ্গে সঙ্গে ধনিকশ্রেণীরও সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে এই আশঙ্কা প্রবল হয়ে ওঠে।

গান্ধীজী তথা জাতীয় বুর্জোয়ার সুভাষ-বিরোধিতার মূলে ছিল এই আশঙ্কা।

সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বকালেই দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজা আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে এবং কংগ্রেসও সক্রিয়ভাবে তাতে সমর্থন জানায়। গান্ধীজী সামন্ততন্ত্র

বিরোধী অভিযানে নামতে চান নি, কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাবৃন্দের অসহনীয় দুর্দশা মোচনেও তিনি আগ্রহী ছিলেন। তাই গণ-আন্দোলন তীব্রতর না করে রাজন্যবর্গকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে তিনি সমস্যার সমাধান করতে চান। এই কারণে যখন সুভাষ বিতাড়নের চেষ্টা চলছে তখন তিনি দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করেন। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা লাভের পর দেশীয় রাজন্যবর্গ সম্পর্কে সর্দার প্যাটেলের বহু বিঘোষিত নীতি গান্ধীজীর তৎকালীন কর্মনীতিরই পূর্ণ পরিণতি মাত্র।

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে অপসারিত হলে গান্ধীজী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন বটে; কিন্তু তখন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে সঙ্কট ঘনিয়ে উঠেছে।

ইয়োরোপে ফ্যাসিস্ট আন্দোলন এবং জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের চীন আক্রমণের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের ফৈজপুর ও হরিপুরা অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। হরিপুরা প্রস্তাবে জাপানী পণ্য বয়কটের আহ্বান জানানোও হয়েছিল।

কংগ্রেসের এই প্রগতিশীল আন্তর্জাতিক চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গান্ধীজী মিউনিক চুক্তিকে ধিক্কার জানান। ১৯৩৮ সালের ১৫ই নভেম্বরের আগেই গান্ধীজী লেখেন: "মিউনিকে ইউরোপ যে শান্তি অর্জন করেছে তা হিংসারই জয় আবার তার পরাজয়ও বটে। আমি বলতে চাই যে, বিরুদ্ধ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করা যদি সাহসিকতার পরিচয় হয় এবং যা সত্যই করে, তা হলে লড়াই করতে অস্বীকার করেও দখলদারের কাছে নতি স্বীকার করা আরও সাহসিকতার পরিচয় হবে।"

কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে, ব্রিটিশ সরকারের যে পররাষ্ট্রনীতির পরিণতি ঘটেছে মিউনিক চুক্তিতে, ইঙ্গ-ইতালীর চুক্তিতে এবং বিদ্রোহী স্পেনের (ফ্রাঙ্কো) স্বীকৃতিদানে, সেই পররাষ্ট্রনীতির তীব্র বিরোধিতা করা হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন আসন্ন তখন গান্ধীজী ও কংগ্রেস প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নাৎসীরা ক্ষেপে গিয়ে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনে। গান্ধীজী 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় তার জবাব দেন (৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮)। এর মধ্যে জল অনেকদূর গড়িয়ে গেল। ইয়োরোপে নাৎসীদের আগ্রাসী অভিযান সারা পৃথিবীতে আলোড়ন তুলল।

১৯৪০ সালের ২৬ শে জুলাই গান্ধীজী পৃথিবীকে যুদ্ধের আবর্তে নিক্ষেপ

করা থেকে বিরত হওয়ার জন্য আবেদন জানিয়ে হিটলারের কাছে এক পত্র লিখলেন। পোল্যাণ্ড যখন বিপন্ন তখন গান্ধীজী পোল্যাণ্ডের শুভ কামনা করে এক পত্র দিলেন ৩০শে আগস্ট, ১৯৩৯।

১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যদিও তখনও ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রায় নিষ্ক্রিয় থেকে নাৎসী-তোষণনীতি অনুসরণ করে চলেছে।

ঐ দিনই বড়লাট গান্ধীজীকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

এ সময় জাতীয় পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করল। জনাব জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ এ সময়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাতে থাকে। সর্বদলীয় আন্দোলনের পর থেকেই লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধ তীব্র হয়েছিল। কংগ্রেস যতই লীগকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে ততই বিরোধ তীব্রতর হয়। সুযোগ বুঝে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং মুসলিম লীগকে সন্তুষ্ট করে তাদের কাজ হাসিল করতে উদ্যোগী হয়।

জওহরলাল আশা করেছিলেন যে, জনগণের দাবি-দাওয়ার সমর্থনে আন্দোলন করে সাম্প্রদায়িক বিরোধ দূর করা যাবে কিন্তু গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস তাতে বিশেষ উৎসাহ দেখায় নি। গান্ধীজী স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে, তাঁর ঈপ্সিত 'রামরাজ্যে' জমিদার ও কৃষক উভয়েই সমান অধিকার ভোগ করবে। তাঁর ভাষায় "আমার স্বপ্নের রামরাজ্যে রাজা থেকে ভিখারী পর্যন্ত সকলের অধিকারই অক্ষুন্ন থাকবে।"

এই অবস্থায় শোষিত মুসলমান চাষী ও অন্যান্য মুসলমানদের উপর কংগ্রেসের প্রভাব বাড়ানোর কোন উপায় রইল না। পক্ষান্তরে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রে সব মুসলমান শোষণমুক্ত জীবনযাপন করতে পারবে এই আশায় দলে দলে মুসলমান মুসলিম লীগে যোগ দিতে থাকে।

কংগ্রেস মন্ত্রীত্বের আমলে "পীরপুর রিপোর্ট" প্রচার করে মুসলমানদের উপর কংগ্রেসের অত্যাচার ও অবিচারের ফিরিস্তি প্রকাশ করে মুসলমানদের উত্তেজিত করে তোলা হয়। এইভাবে লীগের জোর বাড়তে থাকে। জিন্না সাহেবের সঙ্গে গান্ধীজীর আপস আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

মুসলিম লীগ সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের আশ্বাস পেয়ে আরও প্রবল হয়ে উঠেছে।

ভারতীয় রাজনীতি এক নতুন ও বিপজ্জনক মোড় নেয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিয়ে সব হিসেব বানচাল করে দেয়।

বড়লাট ভবন থেকে ফিরে এসে গান্ধীজী ১৯৩৯ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর বললেন "আমি বড়লাট ভবন থেকে খালি হাতে ফিরে এসেছি, কোন মিটমাট হয়নি। যদি মিটমাট হয় তাহলে তা কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যেই হইবে·· আমি বড়লাট বাহাদুরকে বলেছি যে আমার সহানুভূতি ইংল্যাণ্ডের দিকেই।"

গান্ধীজী যুদ্ধকালে বিনা শর্তে ব্রিটেনকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এতে কেউ রাজি হননি। তিনি সখেদে বলেন যে, এই ধরনের চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি নিঃসঙ্গ। ১৬ই সেপ্টেম্বরের 'হরিজনে' গান্ধীজী লিখলেন যে হিটলারই যুদ্ধের জন্য দায়ী।

এরপর চলল বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকার আলাপ-আলোচনা যার দীর্ঘ ইতিহাস এখানে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।

কংগ্রেস যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার আগেই গান্ধীজীর উপদেশ অনুসারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিল যে, কংগ্রেস গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সপক্ষে এবং ফ্যাসিবাদের বিপক্ষে। কিন্তু ভারতবর্ষের জনগণের সম্মতি ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া কংগ্রেস বরদাস্ত করবে না। যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণার দাবি জানায়।

ব্রিটেন ও ফ্রান্স তখন নাম-কাওয়াস্তে যুদ্ধে নেমেছে তখনও তাদের নাৎসী তোষণ নীতি অব্যাহত রয়েছে কাজেই ভারত সরকার কংগ্রেসকে সামনে না এনে প্রচণ্ড দহননীতির আশ্রয় গ্রহণ করে।

বড়লাট স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, যুদ্ধের লক্ষ্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন ঘোষণা করা সম্ভব নয়।

ক্ষুব্ধ গান্ধীজী বড়লাটের বিবৃতিকে ধিক্কার দিয়ে কংগ্রেসকে আবার আন্দোলনে নামতে হবে এই ইঙ্গিত দিলেন।

১৯৪০ সালের ২২শে অক্টোবর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করল যে,

ভারতবর্ষ যুদ্ধে ব্রিটেনকে কোন সাহায্য দেবে না। কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীকে পদত্যাগেরও নির্দেশ দেওয়া হল।

মুসলিম লীগ বড়লাট ও কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা চালাতে চালাতে গান্ধীজীর আবেদন অগ্রাহ্য করে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির পদত্যাগের দিনটিকে মুসলমানদের "মুক্তি দিবস" রূপে পালন করার আবেদন জানাল।

দেশব্যাপী প্রবল উত্তেজনার মধ্যে বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেল। তখনও গান্ধীজী আশার আলো দেখছেন সাম্রাজ্যবাদীদের চেতনা হবে বলে আশা করছেন। তাই ১৯৩৯ সালের ৬ই নভেম্বর নাগপুরে বললেন, "দেশ প্রস্তুত হয়েছে এটা না দেখিলে আমি আইন অমান্য আন্দোলনে বাধা দেব।"

২৫শে নভেম্বর গান্ধীজী "হরিজন" পত্রিকায় লিখলেন "গণপরিষদই মীমাংসার একমাত্র উপায়।" ২৩শে ডিসেম্বর "হরিজন" পত্রিকায় গান্ধীজী জানালেন যে স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টায় যতক্ষণ অংশগ্রহণ করেছেন ততক্ষণ তা "অহিংসা, আন্দোলনের মাধ্যমেই হবে কাজেই তার ফল দাঁড়াবে ব্রিটেনের সঙ্গে একটা সম্মানজনক চুক্তি অথবা মিটমাট।"

গান্ধীজী আবার তাঁর সেই অহিংস আন্দোলনের প্রতি গভীর নিষ্ঠা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করে চললেন বুর্জোয়া রাজনীতি—চাপের ও আপসের রাজনীতি।

১৯৪০ সাল এসে গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রলয়ঙ্কর আকার ধারণ করল। হিটলারের বিজয় অভিযান সমগ্র ইয়োরোপ তথা বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিল। ব্রিটেনে জনগণের প্রবল বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়ে চেম্বারলেন মন্ত্রিসভার পতন ঘটল। প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হলেন উইনস্টন চার্চিল। আর তোষণনীতি নয়, সমগ্র শক্তি সংহত করে হিটলারের বাহিনীকে প্রতিহত করায় আহ্বান জানালেন চার্চিল। ১৯৪০ সালের ১০ই মে চার্চিল প্রধানমন্ত্রীর পদে বৃত হয়েছিলেন। সেই দিনই নাৎসীবাহিনী হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও লুকসেমবুর্গ আক্রমণ করে তাদের পশ্চিম ইয়োরোপ অভিযান শুরু করল।

চার্চিল তাঁর ১৯শে মে-র ইতিহাসখ্যাত বক্তৃতায় বললেন: "রক্ত, শ্রম, অশ্রু ও ঘর্ম ছাড়া আমার আর কিছু দেওয়ার নেই।" তিনি ঘোষণা করলেন "যুদ্ধ জয়ই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।"

না, ভারতবর্ষ নিয়ে কোন মাথা ঘামাবার প্রয়োজন চার্চিল মনে করেন নি। ১৯৪০ সালের ১৮ই মার্চ গান্ধীজী রামগড় কংগ্রেসে বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে বললেন :

"সংগ্রামের প্রয়োজন আমি মেনে নিয়েছি কিন্তু আমি সংযত থাকব। একজন সেনাপতি যুদ্ধের আগে যে ভাবে প্রস্তুত হতে চান, সৈন্যদের আদেশ দেবার আগে, আমিও ঠিক তাই করব।"

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কিত প্রস্তাব আলোচনাকালেই গান্ধীজী এই উক্তি করেন।

২০শে মার্চ রামগড় কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে গান্ধীজী ঘোষণা করলেন : "দেশ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত নয়", আর যারা চরকা কাটেন না তারা তাঁর বাহিনীর মধ্যে স্থান পাবেন না।

জিন্না সাহেব এ সময় দ্ব্যর্থহীনভাবেই পাকিস্তানের দাবি জানিয়ে ভারতবর্ষ ভাগের প্রস্তাব মেনে নিতে সকলকে আহ্বান জানালেন।

মে মাসে ব্রিটেন যখন চরম সংকটের সম্মুখীন তখন গান্ধীজী জানালেন যে ব্রিটেনকে বিব্রত করার জন্য তিনি কিছুই করবেন না।

১৭ই-২০ জুনের ওয়ার্কিং কমিটি ওয়ার্ধা অধিবেশনে গান্ধীজীকে কর্মসূচী রূপায়ণের সমস্ত দায়িত্ব থেকে রেহাই দিয়ে কংগ্রেসকে হিংসা-অহিংসার কথা চিন্তা না করে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবাধ অধিকার দেওয়া হল।

এরপর অহিংসার প্রশ্নে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর মূলগত মতপার্থক্যের উল্লেখ করে গান্ধীজী জানিয়ে দেন যে তিনি আর কংগ্রেসকে পথ দেখাতে পারবেন না।

ইতিমধ্যে বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজীর আলাপ আলোচনা অব্যাহত রইল।

১৮ই জুন ফরওয়ার্ড ব্লকের নাগপুর অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষে অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব করলেন। কংগ্রেস নেতারা এক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা, সাম্রাজ্যবাদী সরকারের নির্মম দমন-নীতি, সারা দেশে প্রবল বিক্ষোভ, সুভাষচন্দ্রের আপসহীন সংগ্রামের আহ্বান এবং বামপন্থীদের জঙ্গী মনোভাব ও কার্যকলাপ তাদের বিহ্বল ও বিমূঢ় করেছিল। তারা বুঝলেন আর বসে থাকা চলবে না, একটা কিছু করতে হবে।

আর গান্ধীজী, কংগ্রেসের কেউ নন এবং কংগ্রেসকে পরিচালিত করার কোন ক্ষমতা তাঁর নেই বারবার ঘোষণা করলেও, সক্রিয়ভাবেই কংগ্রেসকে পরিচালিত করছিলেন এবং বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বড়লাটের বিবৃতিতে হতাশ হয়ে তিনিও আর বসে থাকতে পারলেন না।

১৮ই থেকে ২৩শে আগস্ট ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে আবার আনুষ্ঠানিকভাবে গান্ধীজীকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে এনে তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল এবং তাঁকে কংগ্রেস পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানানো হল। গান্ধীজীও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন।

১৯৪০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে ভাষণদান-কালে গান্ধীজী বললেন: "গণ-সত্যাগ্রহের কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমি এখনও নিশ্চিত নই তবে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ হতে পারে আমি একটা কিছুর জন্য এখনও সন্ধান করছি, এ পর্যন্ত আমি কিছুই খুঁজে পাইনি।"

এই অস্পষ্ট উক্তির মধ্যেও বোঝা গেল যে, গান্ধীজী যুদ্ধ চলাকালে ব্রিটেনকে বিব্রত করতে রাজি নন, তবে দেশব্যাপী বিক্ষোভকে একটা নিরাপদ পথে পরিচালনার উদ্দেশ্যে তিনি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ অনুমোদন করতে পারেন।

বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে বারবার দেখা ও আলোচনা করেও গান্ধীজী কিছুই করতে পারলেন না। ক্ষুব্ধ গান্ধীজী সরকারের উপর নৈতিক চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদনক্রমে (১১—১৩ই অক্টোবর, ১৯৪২) ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। যুদ্ধ-বিরোধী প্রচারই ছিল সত্যাগ্রহীদের কাজ।

স্বাধীনতা নয়, গান্ধীজী চেয়েছিলেন বাক-স্বাধীনতা ও অবাধে লেখার স্বাধীনতা। সর্বপ্রকার যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচারের স্বাধীনতা তিনি দাবি করেছিলেন, কিন্তু যুদ্ধরত ব্রিটিশ তথা ভারত সরকার সে দাবি মানতে পারে নি। কেন স্বাধীনতার দাবি না তুলে বাক-স্বাধীনতার দাবি জানানো হল গান্ধীজী তার কারণ দেখাতে গিয়ে ১৯৪০ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে বলেছিলেন যে যুদ্ধরত ব্রিটেন এখন স্বাধীনতা দেবে কি করে? আইন-অমান্য আন্দোলন করলেও ব্রিটেন স্বাধীনতা দিতে পারবে না। কাজেই যুদ্ধ চলাকালে বাক-স্বাধীনতা নেহাৎই দাবি করা শ্রেয়। এই দাবি তারা অবশ্যই স্বীকার করবে।

সাধু খ্রীষ্টান বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে গান্ধীজীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। গান্ধীজী আশা করেছিলেন যে তিনি সাড়া দেবেন। কিন্তু কিছুই হল না।

সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধির হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। যুদ্ধবিরোধী প্রচারে ক্ষিপ্ত হয়ে সরকার নির্মম দমন নীতি অনুসরণ করল। সত্যাগ্রহীদের কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা হতে লাগল। জওহরলালের চার বছর কারাদণ্ড হল। যুদ্ধবিরোধী প্রচারের অভিযোগে কানপুরের শ্রমিক নেতা চাচা জান মহম্মদকে ২০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল। আর এরই সঙ্গে যুদ্ধ প্রচেষ্টা আরও জোরদার করা হল এবং কংগ্রেসের সমর্থক শেঠজীরা, টাটা ও অন্যান্য শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীরা যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করে বিপুল মুনাফা অর্জন করতে লাগলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিল।

পাছে আন্দোলন বিরাট আকার ধারণ করে এবং হিংসাশ্রয়ী হয়ে ওঠে এই আশঙ্কায় গান্ধীজী বাছাই করা লোক ছাড়া আর কাউকেই সত্যাগ্রহ করার অনুমতি দিলেন না এবং দেশীয় রাজ্যে আন্দোলন নিষিদ্ধ করলেন। এছাড়া নিঃ ভাঃ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতিকে তিনি সত্যাগ্রহের নামে কোন রকম ধর্মঘট করতেও নিষেধ করলেন। তবু সারা দেশে দশ হাজারের উপর সত্যাগ্রহী কারাবরণ করলেন।

১৯৪১ সাল এসে গেল। ২৭শে জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র অন্তর্ধান হলেন। ২২শে ফেব্রুয়ারি গান্ধীজী-সুভাষ পত্রাবলী প্রকাশিত হলে দেখা গেল যে 'গুরুত্বপূর্ণ ও যৌথ মতপার্থক্য' থাকায় সুভাষচন্দ্রের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদানের প্রস্তাব গান্ধীজী অগ্রাহ্য করেছিলেন। ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবস পালিত হল এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পড়তে লাগল। গান্ধী-জিন্না বৈঠকের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল।

৬ই জুলাই গান্ধীজী বললেন যে, বর্তমান আন্দোলন কমপক্ষে পাঁচ বছর চলবে। ৪ঠা আগস্ট মার্কিন পত্রিকা "লুক"-এ প্রকাশিত এক সংবাদের প্রতিবাদে গান্ধীজী জানালেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া কংগ্রেস সন্তুষ্ট হবে না।

১৩ই সেপ্টেম্বর সরকারের সঙ্গে কারবার করা সম্পর্কে কংগ্রেসের কর্মনীতি

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গান্ধীজী নিঃ ভাঃ কাটুনি সমিতি কর্তৃক সৈন্যদের জন্য কম্বল সরবরাহ সমর্থন করলেন।

৩০শে অক্টোবর সত্যাগ্রহ আন্দোলন পর্যালোচনা করে গান্ধীজী গণ-আন্দোলনের আবেদন অগ্রাহ্য করে বললেন যে, বর্তমান অবস্থায় এ রকম আন্দোলন গৃহযুদ্ধ ডেকে আনবে, কারণ সাম্প্রদায়িক ঐক্য নেই।

৩রা ডিসেম্বর ভারত সরকার মওলানা আজাদ ও জওহরলাল নেহরু সহ সমস্ত সত্যাগ্রহীকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল।

এই সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল মহাযুদ্ধের প্রকৃতি পরিবর্তন (জার্মানী, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করার পর গড়ে ওঠে ফ্যাসিস্ট বিরোধী যুদ্ধজোট—সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন সম্মিলিতভাবে জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়) এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা মিটমাট করার জন্য ব্রিটিশ জনগণের চাপ।

নতুন পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত গান্ধীজীকে খুশি করতে পারে নি। তিনি বলেছিলেন যে জনসাধারণ এতে সাড়া দেবে না। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নতুন পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। এই প্রথম গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর অনুগামীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। এর আগেও মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, কিন্তু গান্ধীজী সে সব সামলে উঠতে পেরেছিলেন। এবারকার মতবিরোধ রাজনৈতিক দিক থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ভারতের ধনিকশ্রেণী গান্ধীজীর নেতৃত্বের উপর আর ভরসা রাখতে পারছেন না। গান্ধীজীর প্রিয় অনুগামীরাও, তাই, বিদ্রোহের ধ্বজা তুললেন। কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে গান্ধীজীর অপসারণের সূচনা এই ভাবেই হয়।

গান্ধীজী যে তাও সামলাতে পারছেন না এটা বুঝতে পারা যায় তাঁর অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ থেকে।

প্রথমত গান্ধীজী যুদ্ধে কোন রকম সহযোগিতা করার পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর ভক্ত শেঠজীরা সর্বপ্রকারে যুদ্ধে সহযোগিতা করলেও তিনি কোন প্রতিবাদ জানান নি। শুধু তাই নয় নিঃ ভাঃ কাটুনি সঙ্ঘ কর্তৃক সৈন্যদের জন্য কম্বল সরবরাহে তিনি সম্মতি দিতে দ্বিধা করেন নি।

দ্বিতীয়ত এতদিন তিনি ব্রিটেন বিপন্ন বলে কোনভাবে তাকে বিব্রত করতে

চান নি। যাতে ব্রিটেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যাহত না হয় তার জন্য শুধু বাক-স্বাধীনতার দাবিতে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু যখন নাৎসী জার্মানী ও সাম্রাজ্যবাদী জাপান একযোগে যুদ্ধ চালাতে শুরু করার ফলে ব্রিটেনের বিপদ আরও ঘনিয়ে এল তখন তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে বললেন যে, নৈতিক দিক থেকেও তিনি আর ব্রিটেনকে সমর্থন করতে পারছেন না।

তৃতীয়ত অহিংসার সমর্থনে তিনি এমন সব যুক্তির অবতারণা করলেন যা জীববিজ্ঞান বিরোধী। তিনি ব্রিটেনকে অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে নাৎসী জার্মানীকে রুখবার উপদেশ দিলেন। তাঁর এই উপদেশের সমর্থনে তিনি বললেন যে বাঘের সামনে যদি শত শত পশু-আত্মবলি দিতে প্রস্তুত হয় তা হলে বাঘ আর কত খাবে। শেষ পর্যন্ত সে পরাজয় স্বীকার করে হিংসা ত্যাগ করবে।

একটি স্কুলের ছেলেও জানে যে বাঘ বা কোন শ্বাপদ তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন প্রাণী শিকার করে না। কাজেই বাঘ নির্বিবাদে দিনের পর দিন তার ক্ষুন্নিবৃত্তি করে যাবে এবং কখনই অহিংস হবে না।

যাই হোক কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আবার যাতে সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু হতে পারে তার জন্য উপযোগী প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। ১৯৪১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর অহিংসা নীতি ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্যের উল্লেখ করে গান্ধীজী কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে তাঁকে রেহাই দেওয়ার অনুরোধ জানালেন। কংগ্রেস কালবিলম্ব না করে তাঁর অনুরোধ মেনে নিল। গান্ধীজী আবার কংগ্রেস থেকে সরে গেলেন, কিন্তু তখনও তিনি বুঝতে পারেন নি যে, কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে তাঁর অপসারণের দিন ঘনিয়ে এসেছে। তবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কংগ্রেস নেতারা তাঁরা অহিংসার নীতিকে অবশ্য পালনীয় বলে মনে করেন নি। তারা তাঁর অহিংস নীতিকে বিশেষ পরিস্থিতিতে অনুসরণযোগ্য একটি পলিসি বা কর্মনীতি রূপেই গ্রহণ করেছিলেন।

তাই ৩০শে ডিসেম্বর তিনি কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আজাদকে লেখা চিঠিতে লিখেছিলেন যে স্বাধীনতা লাভের গ্যারান্টি পেলে কংগ্রেস যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ব্রিটেনের সঙ্গে বৈষয়িক সহযোগিতা করার কথা ভাবছে…

আমি এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে, কেবলমাত্র অহিংসাই ভারত ও পৃথিবীকে আত্মবিনষ্টি থেকে রক্ষা করতে পারে। ব্যাপারটা এই রকম হওয়াতে আমাকে নিঃসঙ্গভাবেই হোক অথবা কোন সংগঠন বা ব্যক্তিদের সহায়তাতেই হোক আমার ব্রত পালন করতেই হবে। তাই অনুগ্রহ করে বোম্বাই প্রস্তাব অনুযায়ী আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে আমাকে রেহাই দিন।

১৯৪২—এক স্মরণীয় বছর। স্মরণীয় দুটি কারণে—এই বছরেই পৃথিবীর চরম বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল, আবার এই বছরেই পৃথিবীতে ফ্যাসিবাদের কবল থেকে ব্যক্তির সূচনা হয়েছিল।

জাপানের প্রচণ্ড আক্রমণে বার্লিন ও ব্রিটিশ নৌবাহিনী পর্যুদস্ত হওয়ার পর জাপানকে রুখবার কোন ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের ছিল না।

জাপান অভিযান শুরু হওয়ার পর পাঁচ মাসের মধ্যে ঘানা, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড, বর্মা, ফিলিপাইনস, ইন্দোনেশিয়া, আন্দামান ও অন্যান্য দ্বীপ দখল করেছিল। চীনের অধিকৃত অঞ্চলগুলি ধরে তখন জাপান এশিয়ার ৯৮ লক্ষ ১ হাজার বর্গকিলোমিটার ভূখণ্ড কুক্ষিগত করেছে যার লোকসংখ্যা হল ৪০ কোটি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কমস্ত কাঁচামাল তার করায়ত্ত। পৃথিবীর মোট টিন উৎপাদনের ৬০ শতাংশেরও বেশি টিন; সীসা, দস্তা, টাংস্টেন, ক্রোমিয়াম উৎপাদনের ১০ থেকে ২০ শতাংশ এবং কমপক্ষে পৃথিবীর মোট সোনা ও রূপার ১০ শতাংশ ঐসব দেশেই হত। এছাড়া পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রবার, নারকোলের শাঁস ও কুইনীন চাষের ৭৫ শতাংশ উৎপাদিত হত এইসব অঞ্চলেই।

কাজেই খাদ্য, সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল ও অন্যান্য সম্পদের কোন অভাব আর জাপানের ছিল না।

কিন্তু বিশাল ভূখণ্ড অধিকার করেই জাপান বিপদে পড়েছিল। ভারতে প্রবেশ করার মত শক্তিশালী সামরিকবাহিনী থাকলেও অধিকৃত সমস্ত অঞ্চলে মোতায়েন করার মত সৈন্য তার ছিল না। সোভিয়েত সীমান্তে তার বিশাল বাহিনী মোতায়েন রাখতে হয়েছিল। তার কোন অংশকে সরিয়ে আনার সাহস তার হয়নি। কাজেই জাপানকে তার ইয়োরোপীয় মিত্রদের সাহায্য কামনা করতে হল। কোয়াটুং বাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করতে পারলে ভারতবর্ষ দখল করা তখন খুবই সহজ ছিল, কিন্তু তা সম্ভব হল না বলেই

জার্মানী ও ইতালির সাহায্য লাভের জন্য ১৯৪২ সালের ১৮ই জানুয়ারি জাপানকে নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে আর একটি চুক্তি করতে হয়। এই চুক্তি অনুসারে কোন্ পক্ষ কোন্ কোন্ অঞ্চল দখল করতে পারবে এবং কোন্ কোন্ অঞ্চলে অভিযান চালাবে তা বিশদভাবে স্থির করে দেওয়া হয়। স্থির হয় যে, জাপবাহিনী এবং জার্মান-ইতালিয়ানবাহিনী ৭০তম অক্ষরেখায় মিলিত হবে। এই অক্ষরেখার পূর্ব দিকের সমস্ত অঞ্চল পাবে জাপান এবং পশ্চিম দিকের সমস্ত অঞ্চল পাবে জার্মানী ও ইতালি।

জার্মানী তার "অপারেশন ওরিয়েন্ট" বা প্রাচ্য অভিযান শুরু করবে ১৯৪২ সালের মে মাসে যাতে করে জাপান ভারত আক্রমণের সুযোগ পায়। এর বিনিময়ে জাপানকে অবিলম্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করতে হবে।

বার্লিন চুক্তির পর এই গোপন ত্রিশক্তি চুক্তি এক গুরুতর বিপদ ঘনিয়ে তুলেছিল।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে জার্মানী যে কোন মুহূর্তে সোভিয়েত ককেশাস ও পারস্যের মধ্যে দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে গিয়ে ভারতে জাপানের অগ্রবর্তী বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে পারবে ভেবে সে সময় তিনি ভয়ে হিম হয়ে গিয়েছিলেন।

জেনারেল আইজেনহাওয়ারের সেনানীমণ্ডলী রণাঙ্গনের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে জার্মানী যদি সোভিয়েত ককেশাস ও পারস্যের মধ্যে ঠেলে বেরিয়ে আসতে পারে তাহলে ব্রিটেন জার্মানী ও জাপানের যুক্ত আক্রমণ রুখতে পারবে না। এবং তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কার্যত দুনিয়ায় একাই আত্মরক্ষার লড়াই চালাতে হবে।

ব্রিটেনের সরকারকে কানাডায় স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা এই সময়েই তৈরি হয়ে যায়।

সোভিয়েত সামরিক কর্তৃপক্ষ নির্ভরযোগ্য খবর পেয়ে বুঝেছিলেন যে, ব্রিটেন ইরানে জার্মানদের রুখতে পারবে না, আর ভারতে তো পারবেই না। সিঙ্গাপুরের পতন এবং বর্মা থেকে জেনারেল ষ্টীলওয়েলের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযাত্রী বাহিনীসহ ব্রিটিশ বাহিনী যেরকম বিশৃঙ্খলভাবে পশ্চাৎপসরণ করে তাতেই ব্রিটিশ বাহিনীর 'কর্মকুশলতা'র প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

দেখা যাচ্ছে যে, গান্ধীজী রণনীতি সম্পর্কে কিছু না জেনেও ব্রিটেন যে ভারত

রক্ষায় অসমর্থ এই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তাই তিনি অবিলম্বে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার দাবি জানান। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, গান্ধীজী অহিংস পন্থা ছাড়া অন্য কোনভাবে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাতে রাজি হলেন না। এই নিয়ে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটে। গান্ধীজী কংগ্রেস থেকে সরে গেলেন। ১৯৪২ সালের ৭ই জানুয়ারি তিনি এক বিবৃতিতে বললেন যে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেস আবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবে এমন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু কেবলমাত্র অহিংসার ভিত্তিতেই সর্বপ্রকার যুদ্ধের বিরোধীদের পক্ষ থেকে শুধুমাত্র প্রতীকী আন্দোলনরূপে এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

"সমস্ত যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে যাওয়ার অধিকার জাহির করার জন্যই এটা চালিয়ে যেতে হবে।"

গান্ধীজী অহিংসা নীতিকে গ্রহণ করেছেন তাঁর ধর্মমতরূপে। অহিংসা নীতিকে বিসর্জন দিয়ে তিনি দেশের স্বাধীনতা লাভ করতেও আগ্রহী নন। কংগ্রেস স্বাধীনতা পেলে যুদ্ধে যোগ দিতে রাজি, কাজেই কংগ্রেস থেকে সরে যাওয়া ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু গান্ধীজী কংগ্রেস ছাড়তে পারলেন না। একদিন যে কংগ্রেসের মাধ্যমে তিনি তাঁর অহিংসা নীতিকে মুক্তি সংগ্রামে প্রয়োগ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছেন আজ সেই কংগ্রেস থেকে দূরে সরে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। অন্যদিকে দেশের মানুষের কাছে, জাতীয় বুর্জোয়ার কাছে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় নি। তারাও তাঁকে চায়। তাই তাঁর নিজের শর্তে গান্ধীজী আবার কংগ্রেসের হাল ধরতে রাজি হলেন। কিন্তু তাঁর আচরণ ও উক্তি থেকে বুঝতে পারা যায় যে, এ সময় তিনি রীতিমত ক্ষুব্ধ এবং কিছুটা উদভ্রান্ত।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদীদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে। লর্ড লিনলিথগোকে একজন ধর্মভীরু খ্রীষ্টান বলে তিনি বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর কোন আবেদনে সাড়া তো দিলেনই না, বরং অত্যাচার ও নিপীড়নের বন্যা বইয়ে দিয়ে সারা দেশে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করলেন। আবার তিনি যে কংগ্রেসকে তাঁর অহিংসা নীতির রূপায়ণের উপায়রূপে গ্রহণ করেছিলেন সেই কংগ্রেসও তাঁর অহিংসা-নীতিকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে রাজি নয়।

১৫ জানুয়ারি ওয়ার্ধায় নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে গান্ধীজী বললেন যে, অহিংসার উপর তাঁর আস্থা বিপুল, তবে তিনি অহিংসা নীতিকে কংগ্রেসের কাছে রেখেছেন রাজনৈতিক অর্থে। তিনি আবার বললেন যে, অহিংসা নীতিকে বাদ দিয়ে তিনি স্বরাজ চান না : সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও জানিয়ে দিলেন যে, তিনি কখনই কংগ্রেসের কোন ক্ষতি করবেন না এবং তাঁকে হারানর কোন প্রশ্নই নেই।

অর্থাৎ কংগ্রেস যা ভাল চায় করবে তিনি তা মেনে নেবেন।

এই সময়েই তিনি জওহরলালকে তাঁর উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করলেন।

কংগ্রেস তথা জাতীয় বুর্জোয়ারা আশ্বস্ত হল। রুশ রণাঙ্গনে নাৎসীদের এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় জাপানের সাফল্য লক্ষ্য করে কংগ্রেস তথা জাতীয় বুর্জোয়ারা নতুন আশায় উদ্দীপিত হয়ে উঠল।

১৪ই ফেব্রুয়ারি গান্ধীজী 'হরিজন' পত্রিকায় লিখলেন: "নাৎসীরা যদি ভারতে আসে তা' হলে কংগ্রেস যে ভাবে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে লড়ছে সেই ভাবেই তাদের সঙ্গে লড়বে।"

৭ই মার্চ রেঙ্গুনের পতন হল। সংকট ঘনীভূত হচ্ছে দেখে মার্কিন সরকার ঘোষণা করল—"জাপানের অগ্রগতির ফলে ভারতবর্ষের ব্যাপারে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে তা ব্রিটেনের মনে আক্রমণের বিপদ থেকে তাঁদের দেশকে রক্ষার জন্য ভারতীয় জীবনের সমস্ত শক্তিকেই সমাবেশ করার ইচ্ছা জাগিয়েছে।"

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ব্রিটিশ দূতরূপে এর পরেই ভারতে উপনীত হলেন।

ক্রিপক্ষ দৌত্য ব্যর্থ হল। ১০ই এপ্রিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ক্রিপক্ষ প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করল। অন্যান্য দলও বিভিন্ন কারণে ক্রিপক্ষ-এর প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য করল।

চরম বিপদের সময়েও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নতিস্বীকার করতে চাইছে না দেখে কংগ্রেস তথা জাতীয় বুর্জোয়ারা শেষ বাজী ধরার জন্য প্রস্তুত হল।

মাঝে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুর গুজব রটে যায় এবং গান্ধীজী মৃত্যু সংবাদ সত্য মনে করে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। পরে জানা যায় যে গুজব ভিত্তিহীন।

জাপানের আক্রমণ আসন্ন মনে করে যখন সারা দেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে এবং

চেয়েছিলেন যখন তাঁর প্রস্তাব গান্ধীজী গ্রহণ করলে ভারতবর্ষের চেহারা বদলে যেতে পারত। কিন্তু যেহেতু সুভাষচন্দ্র অহিংসাকে পরম ধর্ম বলে গ্রহণ করতে পারেন নি সেইহেতু গান্ধীজী তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিলেন।

সারা পৃথিবীতে যখন গভীর সংকট ঘনিয়ে এসেছে তখন গান্ধীজী বুর্জোয়া রাজনীতির জুয়াখেলায় মেতে উঠলেন। সুভাষচন্দ্রের মতই দেশের স্বাধীনতা লাভই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান হয়ে উঠল। ভারত স্বাধীনতা পেলে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে সহযোগিতা করবে একথাও তিনি মেনে নিলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানালেন যে, রুশিয়া ও চীনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি আছে। কিন্তু ব্রিটেনের প্রতি এতদিন তাঁর যে নৈতিক সমর্থন ছিল তাও প্রত্যাহার করে নিলেন। তিনি বললেন: "ভারতের প্রতি ব্রিটেনের আচরণ আমাকে গভীর বেদনা দিয়েছে। ...আর তাই, যদিও আমি ব্রিটেনের নতিস্বীকার অর্থাৎ পরাজয় কামনা করি না, তবু আমার মন তাকে কোন নৈতিক সমর্থন জানাতে চাই না।"

মে মাসে এক সাক্ষাৎকারে গান্ধীজীর উল্লিখিত উক্তি ক্রিপস দৌত্যের ব্যর্থতার পরিণতি। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস উদার, প্রগতিশীল, ফলাহারী ইত্যাদি অনেক কিছুই গান্ধীজীকে জানানো হয়েছিল এবং গান্ধীজীও তার কাছ থেকে উপযুক্ত সাড়া পাবেন বলে আশা করেছিলেন। কিন্তু সে আশা যখন ব্যর্থ হয়ে গেল তখনই গান্ধীজীর দৃঢ়প্রত্যয় হয় যে, ইংরেজ ভারতবর্ষ ত্যাগ না করলে কিছুই হবে না। সত্যিকারের ঐক্য তখনই গড়ে উঠবে যখন ইংরেজ ভারতবর্ষ ত্যাগ করবে এবং অপর কোন শক্তি তার স্থান গ্রহণ করবে না। মে মাসে এক সাক্ষাৎকারে গান্ধীজী বেশ পরিষ্কারভাবেই জানিয়ে দিয়েছিলেন।

এরপর 'ভারত ছাড়' এই রণধ্বনিকে জনপ্রিয় করে তোলার কাজে গান্ধীজী নিজেকে নিয়োজিত করলেন।

১৯৪২ সালের ২৪শে মে একজন মার্কিন সাংবাদিক গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারকালে প্রশ্ন করেন যে, যদি জিন্না বলেন যে মুসলমানরা হিন্দু শাসন মানবে না তাহলে কি হবে?

জবাবে গান্ধীজী বলেন "আমি ব্রিটিশকে কংগ্রেস বা হিন্দুদের হাতে ভারতবর্ষকে তুলে দিতে বলি নি। তারা ভারতবর্ষকে ঈশ্বরের হাতে, আধুনিক ভাষায় যাকে বলে অরাজকতার হাতে তুলে দিক। তখন সমস্ত দল হয় পরস্পরের বিরুদ্ধে কুকুরের মত লড়বে, আর না হয়, একা দায়িত্বসমূহের সম্মুখীন

হয়ে যুক্তিসঙ্গত মীমাংসায় উপনীত হবে। আমি আশা করব সেই বিশৃংখলার মধ্যে থেকে অহিংসার অভ্যুদয় ঘটবে।"

গান্ধীজীর আচরণ ও উক্তিতে সেদিন জওহরলাল উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর 'ভারত আবিষ্কার' (দ্য ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া) গ্রন্থে ফ্যাসিস্ত আগ্রাসনের ফলে সারা পৃথিবীতে যে বিপদ দেখা দিয়েছে তা উপেক্ষা করে গান্ধীজী সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। আন্দোলন শুরু করার অর্থ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করা এ কথাও নেহরু বলেছিলেন।

গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর ও অন্যান্য নেতাদের দীর্ঘ আলোচনাও হয়েছিল। তার ফলে গান্ধীজী আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তে তিনি অটল রইলেন, কারণ তাঁর মতে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ উদ্দীপিত জনগণ স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী অন্য শক্তিকেও প্রতিহত করার শক্তি ও সামর্থ্য অর্জন করবে।

জওহরলাল এই যুক্তি মেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সংগ্রামের আহ্বানে সম্মতি দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এবার গান্ধীজী রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন খাঁটি দেশপ্রেমিক নেতা রূপে যাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হল ভারতবর্ষকেই ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করা। হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন এখন তাঁর কাছে বড় নয় যদিও শেষ পর্যন্ত অহিংসারই জয় হবে বলে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল।

সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র দিতে এবং তা প্রত্যাখ্যাত হলে দেশব্যাপী গণ-সত্যাগ্রহ শুরু করতে। এবার গান্ধীজীও সেই পথে অগ্রসর হলেন। তফাৎ হল এই যে, সুভাষচন্দ্রের মত তিনি কোন বিদেশী শক্তির সাহায্য কামনা করেন না। এমন কি জাপানকে তিনি হুঁশিয়ারও করে দিয়েছিলেন।

১৯৪২ সালের ৩রা জুন খ্যাতনামা সাংবাদিক লুই ফিসার গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলেন। এক সপ্তাহ ধরে আলোচনা হল। এই দীর্ঘ সাক্ষাৎকারকালে গান্ধীজী এমন সব কথা বললেন যা আগে কখনও বলেন নি। তাঁর পরিকল্পিত আইন অমান্য আন্দোলনের ছবি তুলে ধরতে গিয়ে গান্ধীজী বললেন: "গ্রামগুলিতে চাষীরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেবে।···আর খাজনা বন্ধ করা চাষীদের মনে এই সাহস যোগাবে যে তারা স্বাধীনভাবে আন্দোলন করতে পারে। তাদের পরের ধাপ হবে জমি দখল করা।"

লুই ফিসার চাষী-জমিদার সংঘর্ষের আশঙ্কা ব্যক্ত করায় গান্ধীজী বলেন: "১৫ দিন বিশৃংখলা চলতে পারে, তবে আমরা শীঘ্রই তা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারব।"

গান্ধীজী বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন এটা বেশ লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ লক্ষ লোকের অভ্যুত্থান ঘটলে তা কি করে ১৪ দিনের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে তা বোঝা মুশকিল। পরে গান্ধীজী দরকার হলে আম-হরতাল বা সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করতে প্রস্তুত আছেন এমন কথাও বলেন।

সুভাষচন্দ্র তো এর বেশি কিছু চাননি।

এক কথায় বলা যায় যে, গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের পথই অনুসরণ করলেন এমন সময় যাকে সুসময় বলা যায় না।

হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন নিয়ে তিনি আর মাথা ঘামাচ্ছেন না। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলে তিনি ইংরেজদের ভারতে থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতেও রাজি। তিনি ২১শে জুনের 'হরিজন' পত্রিকায় লিখলেন:

"আমার অভিমত হল বিভিন্ন দলেব ইচ্ছা ও দাবি নির্বিশেষে ব্রিটিশ কর্তৃত্বের সম্পূর্ণ অবসান হওয়া উচিত। কিন্তু আমি তাদের সামরিক জাপানের দখলদারি রোধে আবশ্যকতা স্বীকার করি। এ জন্য তাদের ভারতে থাকার প্রয়োজনও হতে পারে। এই বাধাদানের কাজটা তাদের ও আমাদের অভিন্ন লক্ষ্য।... কোন অর্থেই শাসক হিসাবে নয়, তবে স্বাধীন ভারতের মিত্ররূপে আমি ভারতে তাদের উপস্থিতি সহ্য করব।"

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বেশ কয়েকদিন আলোচনার পর গান্ধীজী তাঁর 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবের খসড়াটি রচনা করলেন।

গান্ধীজী আর অপেক্ষা করতে রাজি নন। তিনি এখনই দেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করে মিত্রপক্ষের সঙ্গে একযোগে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চান।

কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল যে, যে ধরনের আন্দোলনের কথা তিনি বলে আসছিলেন প্রস্তাবের খসড়ায় তার কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। তিনি তাঁর সেই চিরাচরিত ধারায় আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব করলেন। কোনরূপ গণবিক্ষোভ বা অশান্তি না ঘটে তার জন্য সর্বপ্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলা হল।

৭ই আগস্ট গান্ধীজী নিজে আন্দোলন সম্পর্কে ৪টি অনুজ্ঞা জারি করলেন :

(১) তোমার মনে যদি লেশমাত্র সাম্প্রদায়িকতা থাকে তা হলে সংগ্রাম থেকে সরে যেও ;

(২) জাপানকে স্বাগত জানানোর মনোভাব ত্যাগ কর ;

(৩) সমস্ত ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হওয়ার আশা কর না। ক্ষমতা তোমার নয়, ভারতের জনগণের ;

(৪) আমি অন্তত পক্ষে এইটুকু আশা করি যে, মনে যদি নাও হয় কর্মে তুমি অহিংস থাকবে।

সত্যাগ্রহীদের প্রতি এই অনুজ্ঞাগুলি দিয়ে গান্ধীজী আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হলেন।

১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট তাঁর প্রস্তাব নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে গৃহীত হল।

সেদিন গান্ধীজী তাঁর স্মরণীয় বক্তৃতায় বলেন : "যদি পাওয়া যায় তা'হলে আমি এখনই, এই রাত্রেই ভোর হওয়ার আগেই স্বাধীনতা চাই।...সাম্প্রদায়িক ঐক্য অর্জনের জন্য স্বাধীনতা এখন অপেক্ষা করতে পারে না।...দুনিয়া জুড়ে প্রবঞ্চনা ও অসত্য জাঁকিয়ে বসেছে। এই পরিস্থিতিতে আমি অসহায় দর্শক হয়ে থাকতে পারি না।...

আমি আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি যে, মন্ত্রীত্ব বা ঐরকম কিছুর জন্য বড়লাটের সঙ্গে দরকষাকষি করতে যাচ্ছি না পূর্ণ স্বাধীনতার কর্মে আমি কিছুতেই সন্তুষ্ট হব না।

আমি আপনাদের একটি মন্ত্র, ছোট্ট মন্ত্র দিচ্ছি। আপনাদের হৃদয়ে এই মন্ত্র এঁকে নিন, আর আপনাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসে তা প্রকাশ পাক। মন্ত্রটি হল : 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' আমরা হয় স্বাধীন ভারতবর্ষকে দেখব আর না হয় লাভের চেষ্টা করতে গিয়ে মরব, আমাদের দাসত্বের চিরস্থায়িত্ব দেখার জন্য আমরা বেঁচে থাকব না।" দেশের অসাড় জনগণকে জাগিয়ে তোলার জন্য স্বাধীনতা চাই এবং আজই চাই এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী পরিষ্কারভাবেই জানিয়ে দিলেন যে, এই সংগ্রামে গোপন কিছু করা চলবে না "...বর্তমান সংগ্রামে আমাদের প্রকাশ্যে কাজ করতে হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করে বুকে গুলি গ্রহণ করতে হবে।"

২৬শে জুলাই-এর ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে স্বাধীন ভারতবর্ষ মিত্রশক্তির

সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন যে, ভারতের স্বাধীনতার দাবি অগ্রাহ্য করলে আন্দোলন অনিবার্য হয়ে উঠবে।

৮ই আগস্টের প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে চরমপত্র ছাড়া কিছুই নয়।

যখন এই চরমপত্র দেওয়া হল তখন যুদ্ধের অবস্থা কিরকম দাঁড়িয়েছিল তা' একবার লক্ষ্য করা যাক।

মস্কো অধিকারের ব্যর্থ চেষ্টা এবং সোভিয়েতের পাল্টা আক্রমণ নাৎসী কর্তৃপক্ষকে চিন্তান্বিত করে তুলেছিল। তাই সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বিরাট এক সাঁড়াশি আক্রমণ শুরু করা হল চরম আঘাত হানার উদ্দেশ্যে। সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে সমাবেশ করা হল সমগ্র জার্মানবাহিনীর ৭৬ শতাংশ অর্থাৎ ৬০ লক্ষ সৈন্য ও অফিসার, ৩,২৭০টি ট্যাংক; ৪৩ হাজার কামান ও মর্টার এবং ৩,৪০০ যুদ্ধ বিমান।

এই বিশাল বাহিনীকে প্রাণপণে বাধা দিতে দিতে সোভিয়েত বাহিনী যখন পিছু হটছে তখন জার্মানীর একটি অংশ ধাবিত হল স্তালিনগ্রাদের দিকে এবং অপরটি অগ্রসর হল ককেশাসের দিকে প্রাচ্য অভিযানের সূচনা করতে।

২৪শে জুলাই সোভিয়েত বাহিনী যখন বিপুল শত্রুবাহিনীর সঙ্গে লড়তে লড়তে পিছু হটছে তখন দন নদীর সেতুর কাছে এসে থামল একটি মোটর গাড়ি। গাড়ি থেকে নামলেন জার্মান ১৭শ বাহিনীর সেনাপতি জেনারেল হার্বার্ট রুয়োফ এবং জার্মানীর জাপ রাষ্ট্রদূত ওশিমা। জার্মান সেনাপতি সদম্ভে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন: "দেখুন, জেনারেল! দক্ষিণের দ্বার খুলে গেছে। ভারতে যে সময় জার্মান সৈন্যদল ও আপনাদের সম্রাটের বাহিনী মিলিত হবে সেই সময় নিকটবর্তী হচ্ছে।"

সত্যই এক ভয়ঙ্কর দিন এগিয়ে আসছিল। হিটলার ভারত জয় সহ প্রাচ্য অভিযানের সাফল্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে নিজেই অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

মিত্র পক্ষের বিপদ যখন ঘনীভূত ঠিক তখনই গান্ধীজী তাঁর আগস্ট প্রস্তাবের খসড়া রচনা করেছিলেন। চরম পত্র তিনি দিতে চান নি, তিনি আশা করেছিলেন চরম বিপদের দিনে কংগ্রেসের সহযোগিতার প্রস্তাব সরকার মেনে নেবে। কিন্তু কিছুই হল না। ৮ই আগস্টের প্রস্তাবের প্রথম ও দ্বিতীয়

অংশের মধ্যে যে স্ববিরোধিতা ছিল তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। আন্দোলনের হুমকিকে বড় করে তুলে ধরে তারা প্রচার করল যে, কংগ্রেস আসলে ফ্যাসিবাদের পক্ষে। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করে কংগ্রেস জাপান ও জার্মানীর জয়লাভের পথ সুগম করতে চায়।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের কাজ সীমাবদ্ধ রাখল না। তারা অকস্মাৎ আঘাত হানল। গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতাদের আলাপ আলোচনার আশা-চূর্ণ করে দিয়ে দেখতে দেখতে সমস্ত নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল।

একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিই বুঝতে পেরেছিল যে, সাম্রাজ্যবাদ আকস্মিক আঘাত হানবে। তাই অনেক আগেই ১৯৪২ সালের ২৬শে জুলাই এক খোলা চিঠিতে গান্ধীজীকে সতর্ক করে দিয়ে লেখে "আপনি যখন সংগ্রাম শুরু করবেন তখন কি হবে? ওরা ধীরেসুস্থে আপনাকে ও হাজার হাজার সক্রিয় কর্মীকে জেলে পুরবে, ভালো সেজে ঘোষণা করবে যে, ফ্যাসিস্ট আক্রমণকারীদের হাত থেকে যাতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করা যায় তার জন্য তাদের এই দুর্ভাগ্যজনক কার্য পালন করতে হচ্ছে।"

গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতারা এই হুঁশিয়ারিতে কর্ণপাত করেন নি।

১৬ই আগস্ট বন্দীশালা থেকে গান্ধীজী বড়লাটকে লিখেছিলেন "ভারত সরকারের উচিত ছিল আমি যতক্ষণ না গণ-আন্দোলন আরম্ভ করছি অন্তত-পক্ষে সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা। আমি তো প্রকাশ্যেই বলেছিলাম যে, কোন নির্দিষ্ট কাজ করার আগে আপনাকে চিঠি দেবার কথা আমি ভেবে রেখেছি।" দমননীতির বন্যা যখন বইতে থাকল ক্ষুব্ধ ও নেতৃত্বহীন ক্রুদ্ধ জনতা যখন পালটা আঘাত হানতে থাকল তখন নেতারা কারাগারে।

অহিংসা ও প্রেমের উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করে যে মানুষটি সাম্রাজ্যবাদের হৃদয় পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিলেন সে স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গেল। রাজনীতিকে উচ্চ নৈতিক স্তরে উন্নীত করার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। গান্ধীজী আবির্ভূত হলেন সম্পূর্ণ এক দেশ-প্রেমিক জাতীয়তাবাদীরূপে যার কাছে হিংসা-অহিংসা বড় কথা নয়, ফ্যাসিস্ট বিপদও উপেক্ষার যোগ্য। ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জোয়ালমুক্ত করাই তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান।

স্বাভাবিকভাবেই সুভাষচন্দ্র সেদিন তাঁর জয়গান গেয়েছিলেন, ফ্যাসিস্টরা তাঁর অনুরাগী হয়ে উঠেছিল।

এমনিভাবেই গান্ধীজীর জীবনে ঘনিয়ে এসেছিল এক মর্মান্তিক ট্র্যাজিডি।

গান্ধীজী সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত সংগ্রাম সরকারকে নতিস্বীকার করতে বাধ্য করবে বলে আশা করেছিলেন। সর্দার বল্লভভাই তো ৭ দিনেই লড়াই ফতে হবে বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর গান্ধীজী তাঁর ভাষণে বলেন "এই মুহূর্তেই প্রকৃত সংগ্রাম শুরু হচ্ছে না। আপনারা শুধু আমার হাতে কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন। আমার প্রথম কাজ হবে মহামান্য বড়লাটের সঙ্গে দেখা করা এবং তাকে কংগ্রেসের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা। এর জন্য দুই বা তিন সপ্তাহ সময় লাগতে পারে। এই সময়ের মধ্যে আপনারা কি করবেন? চরকা তো আছেই ··কিন্তু আপনাদের তার চেয়ে বেশি কিছু করতে হবে···এই মুহূর্ত থেকেই আপনাদের প্রত্যেককে অনুভব করতে হবে যে, প্রত্যেক নর-নারীই স্বাধীন, এমন কি এমনভাবে কাজ করবেন যে আপনারা স্বাধীন এবং আর এই সাম্রাজ্যবাদের পদানত নয়।"

ভারত সরকার গান্ধীজীর এসব কথা আমলেই আনল না। আগস্ট প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড আঘাত হানা হল, ধরপাকড়ের হিড়িক পড়ে গেল।

৯ই আগস্ট সকালে গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে সমগ্র দেশ স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারপরেই শুরু হল স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ। বিভিন্ন স্থানে বিরাট জনতা জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে নেতাদের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠল। হরতালের ফলে জনজীবন স্তব্ধ হয়ে গেল। তখনও কোন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে নি। জনগণ শান্তিপূর্ণভাবেই প্রতিবাদ জানাতে থাকে। কিন্তু সন্ত্রস্ত সরকার দেশব্যাপী প্রতিবাদে বিহ্বল হয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠল। জনতা ছত্রভঙ্গ হওয়ার আদেশ অমান্য করার সঙ্গে সঙ্গে গুলি বর্ষণ করা হতে লাগল। শুধু দিল্লীতেই ১১ই ও ১২ই আগস্ট পুলিস ৪৭ বার বিভিন্ন স্থানে গুলি চালায়, ফলে নিহত হন ৬৬ জন এবং সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত হন ১১৪ জন। অনুরূপ ঘটনা ঘটতে থাকল বিভিন্ন প্রদেশে।

গান্ধীজীর 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ধ্বনিকে জনগণ রণধ্বনি রূপে গ্রহণ করে

পালটা আক্রমণে নেমে পড়ল। কংগ্রেস কোন আন্দোলন শুরু করেনি, নেতারা কোন নির্দেশ দেন নি, এসব কথা সেদিন উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ জনগণ মনে রাখেনি, রাখতে পারেনি। বিভিন্ন ছোট ছোট দল ও গোষ্ঠী নিজেদের মত গান্ধীজীর রণধ্বনির ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন স্থানে নেতৃত্ব গ্রহণ করল। ধর্মঘট ও হরতালের সঙ্গে শুরু হল থানা, ডাকঘর, রেল-স্টেশনগুলির উপর আক্রমণ। ধ্বংস ও অগ্নিসংযোগ চলল ব্যাপকভাবে। অনেক জায়গায় রেল লাইন উপড়ে ফেলা হল, টেলিফোনের তার কেটে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল। আবার কোন কোন জায়গায় প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ থেকে আরম্ভ করে গেরিলা যুদ্ধও চলল। মেদিনীপুর, সাতারা প্রভৃতি স্থানে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হল।

মেদিনীপুরেই সবচেয়ে সুসংগঠিতভাবে সংগ্রাম চালানো হয়। সরকার গঠন করা হয় এবং রীতিমত ফৌজ ও পুলিসবাহিনীও সংগঠিত করা হয়। দুই বছর এই স্বাধীন সরকার তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। পুলিস ও ফৌজের আক্রমণে শত শত নরনারী শহীদ হন, বহু গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হয়, গ্রেপ্তার করা হয় ১০ সহস্রাধিক লোককে, পাঁচ হাজারেরও বেশি বাড়ি লুঠ করা হয়, প্রায় দুই শত নারী ধর্ষিতা হন। বলা যায় যে ১৮৬৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর এত ব্যাপক ও প্রচণ্ড অভ্যুত্থান ভারতবর্ষে কখনও হয় নি। তবু এই 'আগস্ট বিপ্লব' 'সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত' হল না। সাম্রাজ্যবাদ প্রস্তুত ছিল, অসংগঠিত প্রায় নিরস্ত্র ও উপযুক্ত নেতৃত্বহীন বিদ্রোহকে তারা রক্তস্রোতে ডুবিয়ে দিতে পারল ১৯৪৪ সালের মধ্যেই। শহীদের মৃত্যুবরণ করেছিল দশ সহস্রাধিক নর-নারী, আহতের সংখ্যা দাঁড়ায় বহু সহস্র।

তবু স্বীকার করতে হবে এই বিরাট গণ-অভ্যুত্থানের দুর্বলতা ছিল অনেক।

প্রথমত, এমন সময় এই অভ্যুত্থান শুরু হয় যখন পৃথিবী ফ্যাসিস্ট আক্রমণের ফলে এক চরম বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। সরকারের ভয়ঙ্কর হিংস্র আক্রমণ—(গান্ধীজীর ভাষায় Leonine Violence) এর জন্য মূলতঃ দায়ী হলেও গান্ধীজী ও কংগ্রেসের দায়িত্বও কম ছিল না। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজী যথা সময়ে আন্দোলনের ডাক দিতে বারবার অস্বীকার করে অত্যন্ত অসময়ে আন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে বড় রকমের ভুল করেছিলেন।

সরকার তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবে এবং বিক্ষুব্ধ জনগণ সরকারের আঘাতে

ক্ষিপ্ত হয়ে সহিংস প্রত্যাঘাত হানবে না এমন ধারণা পোষণ করাও সম্পূর্ণ অবিবেচকের কাজ হয়েছিল ;

দ্বিতীয়ত, এই অভ্যুত্থানে ভারতীয় ফৌজ ও পুলিস যোগ দেয়নি, বরং তারা সরকারের আদেশই পালন করেছিল ;

তৃতীয়ত, দেশের অনেক মানুষ (শুধু কমিউনিস্টরা নয়) অভ্যুত্থানকে সমর্থন করতে পারে নি। মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরাট অংশ এই অভ্যুত্থানে যোগ দেয় নি ;

চতুর্থত, অভ্যুত্থানে শ্রমিকশ্রেণীর বেশ বড় ও সংগঠিত অংশ যোগ দেয়নি। কৃষকদেরও বড় অংশ নিষ্ক্রিয় ছিল। 'যুগান্তর' দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায় স্বীকার করেছেন যে, শ্রমিক, কৃষকদের সঙ্গে কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ যোগের অভাবেই এইরকম ব্যাপার ঘটে ;

পঞ্চমত, অভ্যুত্থানের কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল না, কোন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাও ছিল না। এর ফলে অভ্যুত্থান ঘটে বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে। কাজেই এই অভ্যুত্থান সফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

সবশেষে জাতীয় বুর্জোয়ার বিচিত্র ভূমিকা ছিল লক্ষ্য করার মত। আন্দোলনের সমর্থক হয়েও ধনিকশ্রেণী যথারীতি সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা অব্যাহত রেখে বিপুল মুনাফা অর্জন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নি। জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি সরকারী প্রচার বিজ্ঞাপন প্রতিদিন বক্ষে ধারণ করতে কুণ্ঠিত হয় নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনাকালে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রলয়ঙ্কর রূপ ধারণ করার কালে গান্ধীজীকে সম্পূর্ণ দুই স্বতন্ত্র মূর্তিতে দেখা গেল। প্রথমদিকে তিনি তাঁর চিরাচরিত মূর্তিতেই দেখা দিয়েছিলেন। অহিংসাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। ইংরেজদের তিনি অহিংস প্রতিরোধের মাধ্যমে হিটলারকে রুখবার উপদেশ দিয়েছিলেন, হিটলারকেও চিঠি লিখেছিলেন। ব্রিটেনের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতিও তিনি জানিয়েছিলেন এবং কোনোভাবেই ব্রিটিশ সরকারকে তিনি বিব্রত করতে চাননি। কিন্তু ৪১-৪২ সালের মধ্যে গান্ধীজী দেখা দিলেন এক অপ্রত্যাশিত রকমের ভিন্ন রূপে।

অহিংসা আর তাঁর ধ্যানজ্ঞান ও একমাত্র লক্ষ্য নয়। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন। অহিংসা ও হিংসার প্রশ্ন আর তাঁর কাছে

তখন বড় নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিজম-এর যে ভয়ঙ্কর বিপদ ঘনিয়ে আসছে তার সম্পর্কেও তিনি উদাসীন। তাঁর যুক্তি হল ফ্যাসিজমকে প্রতিরোধ করতে হলে ব্রিটেনের উচিত এখনই ভারতবর্ষকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র রূপে ঘোষণা করা। ব্রিটেনকে তার সঙ্কটকালে যিনি ব্রিটেনকে কোনভাবেই বিব্রত করতে রাজি হননি, এখন নিদারুণ সংকটকালে তিনি অনায়াসেই ব্যাপক গণ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হতে দ্বিধা করলেন না।

গান্ধীজীর এ মূর্তি পুরোপুরি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতার মূর্তি। তাঁর এই মূর্তি লক্ষ্য করে এককালের বিপ্লবী 'যুগান্তর' দলের নেতারা খুশি। 'যুগান্তর' দলের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত লিখেছেন: "...ইতিহাসকে গান্ধী অস্বীকার করতে পারলেন না। সশস্ত্র প্রয়াসকেও এবার তার স্থান দিতে হল। ১৯২২ সালে তা তিনি দেন নি। এবার সশস্ত্র বিপ্লবপন্থাকে স্বীকৃতি দিয়েই তিনি বলে গেলেন—যে যার মত এগিয়ে যাও।"

(বিপ্লবী গান্ধী ও ভারতে বিপ্লবান্দোলন—ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, গান্ধী পরিক্রমা', পৃঃ ২২৮, ২য় সং)

গান্ধীজী তাঁর বক্তব্যের এই ব্যাখ্যা পরে নিজে মানেন নি, কিন্তু সাধারণ মানুষ এই ব্যাখ্যাকেই তাদের নিজের মত করে মেনে নিয়েছিল।

—যুদ্ধ বেধেছে—গ্রামের মানুষ, নিরক্ষর দেহাতী মানুষরা কিভাবে দেখল এই যুদ্ধকে।

"......জাপানীরা হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এবার বাঘের খেলা জর্মনবালা। লেলে লানা। গুরুজী মহারাজের আর বুধ ভগবানের[১] পুজো করে জপৈনীরা।

...কাগজ দিয়ে ওরা হাওয়াই জাহাজ তৈরি করে। রবার দিয়ে জাহাজ। জল খাইয়ে ছাড়বে টমি পল্টনকে। জলের নিচ দিয়ে একেবারে কলকাতা থেকে কুরমাইনা পৌঁছে যাবো।"

..."দুনিয়াটা ঠিক বদলাচ্ছে না, ভেঙে পড়ছে হুড়মুড় দুমদাম করে।... রোগর রাজ্যে উড়ে এসে বসেছেন রাজা—সরকার বাহাদুর। এতদিন 'ইন্দুর ধনুক আড়ালে' ইনরজী মহারাজের মতো ছিল সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারের রাজা।

১. সূর্যদেব ও ভগবান বুদ্ধ।

…সেই রাজা এসে গিয়েছেন কাছে।

সাধারণ নিরক্ষর মানুষ প্রত্যক্ষভাবে রাজাকে দেখছে চড়া দর, হাওয়াই জাহাজ, 'কিনাক,'[১] আর 'কনট্রোলে'র মধ্যে।"

"রামায়ণে এ রকম রাজার কথা লেখা নেই।…বদলায় অথচ বদলায় না। পুরনো রামায়ণ আর নতুন রামায়ণে এই পাকিয়ে যায়।"

…"রাজ্যিশুদ্ধ লোক ঠিকাদার হয়ে যাচ্ছে। সব হয়ে যাচ্ছে অন্য রকম।"

নিরক্ষর সাধারণ মানুষের ভরসা একমাত্র 'বলন্টিয়রজী' (অর্থাৎ কংগ্রেসের ভলন্টিয়ার)। কি বলেন তিনি? "মৌকা এসেছে যে যা পারে করে নেবার। এমন সুযোগ জীবনে একবারের বেশি আসে না কালকে এ সুবিধা নাও থাকতে পারে। সাধে কি আর মহাত্মাজী গরমেছেন। বরদাস্তের বাইরে হয়ে গিয়েছে। মহাত্মাজী বলে গিয়েছেন এই তাঁর শেষ লড়াই। দুনিয়াতে রামরাজ্য আনবার লড়াই।"

এই ভাবেই সারা দেশে নিরক্ষর অগণিত মানুষের কাছে আসন্ন লড়াইয়ের বার্তা পৌছে গিয়েছিল। কাগজে কি লিখছে না লিখছে, নেতারা কি বলছেন আর না বলছেন সে খবর তারা কখনও জানতে পারে নি, আর জানবেইবা কেমন করে? তারা তো নিরক্ষর বলন্টিয়রজীদের উপর তাদের ভরসা।

এরপরেই শুরু হয়ে গেল দেশব্যাপী বিক্ষোভ। স্বরাজ এসে গিয়েছে এই ধারণা ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে।

নৌকা মাঝি গান ধরল—

'রেল লাইন উঠিয়ে ফেললে
তো পা ভেঙে দিলে সরকারের।
তার কেটে দিলে
তো কান কেটে দিলে সরকারের
থানা জালিয়ে দিলে
তো চোখ গেলে দিলে সরকারের।'

এরপরে 'আজাদ দস্তা'র নাম হল 'ক্রান্তি দল' অর্থাৎ বিপ্লবীদের দল। একটা অঞ্চলে নয়, অনেক অঞ্চলেই এই রকম হয়েছিল।

১. ব্ল্যাক মার্কেট বা কালোবাজারী।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'ক্রান্তি দলে'র রামায়ণজীকে যে প্রথম রাজনীতির পাঠ নিতে হয়েছিল তার কথা রাজনীতিবিদরা একেবারেই চেপে গেছেন। কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ী বলতে পারেন নি।

"...বিসুন শুকলাকে এরা দলের পাণ্ডা করেছে কেন জানিস? এখন কাজের মধ্যে তো চাঁদা তোলা কেবল। বিসুন শুকলা মাস্টার সাহেবের চেলা কিনা তবু লোক ভাববে যে টাকাটা মহাত্মাজীর কাজেই লাগবে।

দেখলি না ঐ জন্যই তো দল থেকে নিয়ম করে দিয়েছে যে, ওকে বিসুন শুকলাও বলতে পার, জওয়হরও বলতে পার। ঐ পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে আর কাউকে আসল নাম করে ভাব তো! তা হলেই কালকে খাওয়া বন্ধ। পাঁচ জনের খাবার খাওয়া হল ভুখনা হার বাখেসোয়ার যাদবের বাড়ি শোবার জন্য। সে নাকি-বিশ্বাসী লোক। আরে বুঝি সব। খুব দুধ দই চালাচ্ছে সেখানে রোজ রাতে।...তোরাও মহাত্মাজীর কাজ করেছিস, আমরাও মহাত্মাজীর কাজ করেছি। তবু দুধ দইয়ের বেলায় শুধু তোরাই থাকবি কেন? নিজেরা গান্ধী জওয়াহর সব ভাল ভাল নাম নিয়ে নিল।

ওরে আমার ভাল নাম লেনে-ওয়ালারে! জেলের মধ্যে কত কাণ্ড দেখেছি এইসব মহাত্মাজীর চেলাদের..."

"এই আজাদ দস্তার নামে নেতারা চাঁদার টাকাও খাবে এই দশ ভূতে মিলে।"

—এসব কথা বলেছিল বিসুনিকে ওই যে মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দলের একটি বন্দুক নিয়ে পালিয়ে তারই জোরে টাকাকড়ি আদায় করেছিল। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লে প্রাণে না মেরে তার নাক কেটে নেওয়া হয়।

এমনি সব কাণ্ড ঘটেছিল অনেক জায়গায় তাই সংশয় ও সন্দেহের ছায়া নেমে এসেছিল ঢোঁড়াই-এর মত বহু সরল মানুষের মনে। প্রচণ্ড দমননীতি ও দলের মধ্যে গান্ধীজীর রাজনীতির দাবা খেলায় শেষ চাল ব্যর্থ হয়ে গেল।

সবচেয়ে বড় কথা হল তাঁর অহিংসার নীতি, প্রেম ও প্রীতির নীতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হৃদয়ের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটাতে পারল না। তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রাম ব্যর্থ হয়ে গেল। আর সাম্রাজ্যবাদীরা কেন, তাঁর নিজের বিশ্বস্ত অনুগামীদের অনেকেই তো তাঁর অহিংসা নীতিকে মেনে নিতে পারেন নি। গান্ধীজীর এক ভক্ত অকপটভাবেই লিখেছিল :

"গান্ধীজী যে রকমভাবে ভারতের মুক্তি চাহিয়াছিলেন সে রকমভাবে ভারতের মুক্তি কেহ চাহে নাই। গান্ধীজীর মত আর কেহ অহিংসায় পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিল না এবং অহিংসা অবলম্বনে ভারতের প্রতিরক্ষা পর্যন্ত যাওয়ার সাহস বা দৃঢ়তা তাহাদের ছিল না অথচ ইংরেজের নিকট হইতে স্বাধীনতা *আদায় করিয়া লইবার জন্য মনে প্রাণে অহিংসা অবলম্বন করিয়া গান্ধীজীর* অনুসরণ করিতে তাহাদের বাধে নাই। পুরোপুরি অহিংস বলিতে এক গান্ধীজীই ছিলেন।"

গান্ধীজীর অনুগামীরা 'মনে প্রাণে' অহিংসা নীতিকে কখনও মানেন নি, গান্ধীজী তা জানতেন এবং জানতেন বলেই অহিংসা নীতিকে অন্ততপক্ষে পলিসি বা কর্মনীতিরূপে গ্রহণ করার জন্য তিনি সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। বেশির ভাগ লোকই এই আবেদনে সাড়া দিয়েছিল। তবুও গান্ধীজী প্রতিপক্ষের মন গলাতে পারেন নি। তাঁর অহিংসা ও মানবপ্রীতির আদর্শ প্রতিপক্ষের হৃদয় স্পর্শ করে নি। এখানেই তাঁর চরম ব্যর্থতা, তাঁর জীবনের মর্মান্তিক ট্র্যাজিডি।

১৯৪২ সালে হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তিনি যখন "ভারত ছাড়" ধ্বনি তুললেন এবং আন্দোলন শুরু করার আগেই গ্রেপ্তার হওয়ার পর দেশজুড়ে যে অভ্যুত্থান ঘটল তার ফলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত ছাড়ল না, ভারতের স্বাধীনতার দাবি অগ্রাহ্য করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার শাসন ও শোষণ চালিয়ে গেল।

অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার পর দেশের মানুষের মনে এল চরম নৈরাশ্য, সর্বপ্রকার আন্দোলন গেল স্তব্ধ হয়ে। এর ফলে গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবনেও সূচনা হল আর এক ট্র্যাজিডি। এতদিন পরে তাঁর নেতৃত্বে আর আস্থা রাখতে পারল না দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ। জাতীয় বুর্জোয়ারা তখন ভাবতে শুরু করেছে নতুন নেতার কথা। তবু তখনই গান্ধীজীকে বাদ দিয়ে কিছু করার সম্ভাবনা ছিল না বলে তিনি নেতার পদেই অধিষ্ঠিত থাকলেন যদিও তাঁর নেতৃত্ব তখন অপস্রিয়মান।

পরিশিষ্ট

আগস্ট অভ্যুত্থানের সরকারী বিবরণে জানা যায় যে, ১৯৪২ সালের ৯ই *আগস্ট থেকে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ৬০,২২৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়,* ভারত রক্ষা আইনে আটক করা হয় ১৮ হাজার লোককে এবং পুলিস ও ফৌজের গুলিতে নিহত হন ৯৪০ জন, আর আহত হন ১৬৩০ জন।

বলা বাহুল্য এই হিসাব নির্ভুল নয়, প্রকৃতপক্ষে নিহতের সংখ্যাই ছিল দশ হাজারের বেশি। আর লড়াই চলেছিল ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত, কাজেই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়াই স্বাভাবিক।

(২)

ইয়োরোপে অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্র তাঁর মার এক তারবার্তায় জানতে পারেন যে, তাঁর পিতা মৃত্যুশয্যায়। ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে সুভাষচন্দ্র দেশে ফেরেন। কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করে স্বগৃহে অন্তরীণ করা হয়। আগেই পিতার মৃত্যু হয়েছিল। ছয় সপ্তাহ অন্তরীণ অবস্থায় থাকার পর সুভাষচন্দ্র আবার ইয়োরোপে ফিরে যান।

কলকাতায় থাকার সময় তিনি লক্ষ্য করেন যে, লোকে নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য নিয়ে আলোচনা করছে। তিনি লক্ষ্য করেন যে, বড়লাট উইলিংডনের দমন নীতি কংগ্রেসকে দুর্বল করতে পারে নি, জনগণ কংগ্রেসকেই সমর্থন জানিয়েছে। কংগ্রেসের নির্বাচন যুদ্ধ চালিয়েছে গান্ধীবাদী নেতারা এটাও তিনি জানতে পারেন।

ইয়োরোপে সুভাষচন্দ্র শুধু স্বাস্থ্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন নি, প্রায় সমগ্র ইয়োরোপ সফর করে ইয়োরোপের হালচাল বোঝার চেষ্টাও করেছিলেন। আর একটি মহাযুদ্ধ যে ঘনিয়ে আসছে এ বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না! আর তার সুযোগ ভারতবর্ষ কিভাবে গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়েও তিনি ভেবেছিলেন। কংগ্রেসকে সংগ্রামের পথে চালিত করার সিদ্ধান্তও তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার তার নতুন খেলার প্রস্তুতিপর্ব সম্পূর্ণ করেছিল। ভারতবর্ষের জন্য এক নতুন সংবিধান রচনা করে তা চালু করার জন্য সুপরিকল্পিত-ভাবে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার কাজ শুরু করা হয়েছিল।

১৯৩৫ সালে সুভাষচন্দ্রের পীড়া বৃদ্ধি পায়। তিনি ভিয়েনায় চিকিৎসাধীন থাকেন। দেশে ফেরার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু চিকিৎসকরা জানালেন অস্ত্রোপচার ছাড়া তাঁর রোগমুক্তি হবে না।

ভিয়েনায় পিত্তকোষে অস্ত্রোপচারের পর তিনি কিছুটা সুস্থ হয় উঠে দেশে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হন। লখনৌ কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার অভিপ্রায় তাঁর ছিল। এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ সরকার ভিয়েনাস্থিত ব্রিটিশ দূতের মারফত তাঁকে জানিয়ে দেন যে, দেশে ফিরলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে।

সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ সরকারের কাছে এক কড়া চিঠি লিখে জানিয়ে দেন যে, তিনি দেশে ফিরতে দৃঢ়সংকল্প। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে বোম্বাই বন্দরে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুণায় যারবেদা জেলে কিছুকাল আটক রাখার পর তাঁকে কার্শিয়াং-এ শরৎচন্দ্র বসুর বাড়িতে অন্তরীণ রাখা হয়।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার কিছুটা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিয়ে নতুন সংবিধান চালু করল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস নতুন সংবিধান মেনে নিয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হল।

১৯২৩-১৯২৪ সালে গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামীরা ছিলেন আইনসভায় প্রবেশের বিরোধী। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও তাঁর অনুগামীরা ছিলেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আইনসভায় প্রবেশের পক্ষপাতী। এবার ব্যাপারটা দাঁড়ালো একেবারে উল্টো রকমের। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামীরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কর্মপন্থা অনুসরণ করলেন।

অর্থাৎ আইনসভার ভিতরে ঢুকে আইনসভায় সরকারকে বিপর্যস্ত করে সরকারের শাসন সংস্কারের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেবেন।

১৯৩৬ সালের ফৈজপুর কংগ্রেসে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ও সংবিধান অগ্রাহ্য করে আইনসভার ভিতরে ও বাইরে আপসহীন সংগ্রাম চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল, তবে আইনসভাগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা

লাভ করলে মন্ত্রিসভা গঠন করতে কংগ্রেস রাজি হবে কি হবে না তা স্থির করার ভার দেওয়া হয়েছিল নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির উপর।

এ সময় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ বিরোধীরা রীতিমত আন্দোলন শুরু করে দেন। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির উদ্যোগেই আন্দোলন শুরু হয়। শরৎচন্দ্র বসু, সর্দার শার্দুল সিং কাউশের, রফি আমেদ কিদোয়াই প্রমুখ কংগ্রেস নেতারাও এই আন্দোলন সমর্থন করেন। গণ-সংগ্রামের মাধ্যমে গণ-পরিষদ বা রাষ্ট্রগঠন পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য ফৈজপুরে কমিউনিস্ট নেতা শ্রীডাঙ্গে, মানবেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতাদের সহযোগিতায় যে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন তা ৮৩-৪৫ ভোটে অগ্রাহ্য হয়; কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে এই সংশোধনী প্রস্তাবটি ৪৫১—৬২ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করার জন্য সুনির্দিষ্ট ঘোষণার প্রস্তাবও কংগ্রেস কমিটিতে ৮৭—৪৮ ভোটে প্রত্যাখ্যাত হয়।

কংগ্রেসের নির্বাচনে অংশগ্রহণের পথে আর কোন বাধা রইল না। সুভাষচন্দ্র তখনও বন্দী। কংগ্রেস সোশ্যালিস্টদের উপর তাঁর কোন আস্থা ছিল না। তাঁর মতে এই দলের অধিকাংশই ছিলেন বিক্ষুব্ধ গান্ধীপন্থী যাদের ধ্যানধারণা ছিল গান্ধীবাদী আর বাকিরা ছিলেন জওহরলালের ভাবাবেগের দ্বারা প্রভাবিত। কাজেই দৃঢ়ভাবে কোন আন্দোলন কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি চালাতে পারবে এমন ভরসা সুভাষচন্দ্রের ছিল না।

নির্বাচন শেষ হওয়ার পর ১৯৩৭ সালের ২৭ মার্চ সুভাষচন্দ্র মুক্তিলাভ করেন।

সুভাষচন্দ্র তখন অসুস্থ। দাদা শরৎচন্দ্র বসুর কার্শিয়াং-এর বাড়িতে তিনি অন্তরীণ ছিলেন। হঠাৎই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিছুকাল কলকাতায় ডাঃ নীলরতন সরকারের চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি স্বাস্থ্যলাভার্থে চলে যান ডালহৌসীতে। সেখানে তিনি ডাঃ ধরমবীরের বাড়ীতে থাকেন। কংগ্রেস রাজনীতি বিশেষ করে কলকাতা কর্পোরেশনের রাজনীতি সুভাষচন্দ্রের মনে গভীর অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। ১৯৩৭ সালের ৩১শে মে ডালহৌসী থেকে তিনি তাঁর সহপাঠী ও বন্ধু ভাগবত রায়কে যে চিঠি লেখেন তাতে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হয়।

ভাগবত রায় আর্থিক দুরবস্থায় পড়ে কলকাতা কর্পোরেশনে চাকরি পাওয়ার জন্য সুভাষচন্দ্রের সাহায্য চেয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র জবাবে লেখেন:

"কর্পোরেশন একটি Angean Stable-এর মত হইয়াছে—সেখানে স্বার্থের বাড়াবাড়ি স্বার্থের কাছে আদর্শবাদকে হার স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং সেখানে আমার প্রভাব কতদূর আছে সে বিষয়ে আমি বিশেষ সন্দিহান।" (সুভাষচন্দ্রের দুটি অপ্রকাশিত চিঠি, শেখর বসু, আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয় সংখ্যা, ২৮ মার্চ, ১৯৮২)।

কংগ্রেসের রাজনীতি তাঁর মনে বিরক্তি জাগিয়েছিল বেশ কিছুকাল আগেই। হিজলী বন্দীশালায় গুলিবর্ষণ ও সন্তোষ, তারকেশ্বরের নিহত হওয়ার ঘটনা, চট্টগ্রামে নিদারুণ পুলিসী নিপীড়ন ইত্যাদি সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্বিকার মনোভাবের প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্র বঃ প্রাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির (বি পি সি সি) সভাপতি এবং কলকাতা কর্পোরেশনের অলডারম্যান পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন। তারপর অনেক জল গড়িয়ে গেল। ১৯৩৭ সালে ৭টি প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা গঠন, ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেসের সভাপতিপদ লাভ ও সুভাষচন্দ্রের মতিগতি দেখে গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামীদের উদ্বেগ—এ সবের কাহিনী আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। সুভাষচন্দ্র কারুর হাতের পুতুল হয়ে কাজ করতে রাজি ছিলেন না, কাজেই তাঁর সঙ্গে গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামীদের তথা ধনিকশ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বাড়তে থাকে। ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ড থেকে জনৈক ভারতবন্ধু গান্ধীজীর কাছে কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে একটা আপস রফার প্রস্তাব পাঠান। গান্ধীজী কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রের কাছে প্রস্তাবটি পাঠিয়ে দেন। রহস্যজনকভাবে প্রস্তাব সমর্থিত পত্রটি কলকাতার একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে যায়। গান্ধীজী অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে সুভাষচন্দ্রের কৈফিয়ৎ তলব করেন। সুভাষচন্দ্র জানান যে, তাঁর টেবিলের ড্রয়ার থেকে চিঠিটি চুরি হয়েছিল। হয়ত গান্ধীজীর সন্দেহ হয়েছিল যে সুভাষচন্দ্রই ইচ্ছা করেই চিঠিটি অন্তর্হিত হতে দিয়েছিলেন, কারণ সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোন রকম আপস করতে রাজি ছিলেন না।

কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার খবর সুভাষচন্দ্র পেয়েছিলেন ইয়োরোপে থাকাকালে। তখন থেকেই তিনি কংগ্রেসকে একটি আপসহীন সংগ্রামের সংগঠনে রূপান্তরিত করতে পারবেন বলে আশা করেছিলেন। তিনি তদনুযায়ী তাঁর কর্মপন্থা স্থির করে ফেলেছিলেন। এর ফলে গান্ধীজী ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন এবং সুভাষচন্দ্র আবার নির্বাচনে প্রার্থী হলে তিনি তাঁর

বিরোধী প্রার্থীরূপে পট্টভি সীতারামাইয়াকে দাঁড় করান। এরপর যে সব ঘটনা ঘটে সে সবের কাহিনী আগেই বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে।

সভাপতি পদে ইস্তফা দিয়েও সুভাষচন্দ্র তাঁর আপসহীন সংগ্রামের দাবি অক্ষুণ্ণ রাখেন এবং কংগ্রেসের মধ্যেই ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন করে প্রচার চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু তিনি কোন নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করলেন না।

দেশে কংগ্রেসের মধ্যে যখন এই রকম টানাপোড়েন চলছে তখন জাপানের অবিরাম অগ্রগতি, এশিয়ায় দারুণ আতঙ্ক ও আলোড়নের সৃষ্টি করে। সিঙ্গাপুর ও মালয় দখল করে জাপ-বাহিনী বর্মায় ঢুকলে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী সরকার বাংলা হাতে রাখার আশা ছেড়ে দিয়ে বিহারে আত্মরক্ষার ঘাঁটি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

রুশ রণাঙ্গনে নাৎসীবাহিনী প্রচণ্ড প্রতিরোধ ও পাল্টা আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে তাদের সমস্ত শক্তি সংহত করে নতুন নতুন অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করে। এই অবস্থায় জাপানের উপর সুভাষচন্দ্রের ভরসা বাড়ে এবং তাঁর জাপানে যাওয়ার সুযোগও এসে যায়। অর্থাৎ তাঁর আন্দোলনকে গান্ধীজীর আন্দোলনের কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলেন। ফলে বামপন্থী মহলে অসন্তোষ দেখা দিল। সুভাষচন্দ্র বলেছেন 'দেশ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত' অথচ বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার কথা বলছেন না—এই ধরনের সমালোচনা শোনা যেত লাগল। তা সত্ত্বেও ফরওয়ার্ড ব্লকের আন্দোলন বহু লোককে আকৃষ্ট করল এবং বহু নেতা ও কর্মী কারাবরণ করলেন।

তখনও সুভাষচন্দ্র চেষ্টা করছেন গান্ধীজীকে দিয়ে ব্যাপক গণ-আন্দোলন শুরু করাতে। কিন্তু তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হল।

সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেস সভাপতি পদে বহাল রয়েছেন তখন ১৯৩৯ সালের ১০ই এপ্রিল তিনি গান্ধীজীকে লিখেছিলেন:

"যতই আমরা বৈধতার স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে ভেসে চলব, আর যতই আমাদের কর্মীরা সরকারী চাকরির মজার লোভে মশগুল হয়ে থাকবেন, দুর্নীতি ততই বেড়ে চলবে। স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে ত্যাগ, সংগ্রাম ও দুঃখ বরণের ডাকই এর একমাত্র প্রতিষেধক। এই ডাক দিলেই যাচাই হয়ে যাবে, কে সাচ্চা, কে ঝুঁটা।"

এর জবাবে ২৭শে মে-র 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধীজী লিখলেন: "আমি

মনে করি, আজ আর আমাদের ব্যাপকভাবে অহিংস সংগ্রাম চালাবার ক্ষমতা নেই। হিংসাবাদীদের ওপর আমাদের প্রভাব নেই। অ-কংগ্রেসীদের ওপরে কোন হাত নেই, এমন কি সকল কংগ্রেসীদের ওপরেও আমাদের হাত নেই··· আর দুর্নীতি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, যে রকম ব্যাপক দুর্নীতি চলছে, তা সহ্য করার চেয়ে আমার মতে, কংগ্রেসটাকে একেবারে কবর দেওয়াও ভাল।" (উদ্ধৃতি ও অনুবাদ—বিপ্লবের সন্ধানে, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩০)

সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেসকে দুর্নীতিমুক্ত করার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানাতে বলছেন তখন গান্ধীজী দুর্নীতগ্রস্ত কংগ্রেসকে জলাঞ্জলি দেওয়ার কথা ভাবছেন। এইভাবেই উভয়ের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে চলেছিল। তবু গান্ধীজীকে আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনার আশা ছাড়েন নি।

কংগ্রেসের সভাপতি পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েও সুভাষচন্দ্র তাঁর নিজস্ব সংগঠন ফরওয়ার্ড ব্লকের আন্দোলনের মাধ্যমে কংগ্রেসের উপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সুভাষচন্দ্র এই সিদ্ধান্তকে ফরওয়ার্ড ব্লকের আন্দোলনের ফল বলে অভিমত প্রকাশ করলেও খুশি হতে পারলেন না। কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির পদত্যাগের পর গণ-সত্যাগ্রহ শুরু হবে এই আশা সুভাষচন্দ্র করেছিলেন, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হল না।

দেশ যাতে আপসহীন সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয় তার জন্য সুভাষচন্দ্র প্রবল উদ্যমে সারা ভারতবর্ষে ছুটে বেড়িয়েছিলেন, বিশাল বিশাল জনসভায় ভাষণ দিয়েছিলেন, আশা করেছিলেন জনগণ তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবে। তাঁর দেশব্যাপী প্রচারের পূর্ণ পরিণতি ঘটল ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে রামগড়ে আপস বিরোধী সম্মেলনে।

এই রামগড়েই তখন কংগ্রেসেরও অধিবেশন শুরু হয়েছিল। ১৯৪০ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের রামগড় অধিবেশনের প্রকাশ্য অধিবেশনে গান্ধীজী ঘোষণা করেছিলেন: "আপনারা আমাকে যতই আন্দোলন করার জন্য চাপ দিতে থাকুন না কেন আমি যতক্ষণ না বুঝবো যে, আন্দোলন শুরু করার সময় হয়েছে ততক্ষণ আমি কিছুতেই আন্দোলন আরম্ভ করব না।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে একথাও বললেন যে, কেউ যদি আন্দোলন শুরু করার

সময় হয়েছে বলে মনে করেন তা' হলে তিনি আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। তিনি তাতে বাধা দেবেন না। ইঙ্গিতটা সুভাষচন্দ্রকে লক্ষ্য করে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুভাষচন্দ্রও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন এবং আন্দোলন আরম্ভও করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর আহ্বানে যেভাবে এতদিন লোকে সাড়া দিয়েছিল তাঁর আহ্বানে সেভাবে লোকে সাড়া দিল না। তবু বেশ কয়েক হাজার লোক কারাবরণ করলেন। সেদিন সুভাষচন্দ্রের পাশে ছিলেন কৃষক নেতা স্বামী সহজানন্দ। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে সুভাষচন্দ্রকেও কারারুদ্ধ করা হল।

এর আগে জুন মাসে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন। অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছিলেন।

ইয়োরোপে তখন ফ্রান্সের পতন ঘটেছে এবং ব্রিটেন প্রত্যক্ষভাবে বিপন্ন হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে গান্ধীজীকে তাঁর নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করার জন্য সুভাষচন্দ্র আকুল আবেদন জানালেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটতে চলেছে এই কথা বলেও সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে টলাতে পারলেন না। গান্ধীজী বললেন যে, কেহ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত নয় এবং সংগ্রাম শুরু করলে তার ফল আরও খারাপ হতে পারে। সুভাষচন্দ্র তাঁকে অনেক বুঝানোর পর গান্ধীজী বললেন যে সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টায় দেশ যদি স্বাধীনতা লাভ করে তা'হলে সুভাষচন্দ্র সর্বপ্রথম অভিনন্দন বার্তা পাবেন গান্ধীজীরই কাছ থেকে। সুভাষচন্দ্র হতাশ হলেন। যে কোন উপায়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জনই ছিল সুভাষচন্দ্রের ধ্যান-জ্ঞান। হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন নিয়ে তিনি মাথা ঘামান নি। রাজনীতিকে উচ্চ নৈতিক স্তরে উন্নীত করার কথাও তিনি ভাবেন নি। প্রচলিত বুর্জোয়া রাজনীতির পথ ধরেই তিনি চলেছিলেন। গান্ধীজী গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন বলেই সুভাষচন্দ্র তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতেও কুণ্ঠিত হন নি।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যে সুযোগ এনে দিয়েছিল গান্ধীজী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস-রফার জন্য তা' কেন হেলায় হারাচ্ছেন তা' তিনি বুঝতে পারেন নি। গান্ধীজী অহিংস গণ-আন্দোলন শুরু করে ব্রিটেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা দিলে ব্রিটেন নতিস্বীকার করতে বাধ্য হবে এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। অবশ্য যদি

অহিংস আন্দোলন সহিংস আন্দোলনে পরিণত হয় তাতে তাঁর কোন আপত্তি থাকার কারণ তিনি খুঁজে পান নি।

গান্ধীজীকে বুঝিয়ে এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের দ্বারা চাপ সৃষ্টি করে সুভাষচন্দ্র যা করতে পারবেন ভেবেছিলেন তা হল না। আসলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, কাজেই উভয়ের মধ্যে মিটমাট হওয়ার কোন আশাই ছিল না।

সুভাষচন্দ্র এটা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই সশস্ত্র সংগ্রামের পথে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী দলগুলির সঙ্গে তিনি যোগস্থাপনের চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু একমাত্র অনুশীলন দল ছাড়া আর কোন দল তাঁকে সমর্থন জানায় নি।

গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্র অন্যান্য দলের নেতাদের সঙ্গেও আলোচনা চালান। স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম লীগ যোগ দিলে স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হবেন জিন্না সাহেব এই প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু জিন্না সাহেব তখন পাকিস্তানের দাবিতে অটল। ব্রিটিশ সরকার তাকে তখন মদত দিচ্ছে। কাজেই স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের কোন কথা তিনি কানেই তুললেন না। হিন্দু মহাসভার নেতা বীর সাভারকারের সঙ্গেও সুভাষচন্দ্র আলোচনা করেন, কিন্তু সাভারকার তখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে হিন্দুরা দলে দলে যোগ দিয়ে কিভাবে শিক্ষালাভ করতে পারে এই ভাবনাই তখন তাঁকে পেয়ে বসেছে। সুভাষচন্দ্র বুঝলেন যে তাঁকে একাই অগ্রসর হতে হবে। এ সময় তিনি তিনটি বিষয়ে স্থিরনিশ্চিন্ত হন:

(১) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী, (২) চরম বিপদের সম্মুখীন হয়েও ব্রিটেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবে না এবং (৩) অতএব ভারতবর্ষকে লড়াই করেই স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। আর কোন পথ নেই।

সুভাষচন্দ্র সেই চিরাচরিত কূটনীতি অনুসরণ করাই শ্রেয় মনে করেছিলেন এবং তদনুযায়ী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে জার্মানী ব্রিটেনের শত্রু। অতএব ভারতবর্ষের মিত্র। ভারতবর্ষের কর্তব্য জার্মানীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্রিটেনকে পর্যুদস্ত করা, তবেই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে।

দেশের মধ্যে থেকে আর কিছু করা যাবে না। কারণ কংগ্রেস গান্ধীজীর

নেতৃত্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করতে কৃতসংকল্প—এই উপলব্ধিও তাঁর হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র যে কোন উপায়েই হোক মুক্তিলাভ করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন।

আইনের সাহায্যে কিছু করা যাবে না বুঝে সুভাষচন্দ্র সরকারকে এক চরমপত্র দিলেন। তিনি জানালেন যে, আইনত বা নৈতিক দিক থেকে তাঁকে বন্দী রাখার কোন হেতু নেই কাজেই মুক্তি না দিলে তিনি আমৃত্যু অনশন করবেন।

প্রথম দিকে সরকার তাঁর চরমপত্র আমলেই আনে নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকারের টনক নড়ল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুভাষচন্দ্রের দাদা শরৎচন্দ্র বসুকে অনুরোধ করলেন সুভাষচন্দ্রকে বুঝিয়ে অনশন থেকে নিবৃত্ত করার জন্য। রাত্রিকালে জেলে শরৎচন্দ্র ভ্রাতার সঙ্গে দেখা করলেন এবং মন্ত্রীর বক্তব্য জানিয়ে বললেন যে, সরকারের মনোভাব খুবই কঠোর। দাদার কাছ থেকে সব জানবার পর সুভাষচন্দ্র তারপর দিনই অনশন শুরু করলেন।

যুদ্ধ চলছে, ব্রিটেন বিপন্ন, এই অবস্থায় সুভাষচন্দ্রের মত জনপ্রিয় নেতার কিছু হলে সারা দেশে প্রবল উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে এই ভেবে কর্তৃপক্ষ এক গোপন বৈঠকে সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তবে স্থির হল যে, মাসখানেক পরেই তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হবে।

সুভাষচন্দ্রকে স্বগৃহে অন্তরীণ করা হল। সরকারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ৪০ দিন পরে ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে সুভাষচন্দ্র অন্তর্হিত হলেন।

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের খবর সারা দেশে আলোড়ন তুলল। কংগ্রেস নেতারা সরকারের ব্যর্থতায় খুশি হলেন, আবার কিছুটা উদ্বেগও বোধ করলেন। যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতারাও যেমন বুঝতে পারছিলেন না, সুভাষচন্দ্রও তেমনি বুঝতে পারেন নি।

সুভাষচন্দ্র যখন জার্মানীতে পদার্পণ করলেন তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন নাৎসী জার্মানী প্রায় সমগ্র ইয়োরোপের বিপুল সম্পদের অধিপতি হয়ে তার আসল শত্রু সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার পর সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। ব্রিটেনের জনগণ চেম্বারলেনকে অপসারিত করে প্রধানমন্ত্রীর পদে

বসিয়েছে উইনস্টন চার্চিলকে। চার্চিল তাঁর এক আবেগদীপ্ত ভাষণে জার্মানীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার অনমনীয় সংকল্প ঘোষণা করে ১৯৪১ সালের ১৩ই মে বলেছিলেন, "রক্ত, শ্রম, অশ্রু ও ঘর্ম ছাড়া আমার আর কিছুই দেওয়ার নেই।...আপনারা জিজ্ঞাসা করছেন আমাদের কর্মনীতি কি? আমি বলব আমাদের কর্মনীতি হল আমাদের সমস্ত পরাক্রম নিয়ে এবং ভগবান আমাদের যতটা শক্তি দিতে পারেন সেই সমস্ত শক্তি নিয়ে জল, স্থল ও আকাশে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া।"

চার্চিল চরম কমিউনিস্ট বিদ্বেষী হয়েও সাচ্চা দেশপ্রেমিকরূপে দেশকে রক্ষার জন্য ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধনে দ্বিধা করেন নি। চার্চিল নাৎসী জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করবে এই খবর পেয়ে ১৯৪১ সালের ১৫ই জুন মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টকে এক বার্তায় জানালেন যে জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলে ব্রিটেন সর্বতোভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সাহায্য করবে। জবাবে রুজভেল্ট জানান যে চার্চিল রুশিয়াকে মিত্র বলে ঘোষণা করলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা সমর্থন করবেন।

নাৎসী বিরোধী ত্রি-শক্তি (পরে চতুঃশক্তি) জোট গঠনের সূচনা এইভাবেই হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্রের মূল সিদ্ধান্তই এই নতুন পরিস্থিতিতে বরবাদ হয়ে গিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে বসে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি যখন শুরু করেছেন তখনই রুশ রণাঙ্গনে যুদ্ধের মোড় ঘুরতে আরম্ভ করেছে।

২১শে জুনের পর তিনসপ্তাহব্যাপী অবিরাম অগ্রগতি নাৎসী কর্তৃপক্ষকে চূড়ান্ত জয়লাভ সম্পর্কে সুনিশ্চিত করে তুলেছিল। ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'অপারেশন টাইফুন" বা তুফান অভিযানের পরিকল্পনা রচিত হল। অভিযান শুরু হল সোভিয়েতের উপর চরম আঘাত হানার উদ্দেশ্যে ৩০শে সেপ্টেম্বর। ২রা অক্টোবর হিটলার সদম্ভে ঘোষণা করলেন: "আজ বছরের শেষ বিরাট ও চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হচ্ছে।"

লক্ষ্য মস্কো। লালফৌজ ও মস্কোর অধিবাসীদের সম্মিলিত প্রতিরোধ নাৎসী অভিযানকে স্তব্ধ করে দিল। ৭ই নভেম্বর মস্কোর লালচকে যথারীতি সামরিক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হল। তারপরেই শুরু হল লালফৌজের পাল্টা আক্রমণ।

নাৎসী জার্মানীর দ্বিতীয় অভিযান ডিসেম্বর মাসে চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মোড় ঘুরতে শুরু করল।

এসব খবর কি পেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র, বোধহয় না। কারণ এসব খবর গোয়েব্‌লস্‌-এর প্রচার দপ্তর চেপেই রেখেছিল। জার্মানীর ভারত অভিযানের পরিকল্পনাও বোধহয় সুভাষচন্দ্রকে জানানো হয়নি। জার্মানীতে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের ককেশাসের যুদ্ধে যোগদানের যে মতলব নাৎসী কর্তৃপক্ষ করেছিলেন তা বানচাল হয়ে যায় ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের দৃঢ়তায়। তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, রুশিয়া তাঁদের শত্রু নয়, কাজেই রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ তাঁরা করবেন না। এরজন্য বেশ কয়েকজন যুদ্ধবন্দীকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। সুভাষচন্দ্র বাধা দিতে পারেন নি, কারণ তিনি তখন অসহায়, সম্পূর্ণরূপে নাৎসী কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভরশীল।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, নাৎসী জার্মানীর সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ সুভাষচন্দ্রকে বিমূঢ় করে দিয়েছিল। তিনি ব্রিটেনের পতন কামনা করেছিলেন, কিন্তু হিটলার তখন ব্রিটেনকে মিত্ররূপে পাওয়ার চেষ্টা করছেন।

স্বল্পকালের মধ্যেই সুভাষচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে, জার্মানীতে থেকে তিনি কিছু করতে পারবেন না।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু হয়েছিল তার বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া কোন মহলেই দেখা গেল না। উৎসাহ উদ্দীপনাও ছিল না। ১৯৪১ সালে দূরপ্রাচ্যে জাপানের আগ্রাসী মনোভাব আতঙ্ক ও উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল। ৭ই ডিসেম্বর জাপান-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পার্ল হারবার আক্রমণ করার পর শঙ্কিত ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের সঙ্গে একটা মিটমাট করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল এবং অকস্মাৎ কারারুদ্ধ সমস্ত কংগ্রেস নেতাকে মুক্তি দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতাদের ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল।

সুভাষচন্দ্র লক্ষ্য করলেন যে গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামীরা একটা আপসের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন। আলাপ-আলোচনা শুরু হল, মার্শাল চিয়াং কাই শেক, ভারতে এসে কংগ্রেস নেতাদের যুদ্ধে সহযোগিতা করার জন্য আবেদন জানালেন। ব্রিটেন থেকে এলেন ঝানু কূটনীতিবিদ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস।

ফল কিছু হল না। ক্রিপস শূন্য হাতে ফিরে গেলেন। কংগ্রেস তার দাবি আদায় করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছে জেনে সুভাষচন্দ্র খুশি হলেন।

১৯৪২ সালের ১লা মে ত্রিপক্ষ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করল তার মূল খসড়া রচনা করেছিলেন গান্ধীজী। তাতে জাপানের সঙ্গে ভারতের কোন শত্রুতা নেই। জাপান বা অন্য কোন শক্তি ভারত আক্রমণ করলে স্বাধীন ভারত তার মোকাবিলা করতে পারবে। মূল প্রস্তাবে এও বলা হয় যে ব্রিটেন ভারত রক্ষা করতে অক্ষম। জাপান তো ব্রিটেনের বিরুদ্ধে লড়ছে, ভারতের সঙ্গে তার কোন বিবাদ নেই, কাজেই স্বাধীন ভারত জাপানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পারে।

সুভাষচন্দ্রের মূল প্রস্তাবটি খুব পছন্দ হয়েছিল, কারণ তখন তিনি জাপানের সাহায্যে দেশ স্বাধীন করতে পারবেন বলে আশা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত জওহরলালের তীব্র বিরোধিতার ফলে মূল প্রস্তাবটি সংশোধিত হয় এবং জাপানের কোন উল্লেখ প্রস্তাবে থাকে না। সংশোধিত প্রস্তাবটিই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সুভাষচন্দ্র জওহরলালের উপর খুব রুষ্ট হন।

এ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগ গ্রহণ করেন ভারতের প্রথম যুগের খ্যাতনামা বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বিপ্লব-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর রাসবিহারী বসু জাপান চলে যান এবং সেখানে এক জাপ মহিলাকে বিবাহ করে জাপ নাগরিকরূপে বসবাস করতে থাকেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আবার একটা সুযোগ এসেছে মনে করে তিনি থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককে প্রবাসী ভারতীয়দের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। ১৯৪২ সালের ১৫ই জুন সিল-ভারকর্ণ থিয়েটারে এক বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে এই সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রকে ইয়োরোপ ছেড়ে এশিয়ায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে এবং তাঁকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করার অনুরোধ করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সুভাষচন্দ্র আমন্ত্রণ পেয়ে খুব খুশি হন। কারণ নাৎসী জার্মানীর মতিগতি তাঁকে সংশয়াপন্ন করে তুলেছিল। ১৯৪২ সালের মে মাসে হিটলারের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ খুব সুখপ্রদ হয় নি। হিটলারকে তিনি 'বদ্ধপাগল' সাব্যস্ত করেছিলেন। জাপানের হাতে হাজার হাজার ভারতীয় যুদ্ধবন্দীকে নিয়ে একটা শক্তিশালী বাহিনী গঠন করা সম্ভব হবে এটাও তিনি বুঝেছিলেন। এরকম

সুযোগ জার্মানীতে ছিল না। এবার তিনি প্রত্যক্ষভাবে দেশ স্বাধীন করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারবেন এই আশায় সুভাষচন্দ্র উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। তখনও তিনি আশা করছেন যে অক্ষশক্তির জয় হবে এবং জার্মানী, ইতালি, ও জাপানের সাহায্যে তিনি সাফল্য অর্জন করতে পারবেন। তবে তিনি পরিষ্কারভাবেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, "ভারতের মুক্তি সাধন মুখ্যত ভারতীয়দেরই কাজ হবে।"

(But the emancipation of India must be the work of Indian themselves)।

মহাযুদ্ধের প্রকৃতি ও গতি যে তখন একেবারেই বদলে গেছে এই সত্য সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করতে পারলেন না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রচণ্ডতম লড়াই চলছে তখন রুশ রণাঙ্গনে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসী ও সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্ত আশা ও ধারণা চূর্ণ করে দিয়ে ক্রমেই আর শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

১৯৪২ সালের মে মাসে রণাঙ্গনে প্রেরিত সোভিয়েত সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫১ লক্ষ, ট্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৩,৯০০ এবং যুদ্ধ বিমানের সংখ্যা ছিল ২,২০০। এ ছাড়া কামান ও মর্টারের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৪,৯০০। সোভিয়েত ও জার্মানীর শক্তি প্রায় সমান সমান দাঁড়ায়।

১৯৪২ সালের ৯ই আগস্টের 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করার পরেই সরকার নির্মম দমননীতি অনুসরণ করার ফলে ভারতবর্ষে যে ব্যাপক গণ-বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল সুভাষচন্দ্র তার থেকে সুযোগ গ্রহণ করতে পারলেন না। দীর্ঘ সমুদ্র পথ ডুবোজাহাজে পাড়ি দিয়ে তিনি সিঙ্গাপুরে পৌছুলেন ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে অর্থাৎ আমন্ত্রণ লাভের ঠিক এক বছর পরে। এই বিলম্ব না ঘটলে তাঁকে হয়ত বর্মার নেতা জেনারেল আউং সানের ভূমিকা গ্রহণ করতে হত।

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদাদের তৎপরতা প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। দুটি বড় দলই কংগ্রেস রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। ১৯৩৫ সাল থেকে নতুন শাসন-বিধি নিয়ে সকলেই মেতে আছে। এই অবস্থা লক্ষ্য করে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার "বিপ্লবের সন্ধানে" বইতে লিখেছেন: "কিছুকাল আগে অনেকেই মনে করত, ইংরেজ আর একটা যুদ্ধে জড়ালে আমরা 'দেখে নেব', কিন্তু ক্যাম্প-জেল-

অন্তরীণের অভিজ্ঞতা বলে, বিপ্লবীদের সংগঠন প্রকৃতপক্ষে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, বারো রাজপুত্রের তেরো হাঁড়ি, কি করতে পারবে তারা ?"

এ সময়েও বাংলার শত শত রাজবন্দী ছাড়া পান নি। তবে কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করার পর রাজবন্দীরা ছাড়া পেলেন। মোট সংখ্যা ছিল বোধ হয় ১১শ'। সরকার রাজবন্দীরা যাতে কাজকর্ম খুঁজে নেওয়ার সময় পান তার জন্য ৬ মাসের জন্য মাসিক ভাতা মঞ্জুর করেছিল।

শরৎচন্দ্র বসুর বাড়িতে মুক্ত রাজবন্দীদের সংবর্ধনা জানানো হয়, ভালো রকম জলযোগের ব্যবস্থাও ছিল। এরপর বহু রাজবন্দী রুজি-রোজগারের চেষ্টায় শরৎ বসুর কাছে আনাগোনা করতে লাগলেন। অন্যরা নিজ নিজ পথ দেখলেন।

বাংলার রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয় তৎকালীন দুর্ধর্ষ লাট সাহেব স্যার এ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে হিজলি জেলে 'যুগান্তরে'র নেতা সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (মধুদা) এবং 'অনুশীলনে'র নেতা প্রতুল গাঙ্গুলীর আলাপ-আলোচনার পর। এর পরেই দেখা যায় যে "যুগান্তর" দল আনুষ্ঠানিকভাবেই কংগ্রেসের মধ্যে লীন হয়ে যায়।

১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাসে 'যুগান্তর' দলের মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েকজন কর্মী 'সাপ্তাহিক ফরওয়ার্ড' পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেপ্টেম্বর মাসে ঐ পত্রিকায় ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এক বিবৃতি প্রকাশ করে যুগান্তর দল তুলে দেওয়া হল বলে ঘোষণা করেন।

এটা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা মাত্র, প্রকৃত পক্ষে 'যুগান্তর' দল অনেক আগেই সম্পূর্ণভাবে গান্ধীজীর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে সন্ত্রাসবাদের পথ ত্যাগ করেছিল।

সুভাষচন্দ্র ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার সময় ডাঃ যদুগোপালের নির্দেশে বাংলার কংগ্রেসের যুগান্তর দলের সদস্যরা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে ভোট দিলেও সুভাষচন্দ্রকে তারা আর নেতারূপে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। তার প্রমাণ পাওয়া গেল সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতিপদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হওয়ার পর। সুভাষচন্দ্র বাংলার কংগ্রেসের নেতার পদ ছাড়তে অস্বীকার করলে কংগ্রেসের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ভেঙে দিয়ে একটি 'এ্যাড হক' কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করা হয় 'যুগান্তর' দলের অন্যতম শীর্ষস্থানীয়

নেতা সুরেন্দ্রমোহন ঘোষকে। 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের চিরবিচ্ছেদ ঘটে যায়।

'যুগান্তর' দল কংগ্রেসের কর্মপন্থা পুরোপুরি সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে গণ-আন্দোলনের কথাও বলতে থাকে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের গণ-আন্দোলনের আহ্বানে তারা সাড়া দিলেন না। গান্ধীজীর দিকেই তারা চেয়ে রইলেন।

১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লেখেন যে, আর একটা বিশ্বযুদ্ধ এসে পড়েছে। এবার জার্মানী-জাপান-ইরানী —এককাট্টা হবে। রুশিয়াকে তারা নিরপেক্ষ রাখবে এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্স আক্রান্ত হবে। "ভারতের এবার সমূহ বিপদ। ভারতকে নিজ স্বার্থরক্ষায় সজাগ হতে হবে। আমাদের কর্তব্য ইংরেজের হাত থেকে ক্ষমতা দখল করা।" (বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, পৃঃ ৫০৪) কি অবস্থায়, কিভাবে ক্ষমতা দখল করতে হবে তার একটা পরিকল্পনাও ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ছকে রেখেছিলেন।

বাংলায় যখন প্রায় সমস্ত বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীকে পুলিস জেলে পুরেছে এবং সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে চলে গেছেন তখন অবশিষ্ট স্বল্পসংখ্যক নেতা ও কর্মীর কাছে ডাঃ যদুগোপাল তাঁর পরিকল্পনা পেশ করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভূপতি মজুমদার, কমলা দাশগুপ্তা (পরে মুখার্জী), বীণা দাস (পরে ভৌমিক) জ্যোতিষ ভৌমিক প্রমুখ।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে ডাঃ যদুগোপাল কলকাতায় এসেছিলেন। তখন জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ব্রিটেন হটে যাবে ধরে নিয়েই ডাঃ যদুগোপাল তার পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক হয় যে, 'নাগরিক রক্ষা সমিতি' গঠন করতে হবে এবং যথেষ্ট সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করতে হবে। মওলানা আবুল কালাম আজাদ তখন কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে অনুরোধ করা হল যে, 'নাগরিক রক্ষা সমিতি' যাতে সর্বভারতীয় সংস্থা রূপে গড়ে ওঠে তার জন্য কংগ্রেস যেন সাহায্য করে।

এদিকে জাপান দ্রুত এগিয়ে আসতে থাকে এবং ব্রিটিশ সরকার তখন বাংলাকে খরচের খাতায় লিখে দিয়ে 'পোড়া মাটি' নীতি অনুসরণ করতে শুরু করে। অন্নাভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা পড়ে, সারা দেশে চোরাকারবারী ও

মুনাফাখোরেরা জাঁকিয়ে বসে। সামরিক কর্তৃপক্ষ সবকিছু ধ্বংস করে দিয়ে পিছু হটার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

"এই শয়তানী চক্রান্তের ফলে দেশ যাতে রসাতলে না যায়, সেইজন্য ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশ আসে সংগঠন গড়ে তোলার যাতে সুশৃঙ্খলায় ও সজ্ঞানে জাপানীদের সঙ্গে আলোচনা করে অধিকার বদল (Transference of Control) করবার সম্ভাবনা জেগে ওঠে। দিনের পর দিন দারুণ দুর্ভাবনার ভিতর B. P. C. C.-র কর্তৃপক্ষকে কাজ করতে হয়। দেশে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গিয়েছিল এবং দেশের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সকল স্তরের লোক এগিয়ে এসেছিল।" (বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি : ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৫১, ১ম সংস্করণ)[১]

পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, গান্ধীজীর চিন্তাধারা অনুসরণ করেই জাপানের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করার কথা ভাবা হয়েছিল। গান্ধীজী এ সময় মনে করতেন যে জাপানের সঙ্গে ভারতের কোন শত্রুতা নেই, কাজেই ভারতের স্বাধীনতার পথে তারা কোন বাধার সৃষ্টি করবে না। তিনি তাঁর একটি প্রস্তাবের খসড়ায় একথা বলেও ছিলেন। এই নিয়েই জওহরলালের সঙ্গে তাঁর মতভেদ হয় এবং শেষ পর্যন্ত মওলানা আজাদের অনুরোধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি জওহরলালের সংশোধনী গ্রহণ করে।

ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশে বাংলায় কংগ্রেস ও কংগ্রেসের বাইরের লোক নিয়ে বঙ্গীয় অ-সামরিক রক্ষা কমিটি (Bengal Civil Protection Committee) গঠিত হয়। সম্পাদক হন ভূপতি মজুমদার, সভাপতি হন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। দেখা যাচ্ছে যে, নতুন সংস্থাটি পুরোপুরিভাবেই 'যুগান্তর' দল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

ভারত সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ তীব্র দৃষ্টি রেখেছিল ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের উপর। সংকট ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের খাতায় যাদের নাম ছিল সেইসব সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের ধর পাকড়ের হিড়িক পড়ে গেল। ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়কেও গ্রেপ্তার করা হয়। কাজেই ১৯৪২ সালের 'আগস্ট বিপ্লব' যখন এল, তখন 'যুগান্তরে'র নেতা ও কর্মীদের কিছুই করার ছিল না।

১। উদ্ধৃত অংশটি পরবর্তী সংস্করণে বাদ দেওয়া হয়েছে।

এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করা উচিত। 'যুগান্তর' দল কংগ্রেসে লীন হলেও গান্ধীজীর অহিংসার নীতিকে কোন সময়েই মেনে নিতে পারে নি, কাজেই 'আগস্ট বিপ্লবে' গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও অহিংসা নীতিকে ক্ষুন্ন করা হয়েছে বলে যে-সব গান্ধীবাদী নেতা অভিযোগ করেছিলেন তাদের উল্লেখ করে ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : "যাই হোক, জেলের গান্ধীপন্থী বন্ধুদের বলি 'আপনারা ভুল বুঝছেন।' এই আন্দোলন খুব ফলদায়ক হবে। ইংরেজ এই জাতীয় আন্দোলন বোঝে।" (বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, পৃঃ ৫০৬)

ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তার "বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি"তে সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগ সম্পর্কে মাত্র কয়েকটি লাইন লিখেছেন। সুভাষচন্দ্র প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাঘাযতীনের নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবীদলের বিদেশী শক্তির সাহায্যে দেশ স্বাধীন করার কর্মসূচী 'হুবহু অনুসরণ' করেছেন—এই ছিল তার বক্তব্য। পরে সুভাষচন্দ্রকে তিনি 'নেতাজী' বলেছেন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের ভূমিকাও এক লাইনে উল্লেখ করেছেন মাত্র।

দেখা যায় যে, সুভাষচন্দ্রকে বাদ দিয়েই 'যুগান্তর' দলের নেতারা তাদের পরিকল্পনা রচনা করেছেন এবং ধরেই নিয়েছেন যে, আসলে জাপানই আসবে। অতএব হয় তার আপস-আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করতে হবে, আর না হয় জাপানকে বাধা দিতে হবে। অবশ্য বাধা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা তারা রচনা করেন নি। বিদেশী শক্তি তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবে এমন কথা তারা ভাবতেই পারেন না—এমন কথাও ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

মোটের উপর বুঝতে পারা যায় যে, 'যুগান্তর' দল কংগ্রেসের তথা গান্ধীজীর নেতৃত্বের উপর পূর্ণ আস্থা রেখেছিল। বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে 'যুগান্তর' দলই সর্বপ্রথম বুঝতে পারে যে, কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কিছুই করা যাবে না। কংগ্রেসই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে পারে এ বিষয়েও 'যুগান্তর' দল নিশ্চিত ছিল। এখন 'অনুশীলন' দলের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন আসন্ন তখন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে বিরোধ চরমে ওঠে। সুভাষচন্দ্র সংগ্রামের আহ্বান জানানোর দাবি করায় কংগ্রেস নেতারা সে দাবি অগ্রাহ্য করেন।

'অনুশীলন' দল বরাবরই সশস্ত্র বিপ্লবের পক্ষপাতী ছিল। এতদিনে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে 'অনুশীলন' দলের ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপনের সুযোগ এল।

রামগড়ে আপস-বিরোধী সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য 'অনুশীলন' দল সর্বতোভাবে চেষ্টা করে।

মহারাজ (ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী) সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে প্রচার-অভিযানে বেরিয়ে উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী ও পাঞ্জাব সফর করেন এবং পুরাতন বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য বিপ্লবীদের সংগঠিত করে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রচার চালানো ও ভারতীয় সৈন্যদের সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করা। এ সময় সুভাষচন্দ্র বারবার সংগ্রামের কথা বললেও, সংগ্রামের কর্মসূচী সম্পর্কে কোন কথা বলছিলেন না। এর ফলে তাঁকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত বাবা রুর সিং-এর সঙ্গে দেখা করে মহারাজ তাঁকে ১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে বলেন, "সুভাষবাবুর সহিত আমাদের স্থির হইয়াছে, এখন সশস্ত্র বিপ্লবের ব্যবস্থা করিতে হইবে, এখন সুভাষবাবুই আমাদের নেতা। আপনার এখন শিখ সৈন্যদের আমাদের দলভুক্ত করিতে হইবে।" (জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃঃ ২০৩, ৫ম সং)

এককালের অনুশীলন দলের সদস্য এবং তখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের অন্যতম শ্রীকেশব হেডগেয়ারের সঙ্গেও মহারাজ আলোচনা করেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের "৬০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক আছে" বলে জানালেও কেশব হেডগেয়ার বিপ্লবে যোগদানের ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখান নি।

মহারাজ তাঁর সফর সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের কাছে রিপোর্ট পেশ করেন। পুলিস মহারাজের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল এবং মনে হয় তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে সব খবরই পেয়েছিল। কাজেই চট্টগ্রামে এক প্রকাশ্য সভায় যোগ দিতে গিয়ে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী গ্রেপ্তার হলেন। এরপর সুভাষচন্দ্র এবং 'অনুশীলন' দলের বহু নেতা ও কর্মী ধরা পড়লেন।

সুভাষচন্দ্র আগে থেকেই ব্রিটিশ-বিরোধী বিদেশী শক্তিগুলির সঙ্গে যোগ-স্থাপনের চেষ্টা করছিলেন। তাঁর সমর্থক ব্যাঙ্কার শঙ্করলাল ব্যবসায়ের অজুহাতে জাপানে যান। সুভাষচন্দ্রের নির্দেশেই তিনি জাপানে গিয়েছিলেন।

ফিরে এসে তিনি জানান যে, সুভাষচন্দ্রকে বিদেশে যেতে হবে। সুভাষচন্দ্র তখন জেলে। জেলে অনশন ধর্মঘট শুরু হওয়ার পর বিচলিত সরকার শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র ও 'অনুশীলন' দলের নেতা প্রতুল গাঙ্গুলীকে মুক্তি দেয়।

এ সময় প্রতুল গাঙ্গুলীর যে ধারণা হয়েছিল তা' তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হননি। তিনি লিখেছেন রাজবন্দীরা ব্যর্থতা বোধে পীড়িত হয়ে নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেন নি।

সশস্ত্র বিপ্লবের কোন সম্ভাবনা নেই। বিশ বছর অনুশীলন' কোন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত হয় নি। সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণ করেছে কিন্তু কোন সংগঠন গড়ে তোলে নি।

গণশক্তি জাগ্রত না হলে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ অব্যাহত থাকবে, নতুন নেতৃত্ব চাই। (বিপ্লবীর জীবন দর্শন—প্রতুল গাঙ্গুলী, পৃঃ ৩৬৫-৩৭৬)

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে রামগড়েই 'অনুশীলন' দলের নেতা ও কর্মীরা সমবেত হয়ে নতুন দল—বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল গঠন করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে 'অনুশীলন' দল ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করে। প্রতুলচন্দ্র লিখেছেন, "অনুশীলন আজ বদলে গেছে। এ যে হতে পেরেছে তার জন্যে আমরা গর্ববোধ করি, আজ আনন্দের সঙ্গে নতুন নেতৃত্বকে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে অনুশীলনের আজ অবসান হয়েছে।" (বিপ্লবীর জীবন দর্শন, পৃঃ ৩৬৪)

জাপানের অভিযান অনুশীলন দলের অন্যতম নেতা প্রতুল গাঙ্গুলীকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। জাপানীরা ভারতে প্রবেশ করলে কী ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে তা ভেবে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন।

জাপানের ভরসায় যারা ছিল তাদের উদ্দেশ্যে তিনি লেখেন:

"আজ যারা জাপানের স্বাগত জানাবে ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তারা ধিক্কৃত হবে।" (বিপ্লবীর জীবন দর্শন, পৃঃ ৩৭৮)

দেখা যাচ্ছে যে, 'যুগান্তর', 'অনুশীলন' প্রভৃতি কোন বিপ্লবী দলই জাপানকে মুক্তিদাতা দেশরূপে স্বাগত জানাতে চায়নি। তবে গান্ধীজীর মত অনুসরণ করে 'যুগান্তর' দল জাপান ভারতের শত্রু নয়, কাজেই জাপান এসে পড়লে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতা হাতে নেওয়ার কথা ভেবেছিল, কিন্তু 'অনুশীলন' দল তা ভাবে নি। আবার নিজেদের বিপ্লবী 'সমাজতন্ত্রী' বলে পরিচয় দিলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত হিটলার-

বিরোধী জোটকে তারা আমলে আনেন নি। তাই ভারতে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়ার ব্যাপারে তারা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একমত ছিলেন বলেই মনে হয়।

১৯৪২ সালের 'আগস্ট বিপ্লব'-এ অনুশীলন দল সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এতে যে জাপানের সুবিধা হতে পারে একথা তারা কোন সময়েই ভেবে দেখেন নি। এক্ষেত্রে 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন' সম-মনোভাবাপন্ন ছিল বলেই মনে হয়। তবে 'আগস্ট বিপ্লবে' উভয় দলই সমর্থন জানালেও 'এক যাত্রায় ভিন্ন দল' হয়েছিল—'যুগান্তর' দল তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আরও কিছুকাল ভিতরে-ভিতরে বজায় রাখলেও কংগ্রেসের মধ্যেই লীন হয়ে গিয়েছিল কিন্তু 'অনুশীলন' দল বিপ্লবী সমাজতন্ত্রবাদী রূপে তার পুরাতন ঐতিহ্য অনুসরণ করে কংগ্রেস-বিরোধী দলেই পরিণত হয়।

গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র ও বাঙলার বিপ্লবীরা

(শেষ পর্ব)

[১৯৪২-১৯৪৮]

১৯৪২ সালে গান্ধীজীর চিন্তাধারার বিরাট পরিবর্তন অনেকেই লক্ষ্য করেছিলেন। এই পরিবর্তন সম্পর্কে আলোকপাত করে গেছেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর "ইণ্ডিয়া উইন্স ফ্রীডম" গ্রন্থের ৪১ পৃষ্ঠায়। তিনি যা বলেছেন তার সারার্থ হল :

গান্ধীজী পরিষ্কার ভাবে কিছু না বললেও তাঁর সঙ্গে আলোচনা কালে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, মিত্রপক্ষ জয়ী হবে এমন আশা আর তিনি করছেন না। আমি এটাও লক্ষ্য করলাম যে সুভাষ বোসের জার্মানীতে পালিয়ে যাওয়ার খবর তাঁর উপর গভীর ছাপ ফেলেছে। আগে সুভাষবাবুর অনেক কাজই তিনি অনুমোদন করেন নি, কিন্তু এখন দেখলাম তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁর অনেক মন্তব্য থেকে আমার প্রত্যয় হয়েছিল যে, গান্ধীজী, সুভাষ বসু পলায়নের ব্যাপারে যে সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। সুভাষ বসুর সম্পর্কে তাঁর এই শ্রদ্ধা "সমগ্র যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর মনোভাবকে তাঁর অজ্ঞাতসারে প্রভাবিত করেছিল।"

ক্রিপস দৌত্যের সময় গান্ধীজীর এই মনোভাব আলোচনাকে আচ্ছন্ন করে। এই সময় সুভাষবাবুর মৃত্যুর খবর রটে যায় এবং গান্ধীজী খুব বিচলিত হন। তিনি সুভাষবাবুর মার কাছে সুভাষচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে এক শোকবার্তা পাঠান। পরে জানা যায় যে, মৃত্যুর খবর ভুল। যাই হোক, ক্রিপস আমাকে বলেন যে, গান্ধীজীর মত মানুষের কাছ থেকে সুভাষচন্দ্রের এই রকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তিনি আশা করেন নি। গান্ধীজী অহিংসার পূজারী আর আজ সুভাষচন্দ্র প্রকাশ্যে ফ্যাসিস্ত শক্তিবর্গের পথ অবলম্বন করে মিত্রপক্ষের পরাজয়ের জন্য প্রচার চালাচ্ছেন।

মওলনা আজাদের বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪২ সালে গান্ধীজী যে, সুভাষচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এখন তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের হৃদয় পরিবর্তনের ব্যর্থ চেষ্টা করে শেষপর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের পক্ষই অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ডাক দেওয়ার পর জনসাধারণকে অহিংসা নীতি অনুসরণ করতে বলা বৃথা হবে এ কথা তাঁর নিশ্চয়ই জানা ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি ক্ষান্ত হন নি। যাই হোক কারারুদ্ধ হওয়ার পর গান্ধীজী ও ভারত সরকারের মধ্যে 'আগস্ট বিপ্লবে'র জন্য কে দায়ী তা নিয়ে বেশ কিছুকাল ধরে পত্র যুদ্ধ চলল। গান্ধীজী তাঁর ও কংগ্রেসের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করলেন। অন্যদিকে ভারত সরকার তাঁর বিভিন্ন রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন যে, গান্ধীজী ও কংগ্রেসই সমস্ত গোলযোগের জন্য দায়ী।

১৯৪৩ সালের ১৯শে জানুয়ারি গান্ধীজী বড়লাট লিনলিথগোর পত্রের জবাবে জানালেন যে, কংগ্রেসের পথ থেকে যদি কোন প্রস্তাব উত্থাপন করতে হয় তা হলে তাঁকে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে মিলিত হতে দিতে হবে। জবাবে বড়লাট জানালেন যে বিষয়টি তিনি আলোচনা করতে পারেন যদি গান্ধীজী "ভারত ছাড়" প্রস্তাব বাতিল করেন অথবা প্রস্তাবের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই একথা জানান।

বিক্ষুব্ধ গান্ধীজী বড়লাটের এই মনোভাবের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

১৯৪৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে গান্ধীজী তিন সপ্তাহের জন্য অনশন শুরু করলেন। সরকার তাঁকে সাময়িক মুক্তি দানের যে প্রস্তাব করেন গান্ধীজী তা প্রত্যাখ্যান করেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে গান্ধীজীর অবস্থা সংকটজনক হয়ে দাঁড়ায়। সরকারের মনোভাবের প্রতিবাদে নলিনীরঞ্জন সরকার, এইচ পি মোদী ও এম এম আনে বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যপদে ইস্তফা দেন।

শেষপর্যন্ত গান্ধীজী সামলে ওঠেন এবং ৩রা মার্চ অনশন ভঙ্গ করেন।

গান্ধীজীর অনশন সরকারের মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারল না। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মতে গান্ধীজী প্রায় মরতে বসেছিলেন। ভারত সরকার এ কথার উপর কোন গুরুত্ব দিল না।

গান্ধীজীর সঙ্গে রাজা গোপালাচারিকে দেখা করতে দেওয়া হল না। জনাব জিন্নার কাছে গান্ধীজী যে চিঠি লিখলেন তাও পাঠাতে দেওয়া হল না। এমন কি স্যার স্যামুয়েলের কাছে গান্ধীজী যে চিঠি লিখেছিলেন তাও পাঠাতে দেওয়া হল না।

এর পরেও গান্ধীজী ও ভারত সরকারের মধ্যে পত্রালাপ চলল।

গান্ধীজীর স্ত্রী কস্তুরবা গান্ধী এ সময় কঠিন রোগে মরণাপন্না, কিন্তু তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল না এবং ১৯৪৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ইতিমধ্যে নতুন বড়লাট লর্ড ওয়েভেল তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারি তিনি তাঁর প্রথম বক্তৃতায় ঘোষণা করলেন যে, ব্রিটেনের লক্ষ্য হল ভারতবর্ষকে পরিপূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনসম্পন্ন একটি ঐক্যবদ্ধ দেশ রূপে গণ্য করা। ক্রিপস প্রস্তাব বহাল রয়েছে।

বোঝা গেল যে, উভয় পক্ষই একটা আপস-রফা করতে চাইছে।

১৯৪৪ সালের ৬ই মে গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়া হল স্বাস্থ্যভঙ্গের অজুহাতে। ম্যালেরিয়া গান্ধীজীর স্বাস্থ্য ভেঙে দিয়েছে এমন অজুহাত যে গ্রহণযোগ্য নয় একথা বুঝতে কারো কষ্ট হয়নি। অনশনের ফলে গান্ধীজীর জীবন যখন সত্যই বিপন্ন হয়েছিল তখন সরকার বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন বা বিচলিত হয়নি। এখন বিচলিত হওয়ার কারণ ছিল। যুদ্ধের পরিস্থিতি সমগ্রভাবে মিত্রপক্ষের অনুকূল হয়ে উঠলেও ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ বেশ বিপদের মধ্যেই পড়েছিল। জাপানের সামরিক শক্তি তখনও বিপুল। জাপানের সাহায্য খুব বেশি পরিমাণে না পেলেও আজাদ হিন্দ ফৌজ তখন ভারতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বের জনমত সাম্রাজ্যবাদীদের কর্মনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ফলে ব্রিটেনে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এইসব কারণেই ভারত সরকার একটা আপসের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল।

অন্যদিকে গান্ধীজী বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করে আপস আলোচনা শুরু করা উচিত বলে মনে করেছিলেন।

গান্ধীজীর মনোভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল মুক্তিলাভের একমাস পরে লণ্ডনের "নিউ ক্রনিকল" পত্রিকার সংবাদদাতা স্টুয়ার্ট গেলডারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার কালে তাঁর বক্তব্য গান্ধীজী পরিষ্কারভাবেই জানালেন, ১৯৪২ আর

১৯৪৪ সাল এক নয়, কাজেই আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি একথাও জানালেন যে, অ-সামরিক প্রশাসনে জাতীয় সরকার পূর্ণ কর্তৃত্ব পেলেও তিনি খুশি হবেন। "ভারত ছাড়" প্রস্তাব প্রত্যাহার করার ইঙ্গিতও তিনি দিলেন।

স্টুয়ার্ট গেলডারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর অনুগামীদের মধ্যে ঝড় উঠেছিল। তিনি সংগ্রামের পথ পরিহার করে নরমপন্থীদের চাপে পড়ে আপস করতে যাচ্ছেন বলে অনুগামীরা অভিযোগ করেছিলেন।

১৯৪৪ সালের ১৪ই জুলাই সাংবাদিকদের কাছে গান্ধীজী এক বিবৃতি দিয়ে এই অভিযোগের জবাব দেন। তিনি বলেন "আমার অ-সহযোগিতা অন্যায়ের সঙ্গে, অ-সহযোগিতা অন্যায়কারীর সঙ্গে নয়।" তিনি বলেন যে, তিনি চেয়েছেন ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা হাতে রাখার শর্তে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করে নেবে। কাজেই এখন তিনি যে প্রস্তাব করেছেন তার সঙ্গে আগস্ট-প্রস্তাবের কোন বিরোধিতা নেই। যুদ্ধ পরিস্থিতি অনুকূল হওয়ার সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবের কোন সম্পর্ক নেই, কারণ যুদ্ধ পরিস্থিতি অনুকূল হলে তাঁর প্রস্তাব বরং প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। "কিন্তু শুধু ভারতবর্ষের নয়, শান্তি প্রেমিক সমগ্র মানবজাতির শান্তিকামী রূপে আমার পক্ষে একটা উপযুক্ত প্রস্তাব আমি না করে পারি না।

আর যাই হোক, কর্তৃপক্ষের অভিমত ছাড়াও বিশ্ব জনমত বলে একটা জিনিস আছে।"

গান্ধীজী আরও বলেন যে, ১৯৪২ সালের সঙ্গে এখনকার একটা পার্থক্য আছে। সেটা হল এই যে, তিনি তখন জানতেন না যে, কংগ্রেসী এবং কংগ্রেস-বিরোধী জনগণ কি ধরনের সাড়া দেবে। "এখন আমি জানি জনগণ কি ধরনের সাড়া দিয়েছিল। যারা এই সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল তাদের বীরত্ব, দুঃখকষ্ট ভোগ ও আত্মত্যাগ প্রশংসাতীত। কিন্তু সত্য ও অহিংসার তুলাদণ্ডে বিচার করলে গণ-বিক্ষোভগুলির মধ্যে জলন্ত গলদগুলি ধরা পড়ে..."

তবু গান্ধীজী গণ-বিক্ষোভকে ধিক্কার দিতে পারেন নি। সরকার যে নিদারুণ অত্যাচার চালিয়েছিল গণ-বিক্ষোভের অজুহাতে তার উল্লেখ করে গান্ধীজী বলেন যে, সত্য ও অহিংসার তুলাদণ্ডে জনগণের বিচার করতে হলে সরকারের

কার্যকলাপকে একই তুলাদণ্ডে বিচার করতে হবে। "এটা হল একটা পার্থক্য"। আর ১৯৪২ সালের সঙ্গে ১৯৪৪ সালের দ্বিতীয় পার্থক্য হল জনগণের নিদারুণ অনশন ক্লিষ্টতা। তাই এখন তিনি সকল অবস্থার অবসান ঘটানোর চেষ্টা না করলে তিনি নিজে যে মতবাদ প্রচার করেন তার অযোগ্য বলে প্রমাণিত হবেন। তাঁর প্রস্তাব যদি গৃহীত হয় তাহলে কংগ্রেসকে যদি তা তিনি গ্রহণ করতে না বলেন তাহলে তিনি দারুণ অপরাধী বলে গণ্য হবেন।

জনসাধারণের কাছে গান্ধীজী আপস প্রচেষ্টার জবাবদিহি এইভাবেই করলেন।

১৯৪৪ সালের ১৭ই জুন গান্ধীজী নতুন বড়লাট লর্ড ওয়েভেলের কাছে পত্র লিখে জানালেন যে, পরিবর্তিত অবস্থায় তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে অগাস্ট প্রস্তাবানুযায়ী আন্দোলন না করার উপদেশ দিতে প্রস্তাব আনছেন যদি এখনই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কাছে দায়ী একটি জাতীয় সরকার গঠন করা হয়। অবশ্য যুদ্ধ চলাকালে বর্তমানে সামরিক কার্যকলাপ যে ভাবে চলছে সেই ভাবেই চলতে থাকবে তবে ভারতবর্ষের উপর এর জন্য কোন আর্থিক দায় ভার চাপানো চলবে না।

১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত গান্ধীজীর কার্যকলাপ ও বক্তব্য অনুধাবন করলে বুঝতে পারা যায় যে, ১৯৪২ সালে স্থিতধী গান্ধীজী তাঁর ধৈর্য হারিয়ে ছিলেন। বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর আচরণ তাঁকে নিরতিশয় ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তাঁর সত্য ও অহিংসার বাণীগুলি সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্রের লৌহ কঠিন প্রাকারে বৃথাই শুধু মাথা খুঁড়ে মরল। এই প্রথম মরিয়া হয়ে তিনি শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হলেন। হিংসা-অহিংসা, শান্তি-অশান্তির চুলচেরা তর্কের মধ্যে তিনি আর যেতে চাইলেন না।

১৯৪২ সালের ২৪শে মের "হরিজন" পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন।

"ভারতবর্ষকে ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দাও। আর তা যদি বড় বেশি কিছু বলে মনে হয় তা হলে তাকে নৈরাজ্যের হাতে ছেড়ে দাও।"

"নৈরাজ্যের ফলে সাময়িক ভাবে অভ্যন্তরীণ লড়াই হতে পারে অথবা সবাই ডাকাতি করতে পারে।" সরকার যে রকম সুনিয়ন্ত্রিত নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে তার অবসান ঘটা উচিত এই মন্তব্য করে গান্ধীজী বললেন:

"ফলে যদি ভারতবর্ষে পরিপূর্ণ অরাজকতা দেখা দেয় আমি তার ঝুঁকি

নেব।" গান্ধীজী যে এই সময় সুভাষচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁর উল্লিখিত বক্তব্যগুলিই তার প্রমাণ।

ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে যদি অরাজকতা দেখা দেয় তার ফল যে কী ভয়াবহ হতে পারে তা গান্ধীজী নিশ্চয়ই জানতেন, কিন্তু সে ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করেন নি, কারণ তিনি তখন তাঁর দীর্ঘকালের ব্যর্থতার ফলে উত্তেজিত, সংযমের বাঁধ তখন তাঁর ভেঙে গেছে।

তাই গান্ধীজী যা কখনও করেন নি তাই করলেন আগস্ট বিপ্লবের পর। তিনি জনগণকে অভিনন্দিত করলেন তাদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের জন্য। আগে দেশের কোন কোন অঞ্চলে জনগণ অহিংসার পথ থেকে বিচ্যুত হলে তিনি জনগণকে ধিক্কার দিয়েছেন, তাদের প্রকৃত সত্যাগ্রহী করে তুলতে পারেন নি বলে অনশন করে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। চৌরি-চৌরা থেকে সোলাপুর পর্যন্ত নানা ঘটনায় শহীদদের প্রতি তিনি কোন সহানুভূতি দেখান নি।

জনগণ হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছেন যে, আন্দোলনের ডাক দিয়ে তিনি "হিমালয়তুল্য ভুল" করেছেন। এখন তিনি বললেন যে, সরকারের "হিমালয়তুল্য হিংসার জন্যই জনগণ হিংসার পথে চালিত হয়েছে।"

গান্ধীজীকে এক নতুন মূর্তিতে দেশ দেখল ফলে যারা যে কোন উপায়ে সরকারকে উৎখাত করতে চাইছিলেন তারা উৎসাহিত হলেন। গান্ধীজী তাদের সংযত করতে বিলম্ব করলেন না।

যে সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আত্মগোপন করেছিলেন তাদের মধ্যে অচ্যুত পটবর্ধন, অন্নদা চৌধুরী, অরুণা আসফ আলি প্রমুখ গ্রেপ্তারের ঝুঁকি নিয়েই গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলেন।

গান্ধীজী তাদের স্পষ্টভাষায় বললেন যে, সর্বপ্রকার গোপনীয়তা পাপ। তিনি বললেন, "যতদূর পর্যন্ত আন্দোলনের মধ্যে গোপনীয়তা দেখা দিয়েছে ততদূর পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একজন দুজনের কথা আমাদের ভাবলে চলবে না, আমাদের ভাবতে হবে ৪০ কোটি মানুষের কথা। আজ তারা নির্জীব বোধ করছে। গোপন পন্থাসমূহ অবলম্বন করে আমরা তাদের চাঙ্গা করে তুলতে পারব না।

কেবলমাত্র সত্য ও অহিংসাকে আঁকড়ে রেখেই আমরা তাদের জ্যোতিহীন চোখে জ্যোতি ফিরিয়ে আনতে পারব।"

গান্ধীজী আবার তাঁর পূর্ব মূর্তিকে ফিরে পেলেন। ব্যাপক নাশকতা, দেশের ক্ষতির বিপুল পরিমাণ তাঁর কাছে চাঞ্চল্যকর ঠেকেছিল। এসব ব্যাপার হিংসা বলে গণ্য করা যায় না বলে যারা যুক্তি দেখিয়েছিলেন তাদের যুক্তি তিনি মানতে পারেন নি।

গান্ধীজী পরিষ্কারভাবেই জানিয়েছিলেন যে, সরকার যদি তাঁকে ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের আগস্ট প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার না করতেন তা হলে তাদের নেতৃত্বে জনগণ সঠিক পথে অগ্রসর হতে পারত।

বুঝতে কষ্ট হয় না যে, গান্ধীজী নতুন পরিস্থিতিতে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন, জনগণের চরম দুর্দশায় বিচলিত হয়ে তিনি অচল অবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

আগস্ট বিপ্লবের পর তাঁর পক্ষে আর কোন সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হবে না, এটাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জনগণের বিরাট অংশের আস্থা তিনি হারিয়েছেন যদিও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা তাদের অক্ষুন্ন আছে। যে জাতীয় বুর্জোয়া তাঁকে সামনে রেখে সংগ্রাম চালাচ্ছিল সেই জাতীয় বুর্জোয়াও আর তাঁর উপর আস্থা রাখতে পারছিল না। সম্ভবত শেঠজীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা কালে গান্ধীজী তাও বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তাঁর চিরাচরিত আপস-রফার পক্ষই অনুসরণ করলেন। এবার তিনি এ ব্যাপারে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। নতুন বড়লাট ওয়েভেল সাহেব কারারুদ্ধ-কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দেওয়ার জন্য গান্ধীজী যে অনুরোধ জানান তা ২৯শে জুন অগ্রাহ্য করেন। এর পরেই গান্ধীজী স্টুয়ার্ট গেলডারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকালে বিস্তারিতভাবে তাঁর পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করে আপস-রফার পথ প্রশস্ত করার চেষ্টা করলেন। এর পরই তিনি সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন।

১৯৪৪ সালের ১৭ই জুলাই গান্ধীজী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের কাছে এক চিঠি লিখলেন। চিঠিতে চার্চিল তাঁকে "উলঙ্গ ফকির" বলে অভিহিত করাকে অনিচ্ছাপ্রসূত প্রশস্তি বলে গণ্য করে তিনি ব্রিটিশ ও ভারতীয় জনগণের জন্য কাজে লাগানোর এবং এর মাধ্যমে বিশ্বের জনগণের জন্য কাজে লাগানোর জন্য আবেদন জানালেন। কিন্তু চিঠি চার্চিলের কাছে পৌঁছুল না। সম্ভবত ভারত সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ চিঠিটি আটকে দিয়েছিল। যাই হোক

দুই মাস পরে গান্ধীজী আবার ঐ চিঠি পাঠালেন চার্চিলের কাছে। এবার ভারত সরকারের মারফৎ ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করা হল। এখানেই শেষ। উচ্চতর সাম্রাজ্যবাদী চার্চিল গান্ধীজীকে কোন জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

গান্ধীজী যখন আপস-রফার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন তখন ইয়োরোপে নাৎসী জার্মানীর পরাজয় আসন্ন হয়ে উঠেছে, সোভিয়েতবাহিনীর দ্রুত অগ্রগতি এবং জনগণের চাপের ফলে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জয় যখন আসন্ন তখন চার্চিলের মত সাম্রাজ্যবাদীর কাছে গান্ধীজীর প্রচেষ্টাকে আমল দেওয়ার কোন প্রশ্ন ছিল না। ফলে অচল অবস্থা অবসানের কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

১৮ই আগস্ট সরকার গান্ধী-ওয়েভেল পত্রাবলী প্রকাশ করলেন। গান্ধীজী এক সাক্ষাৎকারে বললেন যে, সরকারের চূড়ান্ত জবাব প্রমাণ করছে যে, জনসমর্থন লাভের কোন ইচ্ছা ব্রিটিশ সরকারের নেই।

এই অবস্থায় গান্ধীজী আবার জিন্না সাহেবের সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে উদ্যোগী হলেন। ১৮ দিন ধরে আলোচনা চলার পর ২৭শে সেপ্টেম্বর আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। জিন্না সাহেব তখন রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছেন। দুটি কারণে: (১) ব্রিটিশ সরকার তার নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম লীগকে ভারতবর্ষের মুসলমানদের একত্রে সংগঠন রূপে মেনে নিয়েছে; (২) আগস্ট প্রস্তাব ও তার পরবর্তী ঘটনাবলীর মধ্যে মুসলমানদের বিরাট অংশকে লীগের সমর্থক করতে পারার সাফল্য।

তখন আর মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলিকে স্বতন্ত্র রাজ্য রূপে গণ্য করার কথা জিন্না সাহেব ভাবছেন না, তিনি স্বাধীন ও সার্বভৌম পাকিস্তান বা মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কথা ভাবছেন।

১৯৪৪ সাল শেষ হল দুটি ব্যর্থতার মধ্যে।

এল ১৯৪৫ সাল। তখন ইয়োরোপে নাৎসী বাহিনীর পরাজয় আসন্ন। ভারতবর্ষে বড়লাট ওয়েভেল নতুন করে কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন।

গান্ধীজীর অনুমোদনক্রমে ভুলাভাই দেশাই কেন্দ্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

গঠন সম্পর্কে লিয়াকৎ আলি খাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন।

গান্ধীজী কংগ্রেস-লীগ কোয়ালিশন গঠনের প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেন।

এদিকে ১২ই মার্চ উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশে লীগ মন্ত্রিসভার পতন ঘটল এবং ড. খান সাহেবের নেতৃত্বে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হল। গান্ধীজী কংগ্রেস মন্ত্রিসভাকে তাঁর আশীর্বাদ জানালেন। ফলে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি পেল। ৩১শে মার্চ জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষে গান্ধীজী তাঁর এক বিবৃতিতে বললেন যে, ভারতবর্ষ আজ তার সত্যের যত কাছে এসে পৌঁছিয়েছে তত কাছে আর কখনও সে পৌঁছুতে পারে নি। একই দিনে জিন্না সাহেব ও লিয়াকৎ আলি খাঁ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, ভুলাভাই দেশাই এর সঙ্গে তাদের কোন চুক্তি হয়নি।

গান্ধীজী মুসলিম লীগের সঙ্গে হাত মেলানোর জন্য যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তা আবার ব্যাহত হল।

মওলানা আজাদ, চাগলা প্রমুখ জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতারা গান্ধীজীর আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। গান্ধীজীই লীগকে লাই দিয়ে মাথায় তুলেছেন এই অভিযোগ তাঁরা করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী তাঁদের আমলে আনেন নি। গান্ধীজীর এই স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করার মত। উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ায় তিনি খুশি অথচ জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের আমলে না এনে মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করতেও তিনি দ্বিধা বোধ করছেন না। তাঁর এই স্ববিরোধী মনোভাব পরবর্তীকালে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল।

৫ই মে ইয়োরোপে যুদ্ধের অবসান ঘটল। ২৩শে মে ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে চার্চিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করলেন। নির্বাচনের দিন স্থির হল ৫ই জুলাই।

ইতিমধ্যে ওয়েভেল পরিকল্পনা নিয়ে সব দলের নেতারাই চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন। গান্ধীজী তাঁর চিরাচরিত রাজনীতিতে ফিরে গিয়ে দ্রুত একটা আপস-রফার জন্য প্রস্তুত হলেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল তা গান্ধীজী লক্ষ্য করলেন না যদিও এর আগে তিনি "বিশ্বজনমতের" উল্লেখ করেছিলেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট-এর

মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি তাঁর স্ত্রীকে এক শোকবার্তায় জানালেন যে, কর্মরত অবস্থায় রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের মৃত্যুতে তিনি অভিনন্দন জানাচ্ছেন আর এই সঙ্গে গান্ধীজী একথাও বললেন যে, রুজভেল্ট মরে গিয়ে এমন একটা শান্তির অবমাননার দৃশ্য থেকে রেহাই পেয়েছেন যে শান্তি হবে আরও ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধের পূর্বাভাষ।

আবার "কলিন্‌স উইকলি"র প্রতিনিধি র‍্যালফ কলিন স্টনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি একথাও বললেন যে, "যুদ্ধাপরাধী তো শুধু অক্ষ শক্তিবর্গের মধ্যে নেই।" হিটলার ও মুসোলিনীর চাইতে রুজভেল্ট ও চার্চিলও কম যুদ্ধাপরাধী নন।

সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে বিশ্ব-সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও গান্ধীজী করলেন।

আসন্ন শান্তি সম্মেলন সম্পর্কে তাঁর বিরূপ ধারণা ব্যক্ত করেও গান্ধীজী সানফ্রানসিসকোতে স্বাধীনভাবে নির্বাচিত একজন ভারতীয় প্রতিনিধিকে পাঠানোর দাবি জানাতেও ভুললেন না। এইভাবে গান্ধীজী যুগপৎ নিজের সত্য ও অহিংসার আদর্শকে প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া নেতা সুলভ রাজনীতিও অনুসরণ করতে লাগলেন।

চার্চিল সরকার তখনও ক্ষমতাসীন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কট্টর অংশ এক নতুন চাল চালার জন্য তখন প্রস্তুত হয়েছে।

১৪ই জুলাই গান্ধীজী বড়লাটের এক বেতার ভাষণ সম্পর্কে বিবৃতি দিলেন। বড়লাট ওয়েভেল বলেছিলেন যে তিনি ভারতীয় নেতাদের কাছে নতুন প্রস্তাব পেশ করার ক্ষমতা পেয়েছেন।

গান্ধীজী জানালেন কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি না দিলে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কিছু বলা সম্ভব হবে না। এর পরই কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দেওয়া হয়।

২১শে জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল তিন বছর পরে। গান্ধীজীর উপস্থিতিতে কংগ্রেস নেতারা সিমলা বৈঠকে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

২৫শে জুন বড়লাট ওয়েভেল-এর সভাপতিত্বে সিমলা বৈঠক শুরু হল। গান্ধীজী এই বৈঠকে যোগ দিলেন না। পার্টি প্রতিনিধিদের মনোনীত করলেন বড়লাট। বড়লাট ও কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আজাদ তাঁদের বক্তব্য বলার

পর ১৫ দিন ধরে আলোচনার পরও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে কোন্ কোন্ দলের কোন্ কোন্ প্রতিনিধি থাকবেন তা স্থির করা গেল না।

সিমলা বৈঠক যে ব্যর্থ হবে তা একরকম অবধারিতই ছিল।

কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটার পর সাম্রাজ্যবাদীরা যথারীতি তাদের পুরাতন খেলা শুরু করেছিল।

যে মাসে গান্ধীজীর অনুমোদনক্রমে লিয়াকৎ-দেশাই চুক্তিতে বলা হয়েছিল যে অন্তর্বর্তী সরকারে কংগ্রেস ৪০, লীগ ৪০ এবং অন্যান্য দল ২০ শতাংশ প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে। এই ধরনের সমঝতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে বিপজ্জনক মনে হয়েছিল। কাজেই ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য বড়লাট ওয়েভেল লণ্ডনে চলে গেলেন এবং ফিরে এলেন এক নতুন সূত্র নিয়ে। এই সূত্রানুসারে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের স্থান "বর্ণহিন্দু-মুসলমানদের" মধ্যে আসন ভাগাভাগির ব্যবস্থা ছিল। এটা কোন পক্ষই মানতে পারল না এবং নতুনসূত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে কংগ্রেস-লীগ বিরোধ আবার নতুন করে দেখা দিল। ফলে সিমলা বৈঠকে কংগ্রেস-লীগ যুক্তফ্রণ্ট রূপে তাদের মূল পরিকল্পনা পেশ করতে পারল না এবং নেতারা পরস্পরের উপর দোষারোপ করতে লাগলেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সারা দুনিয়ায় প্রচার করে দিল যে, তারা তো ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে চান, কিন্তু ভারতীয়দের অনৈক্যই তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের বোকা বানিয়ে বড়লাট ওয়েভেল সিমলা বৈঠকের ব্যর্থতা সুনিশ্চিত করলেন।

৩রা জুলাই গান্ধীজীর উপস্থিতিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সব দলের মোট ১৫ জনের নাম পাঠিয়ে দিল বড়লাটের কাছে। এছাড়া মুসলিম লীগ বাদে অন্যান্য সব দলই তাদের মনোনীত ব্যক্তিদের নামের তালিকা পাঠাল।

বড়লাট ওয়েভেল এ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারে সঙ্গে পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে ৯ই আগস্ট লণ্ডন রওনা হলেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজীর উপস্থিতিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

১৯শে সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ সরকার এক বিবৃতিতে জানাল যে, তারা

ভারতবর্ষে (১) দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভাগুলি আবার যাতে প্রদেশে প্রদেশে শাসনভার গ্রহণ করে তার সুব্যবস্থা করবে ; (২) একটি সংবিধান প্রণয়ন সংস্থা গঠন করবে এবং (৩) বড়লাটের শাসন পরিষদ নতুন করে গঠন করবে।

এর পরেই দেখা গেল গান্ধীজী ১লা ডিসেম্বর বাংলা সফরে বেরিয়ে কলকাতায় লাট কেসীর সঙ্গে দেখা করলেন। উভয়ের মধ্যে কি আলোচনা হল তা কেউই জানতে পারল না। শুধু এইটুকু জানা গেল যে কেসী গান্ধীজীকে বলেছেন যে স্বাধীনতা এসে গেল বলে। এরপর দীর্ঘ সাক্ষাৎকার ও আলোচনা চলল দফায় দফায়। পরে জওহরলাল ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতারাও লাট কেসরী সঙ্গে দেখা করলেন।

৭ই ডিসেম্বর কলকাতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে যোগ দেওয়ার পর ১০ই ডিসেম্বর বড়লাট ওয়েভেলের সঙ্গে গান্ধীজী আলাপ-আলোচনা করলেন। এর ব্যবস্থা করেছিলেন কেসী সাহেব।

বাংলার লাট কেসী সাহেবকে বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এটা বেশ বোঝা যায় এবং একটা কিছু ঘটতে চলেছে এটাও বুঝতে কারুর কষ্ট হয়নি।

তাড়াতাড়ি একটা কিছু করে ফেলার জন্য গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের ব্যগ্রতার পিছনে অনেক কিছু কারণ ছিল।

প্রথমত, কংগ্রেস গণ-প্রতিষ্ঠান হলেও প্রধানত ধনপতি ঘনশ্যাম দাস বিড়লার নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর মুখপাত্র রূপে কাজ করছিল। গান্ধীজীও তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখেই কাজ করতেন। ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছিল যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটেন একেবারেই কাহিল হয়ে পড়েছে, কাজেই এই সময় চাপ দিলেই সহজেই কার্যসিদ্ধি হবে। তাছাড়া ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর দাপট আর নেই। ভারতবর্ষই এখন পাওনাদার দেশ, ভারতীয় ধনপতিরা ব্রিটিশ মালিকানায় পরিচালিত বড় বড় শিল্পসংস্থা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি অনায়াসেই কুক্ষিগত করতে পারবে। এই অবস্থার প্রতিফলন দেখা দিয়েছে ব্রিটেনে রক্ষণশীলদের পরাজয়ে এবং লেবার পার্টির সরকার গঠনে। কাজেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের সুবর্ণ সুযোগ এসে গেছে।

দ্বিতীয়ত, এতদিন পরে আপসে যখন ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে

ঠিক তখনই ভারতবর্ষ জুড়ে গণ-অভ্যুত্থান শুরু হয়ে গেছে। ১৯৪৫ সালে কলকাতায় অবিস্মরণীয় ছাত্র বিক্ষোভ এবং অন্যান্য অঞ্চলে বিভিন্ন আকারে গণ-বিক্ষোভ ধনিকশ্রেণী তথা কংগ্রেস নেতাদের উদ্বিগ্ন ও বিচলিত করে তোলে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস তাড়াতাড়ি সরকারের সঙ্গে একটা মীমাংসা করে ফেলুন ভারতীয় ধনিকশ্রেণী এই দাবি জানাতে থাকেন। তারা বিপ্লব চান না একথা তারা পরিষ্কারভাবেই জানিয়ে দেন।

এই সম্পর্কে ভারতীয় ধনিকশ্রেণী সম্বন্ধে একটি সরকারী রিপোর্ট বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। ভারত সরকারের কাছে পেশ করা এক গোপন গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয় "রুশ দেশের বৃহৎ ব্যবসায়ীরা (অর্থাৎ পুঁজিপতিরা) যেমন মেনশেভিকদের পক্ষে ছিল ভারতের বুর্জোয়ারাও তেমনি কংগ্রেসের পক্ষে গিয়ে ভিড়েছে।"

১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই রিপোর্ট পেশ করা হয়। যুদ্ধের মোড় যখন ঘুরে গেছে ঠিক তখনই রিপোর্ট পেশ করার অর্থ ভারত সরকারকে ভারতীয় ধনিকশ্রেণী তথা কংগ্রেস সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করা এবং সত্যই ভারত সরকার নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

সমগ্র দেশে যখন বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠেছে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় লড়াই চলছে তখন গান্ধীজী খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন এবং ওয়েভেল সাহেব তাঁকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিতে ভোলেন নি।

শুধু তাই নয় এটাও জানা গেছে যে, বাংলার লাট কেসীর সঙ্গে আলোচনাকালে কংগ্রেসের সঙ্গে বর্তমান গণ-বিক্ষোভের কোন সম্পর্ক নেই এই কথা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা গণ-আন্দোলন থেকে কংগ্রেসকে দূরে রাখার পরিকল্পনাও করে ফেলেন। এসে গেল ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক স্মরণীয় বৎসর —১৯৪৬ সাল। কলকাতার গণ-বিক্ষোভ থেকে নৌ-বিদ্রোহ—কলকাতা, বোম্বাই, করাচী রক্তে ভেসে যাচ্ছে। শত শত মানুষ শহীদ হয়েছেন। কিন্তু গান্ধীজী আর ১৯৪২ সালের গান্ধীজী নন, তিনি তাঁর সেই পুরাতন মূর্তিতেই দেখা দিলেন।

নৌ-বিদ্রোহের এক সপ্তাহ আগে তিনি 'হরিজন' পত্রিকায় লিখলেন :

"ঘৃণার আবহাওয়া দেখা দিয়েছে এবং অধীর দেশপ্রেমিকরা সানন্দে এর

সুযোগ গ্রহণ করে যদি পারে তো হিংসার মাধ্যমে স্বাধীনতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্মোহনী শক্তি আমাদের আচ্ছন্ন করেছে। নেতাজীর নাম মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করছে।…(কিন্তু) তাঁর সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতই যদি তিনি বিজয়ী আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে আসতেন তা হলেও আমি ঐ কথাই বলতাম কারণ জনগণ ঐভাবে নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠিত করতে পারত না।"

নৌ-বিদ্রোহ যখন শুরু হয়ে গেল তখন গান্ধীজী বললেন যে, এ তো সহিংস সংগ্রাম, "কোন অর্থেই একে অহিংস বলা যায় না।"

দেশের মানুষ উত্তেজিত, চঞ্চল ও মারমুখী হয়ে উঠছে দেখে গান্ধীজী সহ সমস্ত কংগ্রেস নেতা, মুসলিম লীগ নেতা জনাব জিন্না যেমন সন্ত্রস্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন নবগঠিত ব্রিটিশ সরকারও তেমনি ভীত ও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। গান্ধীজী স্পষ্ট ভাষায় অহিংস সংগ্রামে হিন্দু-মুসলিম ও অন্যান্যদের ঐক্যকে "অপবিত্র" বলে ঘোষণা করতে দ্বিধা করলেন না। লেবার পার্টির সরকারের সদিচ্ছার উপর তখন তাঁর গভীর আস্থা। তাই তিনি বললেন "শাসকরা ভারতীয়দের শাসনের অনুকূলে ভারতবর্ষ ত্যাগের অভিপ্রায় ঘোষণা করেছেন। ঐ কাজে এক মুহূর্তের জন্যও বিলম্ব হতে দিও না।" (২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬)

পরিস্থিতি অনুধাবন করে বড়লাট ওয়েভেল লণ্ডনে ভারত সচিবের কাছে পাঠানো এক গোপন চিঠিতে লেখেন "সম্প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়েছি যে কংগ্রেস নেতারা রাজনৈতিক উত্তেজনাকে প্রশমিত করতে চান।"

"কংগ্রেসের পিছনে রয়েছে পরাক্রান্ত ধনিক শক্তিরা যারা এই সব দেখে নিজেদের ধনসম্পত্তির নিরাপত্তা সম্বন্ধে বিচলিত বোধ করছে।"

(ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, দলিল নং ২৬৮—অনুবাদ গৌতম চট্টোপাধ্যায়)

অবস্থা অনুকূল বুঝে ব্রিটিশ সরকার ২৪শে মার্চ ৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এক মন্ত্রিসভা মিশন ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দিল। আলোচনা চলল, কিন্তু কোন পক্ষই একটা পরিষ্কার সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেন না।

ইতিমধ্যে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে শেষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস আওয়াজ

তুলেছিল "অবিলম্বে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র চাই।"

অন্যদিকে মুসলিম লীগের আওয়াজ ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিকে নিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়তে হবে।

ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশনের কাছে কংগ্রেস-লীগ বিরোধের চেহারাটা বেশ স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ল। পেথিক লরেন্স, স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ও আলেকজাণ্ডার কংগ্রেস-লীগ বিরোধের মীমাংসা করতে না পেরে নিজেরাই কয়েকটি সুপারিশ করলেন এবং ব্রিটিশ সরকার সেগুলি অনুমোদন করল। নতুন সংবিধান প্রণয়ন সুনিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রী মিশন যে সুপারিশ করল তা দুই ভাগে ভাগ করা যায়, (১) সংবিধান প্রণয়ন সংস্থা গঠনের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং (২) প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থনে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের স্বল্পমেয়াদী প্রস্তাব।

তখনও সারা দেশে গণ-বিক্ষোভের ঢেউ উঠছে। কাজেই কালবিলম্ব না করে গান্ধীজী কার্যত মন্ত্রী মিশনের সুপারিশ মেনে মন্ত্রী মিশনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।

কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ব্রিটিশ সরকার যতই টালবাহানা করুক না কেন তাকে আপস করতেই হবে।

কংগ্রেস মন্ত্রী মিশনের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে স্পষ্ট ভাষাতেই বলল যে, মন্ত্রী মিশন যা বলেছে তা তো ১৯৪২ সালে চার্চিল সরকার যা বলেছিল তারই পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। কংগ্রেস নেতারা গান্ধীজীর মতই বুঝেছিলেন শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারকে একটা কিছু করতেই হবে; তাই তারা আরও চাপ দেওয়ার চেষ্টা শুরু করলেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও ভারতীয় ধনিকশ্রেণী সকলের সামনে তখন একটি বিপদই ভয়াবহরূপে দেখা দিয়েছে তা হল দেশব্যাপী গণ-বিদ্রোহ। সম্মিলিতভাবে এই বিদ্রোহকে দমন করতে না পারলে বিপর্যয় ঘটে যাবে।

ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার ইয়োরোপীয় গোষ্ঠীর নেতা পি জে গ্রিফিকস ১৯৪৬ সালের ২৫শে জুন লণ্ডনে ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনে তাঁর বক্তৃতায় স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন:

"ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন এসে পৌছানর আগে পর্যন্ত বহু লোকই মনে করেছিলেন যে, ভারতবর্ষে বিদ্রোহ আসন্ন হয়ে উঠেছে।"

উদারপন্থী অধ্যাপক হ্যারল্ড লাসকি যাঁর "গ্রামার অব পলিটিকস" আমরা অনেকেই ছাত্রাবস্থায় পড়েছি তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় ২৩শে মে লিখলেন "কোন দেশে জাতির হাতে কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অহিংস পন্থায় ক্ষমতা অর্পণের এটা হল আধুনিক ইতিহাসের বৃহত্তম দৃষ্টান্ত।"

গান্ধীজী যেমন অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে চেয়েছিলেন ব্রিটেন তাতে সাড়া দিয়ে 'অহিংস পন্থায়' ক্ষমতা হস্তান্তর করছে এই ছিল অধ্যাপক লাসকির বক্তব্য।

এর পর চলল গান্ধীজীর সক্রিয় অংশগ্রহণে দীর্ঘ আলোচনা দফায় দফায়। শেষ পর্যন্ত তাদের চূড়ান্ত সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে মন্ত্রী মিশন ২৯শে জুন ভারত ত্যাগ করল।

গণ-পরিষদ ও অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাব অনেক বিবাদ বিসংবাদের পর সকল পক্ষই গ্রহণ করল।

লীগ আগেই সংগ্রামের পথ গ্রহণ করেছিল, হিন্দুদের পক্ষেও প্রতিরোধের ব্যবস্থা হয়েছিল ফলে দাঙ্গা বেধে গেল।

রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের মধ্যেই চলল অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তুতি। বড়লাট জওহরলাল ও জিন্না সাহেব দু জনকেই আমন্ত্রণ জানালেন নতুন সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে। জিন্না সাহেব আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলেন। তখন বড়লাট জওহরলাল নেহরুর উপর সরকার গঠনের ভার দিয়ে তাঁর বেতার ঘোষণায় জানালেন যে লীগ এখনও নতুন সরকারের ১৪ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন সদস্য পাঠাতে পারে।

গণ-পরিষদ কোন সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান নয় এবং সরকার তা ভারতবাসীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে এই মন্তব্য করেও গান্ধীজী কোন বিরোধিতা করলেন না। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট লীগের "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস" ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা, ঢাকা ও নোয়াখালিতে ভয়াবহ হত্যালীলা শুরু হয়ে গেল।

এরই মধ্যে ২৪শে আগস্ট নেহরু প্রথম স্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সদস্যদের নাম ঘোষণা করলেন এবং গান্ধীজী ২রা সেপ্টেম্বর নতুন সরকার

কার্যভার গ্রহণ করার পর শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে অভিনন্দন জানালেন নয়া দিল্লীর এক প্রার্থনা সভায়।

গান্ধীজী, বড়লাটও মীমাংসায় উপনীত হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন বলে তাকে ধন্যবাদ জানালেন।

এদিকে দাঙ্গার দাবানল ছড়িয়ে পড়ল বিহার, মহারাষ্ট্র ও উত্তর প্রদেশে। গান্ধীজী মর্মাহত হলেন এবং জিন্না সাহেব হিন্দুদের শত্রু মনে করছেন বলে দুঃখ-প্রকাশ করলেন।

১লা অক্টোবর ভূপালের নবাব গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলেন মুসলিম লীগের দূতরূপে। লীগ সদস্যরা সরকারে যোগ দিয়ে কংগ্রেসের সদস্যদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করবেন এবং সব বিষয়েই আলোচনা ও পরামর্শ করে সকলে কাজ করবেন বলে গান্ধীজীকে ভূপালের নবাব আশ্বাস দেওয়ায় গান্ধীজী তাঁর উদ্‌ভাবিত সূত্রে স্বাক্ষর দিলেন। কিন্তু পরে তিনি ভুল বুঝে ভূপালের নবাবকে জানালেন যে সূত্রটি বাতিল কারণ কংগ্রেসের প্রতি তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবেন না। আচার্য কৃপালনীর নেতৃত্বে কংগ্রেস তখন লীগের সঙ্গে একটা মিটমাট করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তাই নেতারা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ৫ই অক্টোবরের বৈঠকে গান্ধীজীর সূত্র মেনে নিলেন। লীগও সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিসভায় যোগ দিল।

দেশব্যাপী ভয়াবহ ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে বিচলিত গান্ধীজী অহিংসার মন্ত্র প্রচার করে ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে হিন্দু-মুসলিম বিরোধের অবসান ঘটানোর আহ্বান জানালেন এবং নিজে নোয়াখালি গিয়ে চিরতরে সব বিরোধের অবসান ঘটাবেন বলে ঘোষণা করলেন।

বিহারের নির্মম হত্যালীলায় ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট জওহরলাল নিজে বিহারে গিয়ে দাঙ্গা থামানোর চেষ্টা করলেন নিজের জীবন বিপন্ন করে, দাঙ্গাকারীদের ভয় দেখালেন যে, দরকার হলে তিনি বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করে তাদের শায়েস্তা করবেন।

কিন্তু গান্ধীজী তাঁর বক্তব্য সমর্থন করলেন না, বললেন ওটা তো ব্রিটিশদের পন্থা।

বাংলা ও বিহারে যা ঘটছে তার ফলে স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে এই ভয়ও গান্ধীজী দেখালেন।

নোয়াখালি ও কলকাতায় গান্ধীজীর শান্তি প্রচেষ্টা সাময়িকভাবে সাড়া জাগিয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে আমার বন্ধু ও সহপাঠী হরিদাস মিত্র নোয়াখালিতে গান্ধীজীর কাছে প্রশ্ন করে যে জবাব পেয়েছিল তা তারই একটা প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করছি।

"...বিজয়নগর গ্রামে যাবার সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ত্রিপুরা নোয়াখালির তার এই পরিক্রমায় অপরাধী মানুষের মনে কোন ছাপ পড়েছে কি না, তাদের মানসিকতায় কি কোন পরিবর্তন হয়েছে?" ঐদিন প্রার্থনা সভায় এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বাপুজী বলেছিলেন যে, "এই মুহূর্তে যদিও বড় রকমের পরিবর্তন তিনি লক্ষ্য করছেন না তবু হৃদয় পরিবর্তনের সাধনার পথই তিনি বেছে নিয়েছেন এবং আজীবন এই পথ ধরেই তিনি চলবেন।"

(গান্ধী পরিক্রমা, পৃঃ ২৮২)

এল ১৯৪৭ সাল। গান্ধীজীর পরিক্রমা অব্যাহত রইল, কিন্তু এই সময়েই তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, পাকিস্তান হতে পারে, তবে একমাত্র স্বাধীনতা লাভের পরেই তা সম্ভব। বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে এই ইঙ্গিতও তিনি দিলেন।

গান্ধীজী অহিংসার পূজারী হয়েও মেয়েদের ইজ্জত রক্ষার জন্য ছোরা রাখার উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি অহিংসার নামে ভীরুতাকে প্রশ্রয় দিতে নিষেধ করেছিলেন। তবু যিনি সকল ক্ষেত্রে যে অহিংসার আদর্শ অক্ষুন্ন রাখতে চেয়েছিলেন সকল ক্ষেত্রে সে আদর্শ যে অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব নয় এই নির্মম সত্যকে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বিহারের দাঙ্গা ভয়াবহ আকার ধারণ করায় বিহারে যাওয়ার জন্য গান্ধীজীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হয়। বিহারে সংখ্যালঘুদের উপর যে বর্বর আক্রমণ চালানো হয় নোয়াখালির পাল্টা জবাবে তার শিকার হয়েছিলেন বেশির ভাগই কংগ্রেস সমর্থক। বিধ্বস্ত গ্রামগুলি দেখে মর্মাহত গান্ধীজী বলেছিলেন যে, 'করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গে' অর্থাৎ হয় তিনি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করবেন আর না হয় তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। ফল বিশেষ কিছু হয়নি। লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু পরে বিহার ত্যাগ করেছিল। আজও তাদের ২০ লক্ষ মানুষ বাংলা দেশে রয়েছে। তবু গান্ধীজীর আপ্রাণ

চেষ্টা, তাঁর মৃত্যু ভয়হীন পদযাত্রা, তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প তাঁকে মহিমান্বিত করে তুলেছিল।

গান্ধীজী নোয়াখালিতে থাকার সময় ২৮শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এ্যাটলি তাঁর এক বিবৃতিতে পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ সরকারের সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায় হচ্ছে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের আগেই দায়িত্বশীল ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা। যুগপৎ আর একটি ঘোষণায় লর্ড ওয়েভেলের কার্যকালের মেয়াদ শেষ করে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে বড়লাট নিযুক্ত করলেন।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি সম্পর্কে গান্ধীজী ২৪শে ফেব্রুয়ারি জওহরলাল নেহরুর কাছে যে পত্র লেখেন তাতে বলা হয় যে এর ফলে যে সব প্রদেশে বা দেশের অন্যান্য যে সব মহল পাকিস্তান চাইবে তারা পাকিস্তান পাবে। এ নিয়ে কোন জোর জবরদস্তি করা হবে না। তিনি এ কথাও লেখেন যে, যদি ব্রিটিশ সরকার অকপট হয় ও অকপট থাকতে পারে তা হলে ঘোষণাটি ভালই, আর তা না হলে এটা বিপজ্জনক।

গান্ধীজী জানান যে, অনেক কিছু নির্ভর করবে গণ-পরিষদ কি করবে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কি করতে পারবে তার উপর।

এ্যাটলি সরকারের ঘোষণা সম্পর্কে গান্ধীজীর মনে যে সন্দেহ ছিল তা বেশ বুঝতে পারা যায়। কিন্তু জল তখন অনেক দূর গড়িয়ে গেছে, ফিরে আসার অর্থাৎ আবার কোন আন্দোলন শুরু করার কোন ইচ্ছা তাঁর বা কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের ছিল না। ভারতীয় ধনিকশ্রেণীও তখন যেন-তেন-প্রকারেণ শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব। জনগণ বিভ্রান্ত, বিমূঢ় ও ক্লান্ত।

এই সময় দিল্লীতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র নিয়ে যিনি গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেন তাঁকে গান্ধীজী বলেছিলেন: "...পরাজিত মানুষরূপে আমি মরতে চাই না। কোন আততায়ীর বুলেট যদি আমার জীবনের অবসান ঘটায় তা হলে আমি তাতে স্বাগত জানাব। তবে সর্বোপরি আমি কামনা করি আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত আমার কর্তব্য পালন করে এগিয়ে যেতে।"

এই উক্তিতে গান্ধীজীর মনের একটা গভীর বেদনা ও নৈরাশ্য ব্যক্ত হয়েছে। তিনি পরিষ্কারভাবেই উপলব্ধি করেছেন যে তিনি আর জাতির বা ধনিকশ্রেণীর

নেতা বা প্রবক্তার ভূমিকা পালন করতে পারছেন না। তাঁকে নেতার আসন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নতুন বড়লাট মাউন্টব্যাটেন গদীতে বসেই এমন একটা ভাব নিলেন যে তিনিই সর্বেসর্বা। যা কিছু করার তিনিই করবেন।

ভারতবর্ষকে তাঁবে রেখে তথাকথিত স্বাধীনতাদানের পরিকল্পনা চার্চিলের আমলেই তৈরি হয়েছিল এ্যাটলি সরকার সেই পরিকল্পনার কিছুটা প্রয়োজনীয় রদবদল করে তা রূপায়িত করার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেনের হাতে।

নতুন বড়লাট প্রথমেই গান্ধীজীকে ভজাবার উদ্দেশ্যে তাঁকে দিল্লীতে আসার আমন্ত্রণ জানালেন।

৩১শে মার্চ গান্ধীজী তাঁর সঙ্গে সওয়া দুই ঘণ্টা সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা করলেন। এরপর চলল আবার সেই চিরাচরিত বুর্জোয়া রাজনীতির খেলা।

পাকিস্তানের দাবি যে ঠেকানো যাবে না তা গান্ধীজী অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। নোয়াখালিতে তাঁর বক্তব্যগুলিই তার প্রমাণ। তবু তিনি দেশ বিভাগ রোধ করার জন্য শেষ চেষ্টা করলেন বড়লাটের সঙ্গে দ্বিতীয়বার আলোচনার পর।

১৯৪৭ সালের ৫ এপ্রিল তিনি চুক্তির খসড়া রচনা করলেন। এই চুক্তিটি নিম্নরূপ :

(১) জিন্না সাহেবকে কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে ;

(২) কাকে মন্ত্রী করা হবে বা না হবে তা জিন্না সাহেবই স্থির করবেন ;

(৩) জিন্না সাহেব যদি এ সব মেনে নেন তা হলে কংগ্রেস তার সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবে ;

(৪) সমস্ত ব্যাপারে একমাত্র সালিস থাকবেন বড়লাট মাউন্টব্যাটেন ;

(৫) জিন্না সাহেবকে অবশ্যই বলতে হবে যে তিনি সারা ভারতবর্ষে শান্তি বজায় রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

গান্ধীজীর এই শেষ চেষ্টা ডুবতে থাকা মানুষের খড় আঁকড়ে বাঁচবার শেষ চেষ্টার মত।

স্বভাবতই কংগ্রেস গান্ধীজীর এই চুক্তির খসড়া মেনে নিতে পারল না।

১২ই এপ্রিল গান্ধীজী বড়লাটকে জানালেন যে, তাঁর পরিকল্পনা কংগ্রেসের

কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি কাজেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে সব আলাপ-আলোচনার দায়িত্ব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির উপর ন্যস্ত করছেন। এর পরেই ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনাটি প্রকাশ করা হল।

লাট সাহেবদের সম্মেলনের পূর্বাহ্নে বড়লাট ১২ই এপ্রিল নিম্নলিখিত পরিকল্পনা পেশ করলেন। এতে বলা হল :

(১) দেশ বিভাগ যদি হয় তো তার দায়িত্ব যথাযথভাবে ভারতীয়দের উপরেই বর্তাবে ;

(২) প্রদেশগুলি মোটামুটিভাবে তাদের নিজ নিজ ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার অধিকার পাবে ;

(৩) ভোট গ্রহণের উদ্দেশ্যে বাংলা ও পাঞ্জাবকে আপাতত বিভক্ত করা হবে ;

(৪) বাংলা মুসলিম প্রদেশে যোগদান করবে কি করবে না তা শ্রীহট্টই স্থির করবে ;

(৫) উত্তর প্রদেশ সীমান্ত প্রদেশে সাধারণ নির্বাচন হবে।

দিল্লী থেকে পাটনায় ফিরে এসে গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে তাঁর আলোচনার উল্লেখ করে মন্তব্য করলেন যে, বড়লাট যা বলছেন তা অকপটভাবেই বলছেন।

হিংসা পরিহার করার জন্য গান্ধীজী ও জিন্না সাহেব এক যুক্ত আবেদন প্রচার করলেন ১৫ই এপ্রিল। এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন বড়লাট। চাতুর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ব্রিটিশ সরকার সমগ্র জগতের কাছে নিজেদের নির্দোষ ও অকপট প্রমাণ করার চেষ্টা করল। ভাবটা এই যে, তাদের কিছুই করার নেই, তারা নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত।

এদিকে বড়লাটের সঙ্গে আর একবার দেখা করে ৬ই মে জিন্না সাহেবের বাড়িতে গিয়ে গান্ধীজী তিন ঘণ্টা আলোচনা করলেন। উভয়ের সম্মতিক্রমে যে বিবৃতি প্রকাশ করা হল তাতে বলা হল যে, দেশ বিভাগের প্রশ্নে তাঁরা একমত হতে পারেন নি। তবে হিংসা পরিহারের জন্য জনসাধারণের কাছে তাঁরা যে আবেদন জানিয়েছেন তা বহাল রইল এবং এর জন্য তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য বড়লাট ১৮ই মে লণ্ডন রওনা হলেন এবং নয়াদিল্লী ফিরে এলেন ৩১শে মে।

গান্ধীজী সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়েও বেশ কিছুকাল আগেই বুঝতে

পেরেছিলেন যে তিনি আর রাজনৈতিক নেতারূপে স্বীকৃত নন। কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হচ্ছে না। তাই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কংগ্রেস নেতাদের লক্ষ্য করে তিনি তাঁর প্রার্থনাসভায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বললেন কংগ্রেসে পচন ধরতে শুরু করেছে সেদিকে তারা যেন লক্ষ্য রাখেন। তিনি বললেন যে, একজন কংগ্রেসী জনগণের সেবক, শাসক নয়। ১লা জুন বোঝা গেল যে, কংগ্রেস নেতারা জিন্না সাহেবের সঙ্গে তাদের আর কোন সম্পর্ক থাকবে না—এই শর্তে দেশ বিভাগের প্রস্তাবে প্রায় রাজী। গান্ধীজী তাদের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না।

২রা জুন বড়লাট ভবনে নেতাদের বৈঠক বসল। নেহরু বললেন, ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনা কংগ্রেস সম্পূর্ণভাবে কখনই অনুমোদন করতে না পারলেও মোটামুটিভাবে কংগ্রেস এটা গ্রহণ করেছে।

রাত্রি সাড়ে বারোটায় গান্ধীজী লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করলেন। পরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠকে গান্ধীজী বললেন যে, ভারতবর্ষ বিভাগ করা সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের সঙ্গে তিনি একমত না হলেও কমিটির সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করার পথে কোন বাধা সৃষ্টি করতে চান না।

গান্ধীজী গণ-আন্দোলন চলাকালে ব্রিটিশ কূটনীতির কাছে বারবার পরাজিত হয়েছেন, এবার সেই পরাজয় সম্পূর্ণ হল। হরিজন বস্তিতে বড়লাট তাঁর সঙ্গে দেখা করার পর তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা সভায় স্পষ্ট ভাষায় বললেন :

"দেশ বিভাগের জন্য ব্রিটিশ সরকার দায়ী নয়। এতে বড়লাটের কোন হাত নেই। প্রকৃতপক্ষে তিনি কংগ্রেসের মতই দেশবিভাগের বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু আমরা হিন্দু-মুসলমান যদি কোন ব্যাপারেই একমত না হতে পারি তা হলে বড়লাটের আর কিছুই করার থাকে না।"

স্মরণ রাখতে হবে যে, ৩রা জুন কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনি, কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যদিও কোন কোন বিষয়ে কংগ্রেসের দ্বিমত আছে—এই মর্মে বড়লাটকে এক পত্র দেন। এর পরেই রাত্রিকালে বড়লাট আকাশবাণীতে দেশবিভাগের কথা ঘোষণা করেন।। গান্ধীজী কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেন নি কিন্তু তাঁর কথা শোনার কোন লোক তখন ছিল না। যেন-তেন-প্রকারেণ ক্ষমতা লাভের জন্য ব্যগ্র শেঠজীদের সমর্থিত

কংগ্রেস নেতারা তখন গান্ধীজীর কোন উপদেশে কর্ণপাত করতে রাজী ছিলেন না।

অসহায় গান্ধীজী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার জন্য নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির কাছে সুপারিশ করলেন।

১৫ই জুলাই পার্লামেণ্টে ভারতীয় স্বাধীনতা পাস হয়ে গেল। ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্তান এই দুই ডোমিনিয়ানে পরিণত হল। এর আগেই ১৪ই জুন গান্ধীজী নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে ঘোষণা করেন "ভারত স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে।"

গান্ধীজী তখন আর নেতা নন, তবু তাঁকে কংগ্রেস কাজে লাগাতে দ্বিধা করছে না এবং গান্ধীজীও কংগ্রেসের সঙ্গেই থাকছেন। যে গান্ধীজী দেশ বিভাগের তীব্র বিরোধিতা করে এসেছিলেন সেই গান্ধীজীই ২১শে আগস্ট পার্ক সার্কাস ময়দানের জনসভায় সীমানা নির্ধারণ কমিশনের রোয়েদাদ অক্ষরে অক্ষরে মেনে নেওয়ার জন্য আবেদন জানাতে দ্বিধা করলেন না।

দেশ বিভাগে গান্ধীজীর দায়িত্ব ছিল কি ছিল না এ নিয়ে এখনও বিতর্ক চলছে পত্রিকায় পত্রিকায়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর দায়িত্ব থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তিনি যে নেতার পদ থেকে অপসারিত তবু তখনও তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র তাই তাঁর মুখ দিয়ে প্রয়োজনমত কিছু বলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে কংগ্রেস নেতারাও বাধ্য হয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালেই তো গান্ধীজী বলেছিলেন যে তিনি "সেকেলে" (ব্যাক নাম্বার) হয়ে গেছেন।

১৯৪৫ সালে গান্ধীজী জওহরলালকে (৫ই অক্টোবর) এক চিঠিতে লেখেন যে, "হিন্দ্ স্বরাজ" গ্রন্থে যে ধরনের রাষ্ট্রের কথা ভেবেছেন তেমন একটি রাষ্ট্রই তিনি ভারতে দেখতে চান। এটা তাঁর কথার কথা নয় তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।

জবাবে নেহরু স্পষ্ট ভাষায় লেখেন যে, ২০ বছর বা তারও আগে যখন তিনি "হিন্দ্ স্বরাজ" পড়েছিলেন তখনই তাঁর কাছে তা সম্পূর্ণ অবাস্তব মনে হয়েছিল। "তারপর তো দুনিয়া একেবারে বদলে গেছে।"

দুনিয়া বদলে যেতে থাকে ১৮৪৮ সালে "কমিউনিস্ট ইস্তাহার" প্রকাশিত

হওয়ার পর থেকেই। ১৮৪৮ সালের বিপ্লব নতুন যুগের সূচনা করে। কিন্তু গান্ধীজী কখনও এ নিয়ে মাথা ঘামান নি।

ব্যারিস্টারী পড়তে গিয়ে তিনি নিরামিষ-আমিষ খাদ্য বিচার নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। এটা সত্যি সাত্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার। রাজা রামমোহন ওয়েনের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন অথচ গান্ধীজীর মত একজন বিশাল ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা ইয়োরোপের নতুন চিন্তাধারা যা বঙ্কিমচন্দ্রকে "সাম্য" লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা জানবার বা বুঝবার চেষ্টামাত্রও করেন নি।

এরই ফল পরিণতি ঘটে অবাস্তব ও অনগ্রসর মধ্যবিত্তসুলভ কল্পনাশ্রয়ী চিন্তাধারায়। কাজেই শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া রাজনীতি থেকে তাঁর বিদায় গ্রহণ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

তাঁর একমাত্র সাফল্য ভারতবর্ষে গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করা, কিন্তু সে সাফল্য তাঁর বিরাট ব্যর্থতাকে আড়াল করতে পারেনি।

নেতাদের মধ্যে গান্ধীজীই কালোত্তীর্ণ হতে পারেন এ কথা বলার পরও অশীন দাশগুপ্ত লিখেছেন :

"অথচ নেতা হিসাবে গান্ধীজীর ব্যর্থতা সুবিদিত। এই ব্যর্থতার কথা সবচাইতে ভাল এবং সবচেয়ে কঠিনভাবে তিনি নিজেই জেনে গেছেন।"

(দেশ, কংগ্রেস সংখ্যা, জড়ভরতের হরিণ : গান্ধী এবং কংগ্রেস)

উক্ত লেখক প্রধানত কংগ্রেসের প্রতি এবং সত্যাগ্রহের প্রতি গান্ধীজীর মোহকে তাঁর ব্যর্থতার কারণ বলে দেখাতে চেয়েছেন। আসলে গান্ধীজী কংগ্রেসকে তাঁর অহিংসা ও প্রেমের মাধ্যমে শত্রুপক্ষের হৃদয় পরিবর্তনের সংগঠনরূপে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

এটা একটা বিরাট পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার। আর এতে তাঁর সাময়িক সাফল্য যেমন দেশের মানুষের মান বাড়িয়েছিল, তেমনি জগৎবাসীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই সাময়িক সাফল্য গান্ধীজীকে আরও শক্তহাতে কংগ্রেসের হাল ধরতে উদ্বুদ্ধ করে। আর তার ফলেই তিনি বুর্জোয়া রাজনীতির প্রবল স্রোতে ভেসে যান। তিনি জনগণের প্রতিনিধি হলেও আন্দোলন পরিচালনা করেন ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর মুখপাত্ররূপে।

এ ছাড়া শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ক্ষমতায় আসীন অথবা ক্ষমতাসীন হওয়ার জন্য উদগ্রীব একটি সমগ্র শ্রেণীকে তাঁর অহিংসা ও প্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা যে অসম্ভব এই কঠিন সত্যটিকে তিনি কখনও বুঝতে পারেন নি বা বুঝতে চাননি।

এই কারণেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনে তাঁর ব্যর্থতা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের গভীর চক্রান্ত গান্ধীজী বুঝতেই পারেন নি, তাই অনায়াসে দেশবিভাগের কোন দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারের নেই বলে তিনি ঘোষণা করতে পেরেছিলেন।

অথচ ব্রিটিশ সরকার শুধু দেশবিভাগই করে নি, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যাতে দাঙ্গা বাধে তার জন্য সার্বিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। গোয়েন্দা বিভাগ থেকে গোপন দাঙ্গার উস্কানি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রও যোগানো হয়। ফলে পাঞ্জাব, বাংলা ও অন্যান্য স্থানে দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ভারত ও পাকিস্তান যাতে শত্রুভাবাপন্ন দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুঠোর মধ্যে থাকতে বাধ্য হয় এই উদ্দেশ্যেই সুপরিকল্পিতভাবে দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

১৯৪৮ সালের আগে ১৯৪৭ সালে আগস্ট মাসে রাতারাতি ভারত ও পাকিস্তানকে দুটি ডোমিনিয়ান রূপে স্বীকার করে নেওয়ার মূল কারণ ছিল তিনটি :

(১) সারা দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার নিয়ে দেশব্যাপী গণ-বিক্ষোভ ও নৌ-বিদ্রোহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত টলিয়ে দিয়েছিল।

(২) ব্যাপক গণ-বিক্ষোভে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ও তার বিপুল শক্তিবৃদ্ধি।

(৩) ব্রিটিশ সরকারের গভীর অর্থনৈতিক সংকট। ভারতবর্ষ তখন পাওনাদার দেশ, যে ব্রিটেনের কাছে পাবে দুই হাজার কোটি টাকা যাকে বলা হত স্টার্লিং ব্যালান্স।

ক্ষমতালাভে ব্যগ্র গান্ধীজীসহ কংগ্রেস এবং জিন্না সাহেবসহ সমস্ত লীগ নেতা এইসব সমস্যা সমাধানে ব্রিটিশ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করলেন। সকলেই গণ-বিক্ষোভের বিরোধিতা করলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে ধিক্কার

দিলেন। এমনকি, আগস্ট বিপ্লবের অন্যতমা নেত্রী অরুণা আসফ আলিকে তো গান্ধীজী রীতিমত ধমক দিলেন নৌ-বিদ্রোহ সমর্থন করার জন্য। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তো স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, স্বাধীনতা যখন এসে যাচ্ছে তখন এইসব হঠকারিতাকে প্রশয় দেওয়া হবে না। বিপ্লবী সোশ্যালিস্ট পার্টি ও অন্যান্য বিপ্লবী নেতাদের তো সাড়াই পাওয়া গেল না। দেশবাসী তখনও কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের দিকে তাকিয়ে কাজেই বিক্ষোভের আগুন নিভে যেতে দেরী হল না।

এরপর ভারত ও পাকিস্তানের বাজার দখলের ব্যবস্থা পাকাপাকি করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ স্টার্লিং ব্যালান্স কমানোর জন্য চমৎকার চাল চালল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ভারতবর্ষ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ বাবদ কেটে নেওয়া হল ৪৫০ কোটি টাকা এবং ২০ বছরের হোম চার্জ (বছরে ভারতকে এই বাবদ ১৩ কোটি টাকা দিতে হত)। আগাম কেটে নেওয়া হল ২৬০ কোটি টাকা। এর উপর যুদ্ধের ব্যয় বাবদ বছরে ২০ কোটি টাকা ধরে বেশ কয়েক কোটি টাকা ভারতের পাওনা টাকা থেকে কাটা গেল। এরপরেও ভারতকে কিছু ঝড়তি-পড়তি মাল; সেকেলে যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দিয়ে দেনার অধিকাংশ শোধ করা হল। নেতারা উচ্চবাচ্য করলেন না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আবার বেশ গুছিয়ে বসল।

এখন দেশ বিভাগের বিষয়টি আবার আলোচনা করা দরকার, কারণ কেউ বলছেন গান্ধীজীই এর জন্য দায়ী আবার কেউ বলছেন তাঁর কোন দায়িত্ব নেই।

এক হিসাবে গান্ধীজীর কোন দায়িত্বই থাকার কথা নেই কারণ তিনি তো আর তখন নেতা বলে স্বীকৃত নন। আবার তাঁকে দায়িত্ব থেকে একেবারে রেহাই দেওয়াও যায় না।

১৯৪৭ সালের ৩১ শে মার্চ গান্ধীজী বলেছিলেন যে, কংগ্রেস যদি দেশবিভাগ চায় তাহলে তা করতে হবে তাঁর মৃতদেহের উপর দিয়ে। কিন্তু গান্ধীজী তাঁর কথা রাখতে পারেন নি, শেষ পর্যন্ত দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত তাঁকে মেনে নিতে হয়েছে।

দেশ বিভাগের সূচনাও তো গান্ধীজীই করেছিলেন খিলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করে। জিন্না সাহেব কখনও গণ-আন্দোলন

চাননি কিন্তু তখন, অর্থাৎ ১৯২০ সালে, তিনি ছিলেন পুরোপুরি জাতীয়তাবাদী। তিনি চেয়েছিলেন উপরের তলায় হিন্দু-মুসলমানরা এক হয়ে কাজ করুক। তিনি তখন খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে গান্ধীজীকে নিষেধ করেছিলেন। গান্ধীজীকে তিনি 'মহাত্মা' বলেন নি। এই অজুহাতে সেদিন গান্ধীভক্তরা তাকে অপমানিত করেছিল। এই অপমান জিন্না সাহেব ভুলতে পারেন নি। যে পাকিস্তানের কথা তিনি কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নি, এরপর থেকে তিনি ধীরে ধীরে সেই পাকিস্তানের কথাই ভাবতে শুরু করেছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাকে নানাভাবে উসকে দিয়ে গোঁড়া পাকিস্তান সমর্থক করে তুলেছিল। কট্টর সাম্রাজ্যবাদী চার্চিল জিন্না সাহেবকে মুসলমানদের একমাত্র নেতার আসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন। গান্ধীজী কার্যত তা' মেনেও নিয়েছিলেন। বড়লাট লিনলিথগো এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

অবশ্য পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষকে অখণ্ড রাখলেই তাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকবে এই কথা ভেবে পাকিস্তানের প্রশ্নটি ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। জিন্না সাহেব প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উন্মত্ত হয়ে ওঠে। ১৯৪৫ সালের শেষ দিকে বললেন যে, মুসলমানরা যদি লীগকে আগামী নির্বাচনে নির্দেশ দেয় তাহলে "আর কোন তদন্ত বা গণ-ভোট গ্রহণ না করে বর্তমান প্রদেশগুলির ভিত্তিতেই" পাকিস্তান দাবি করা যেতে পারে। সরকার বা কংগ্রেস জিন্না সাহেবের বক্তব্যের প্রকাশ্য বিরোধিতা করল না। বড়লাট ওয়েভেল মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন যে, "কোন একটি সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রদেশগুলির সাংবিধানিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অভিপ্রায় তাদের নেই।" কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তার এই ঘোষণা বাতিল করে দিল। তারা তখন আবার দেশবিভাগই তাদের স্বার্থ রক্ষার শ্রেষ্ঠ-পন্থা বলে স্থির করল।

আয়েসা জালাজ তাঁর "দ্য সোল্ স্পোকস্‌ম্যান, জিন্না, দ্য মুসলিম লীগ এ্যাণ্ড দ্য ডিমাণ্ড ফর পাকিস্তান" গ্রন্থে লিখেছেন: "১৯৪৬ সালের নির্বাচনে জিন্নার সাফল্যের মূলে ছিল পাকিস্তান বলতে কি বোঝায় তা' ভোটারদের জানাতে ব্রিটিশ সরকারের অসম্মতি, আর ওই সাফল্যের মূলে ঠিক ততটাই ছিল কংগ্রেস—যা লীগের প্রভাববহির্ভূত প্রদেশগুলিতে সম্ভাব্য মুসলিম মিত্রদের সমবেত করতে ব্যর্থ হয়।"

যুদ্ধাবসানের ঠিক পরেই আসামের গভর্নর অ্যাণ্ডরু ক্লইভ অকপটভাবেই বলেছিলেন যে, "পাকিস্তানকে একটি জীবন্ত প্রশ্নে পরিণত করার ব্যাপারে কিছুটা অবদান রাখতে হয়েছিল ব্রিটেনকে"। তিনি আরও বলেন যে, তার সংজ্ঞার্থকে বরাবর অস্পষ্ট রাখায় জিন্নার পক্ষে সমর্থন লাভ সম্ভব হয়েছিল।

ক্রমে এই অস্পষ্ট পাকিস্তানই মুসলমানদের রণধ্বনিতে পরিণত হল। একদিকে আওয়াজ উঠল "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান", অন্য দিকে আওয়াজ উঠল "হিন্দুরা এক হও।" এরপরেই জ্বলে উঠল দেশব্যাপী দাঙ্গার আগুন, পুড়ে মরল পাঁচ লক্ষাধিক নরনারী ও শিশু। তখন লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের প্রথম "স্বদেশী" বড়লাট ; তখনও ব্রিটিশ ফৌজ বহাল ছিল কিন্তু দাঙ্গা নিরোধের কোন চেষ্টাই কার্যত করা হয়নি। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দারজী বড়লাটের কাছে ধরনা দিয়েছিলেন দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে। "স্বদেশী" বড়লাট মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে দিলেন। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দুটি দেশ যাতে চিরকালের জন্য পরস্পরের শত্রু হয়ে যায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছিল গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতাদের সামনেই। তারা কিছুই করতে পারেন নি। আর জিন্না সাহেব তো এ নিয়ে মাথা ঘামান নি। গান্ধীজী আশা করেছিলেন, তিনি ও জিন্না সাহেব জনসাধারণকে হিংসা পরিহার করার জন্য যে যুক্ত আবেদন জানিয়েছিলেন জিন্না সাহেব নিশ্চয়ই সেই আবেদনের কথা স্মরণ রেখে তার কর্তব্য পালন করবেন। কিন্তু জিন্না সাহেব তাঁর আশা পূর্ণ করেন নি। সরদার বল্লভভাই প্যাটেলও তাঁর কর্তব্য যথারীতি পালন করেন নি, এমন কি গান্ধীজীর জীবন বিপন্ন হতে পারে জেনেও তিনি গান্ধীজীকে রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি।

দেশবিভাগের এই শোচনীয় পরিণতির মূল দায়িত্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের, কিন্তু কংগ্রেস ও লীগের দায়িত্বও কম ছিল না।

গান্ধীজী ও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের দায়িত্ব অস্বীকার করে অতুল্য ঘোষ নির্বিকার চিত্তে লিখেছেন, ভারত বিভাগের জন্য "মূলত দায়ী ছিল কমিউনিস্ট পার্টি, দ্বিতীয় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এবং তৃতীয় মুসলিম লীগ।" (ভারত বিভাগ : কার্যকারণ—অতুল্য ঘোষ, দেশ, শতবর্ষ সংখ্যা, পৃঃ ১৩০) অর্থাৎ অতুল্যবাবুর মতে কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সরকার ও লীগের চাইতেও শক্তিশালী ছিল।

এই সব অদ্ভুত যুক্তি একমাত্র অতুল্যবাবুই দেখাতে পারেন—কারণ তিনি অনেককিছু জেনে বা না জেনে অনায়াসে তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে দ্বিধা বোধ করতেন না।

কমিউনিস্ট পার্টি দেশবিভাগের যে পরিকল্পনা দেশবাসীর সামনে পেশ করেছিল তার লক্ষ্য ছিল শান্তি ও সৌহার্দ্যের আবহাওয়ায় যা অনিবার্যভাবে ঘটতে চলেছে তা ঘটতে দেওয়া। এটা যে ভুল হয়েছিল তা কমিউনিস্ট পার্টি পরে অকপটে স্বীকার করেছে, ডঃ অধিকারীর তত্ত্ব যে ভুল ছিল তা পার্টি স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়নি। অথচ অতুল্যবাবু থেকে আরম্ভ করে অনেক নেতাই কমিউনিস্টদের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন যেন তারা সব "ধোয়া তুলসীর পাতা।" পরবর্তীকালে প্রয়াত অতুল্যবাবু তার প্রবন্ধে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, 'ভারত বিভাগ তো হয়ইনি, বরং ভারত ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।' এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন।

দেশ বিভাগের মর্মান্তিক পরিণতি গান্ধীজীকে টেনে আনল দুর্গত মানুষদের মধ্যে। রাজনীতির পঙ্কিল আবর্ত থেকে নিজেকে মুক্ত করে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব রোধের সংগ্রামে। অহিংসা, শান্তি ও প্রেমের বাণী তিনি প্রচার করতে লাগলেন অশ্রান্তভাবে। গান্ধীজী দেখা দিলেন এক মহাপ্রাণ মানুষরূপে। শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠীর ভাষায় "In this deliberate withdrawal from 'History's cunning passages, contrived corridors' lies his supreme greatness".

রাজনীতির পঙ্কিলতা ; চাতুর্য ও ভণ্ডামির খেলা পরিহার করে 'মহাত্মা' সত্যিকারের মহাত্মারূপেই আত্মপ্রকাশ করলেন। জীবন বলি দিয়ে তিনি তাঁর সকল ব্যর্থতার উর্ধ্বে উঠে গেলেন।

১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে যাওয়ায় সময় তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের আততায়ী নাথুরাম গডসের গুলিতে নিহত হলেন।

গান্ধীজী শহীদ হলেন মানবতার মহৎ ব্রত পালন করতে গিয়ে, তাঁর সমস্ত ব্যর্থতার পরিসমাপ্তি ঘটল এক উজ্জ্বল সাফল্যের মধ্যে। তাঁর জীবনের বাণীকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেলেন। তাই আজ এই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে বিপন্ন

হিংসা দীর্ণ পৃথিবীতে তাঁর প্রেম, শান্তি ও অহিংসার বাণী পরম গুরুত্ব লাভ করেছে। তাই সোভিয়েত পণ্ডিত উলিয়ানভস্কি থেকে আরম্ভ করে অনেক বিদেশী ও ভারতীয় পণ্ডিত আজ আবার নতুন করে গান্ধীবাদের মূল্যায়ন করছেন।

তবু এই সত্যকে স্বীকার করতেই হবে যে, গান্ধীজী তাঁর যে পন্থা অনুসরণ করেছিলেন তার সাফল্য গণ-জাগরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর পন্থা ব্যর্থ হয়েছিল। আর এর জন্য তাঁর ক্ষোভ ও দুঃখের অন্ত ছিল না।

ডঃ রাধাকৃষ্ণণ লিখেছেন: "ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য গান্ধী তাঁর আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি বাঞ্ছিত সাফল্য অর্জন করেন নি। ভারত বিভাগ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে ব্যর্থ হবার স্বীকৃতি। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর সঙ্গে আবার সর্বশেষ সাক্ষাৎকারের সময় দেশ বিভাজন সম্বন্ধে আমি তাঁর মনোভাবের কথা জানতে চাই। অত্যন্ত তীব্র ভাষায় এর নিন্দা করে তিনি বললেন, এটা কোন খুঁটিনাটির প্রশ্ন নয়, নীতিগত প্রশ্ন। সুতরাং মৌলিক নীতির প্রশ্নে কোন আপসের স্থান নেই"। নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি বললেন, "এখন কোন আন্দোলন শুরু করার মত বয়স আমার নেই এবং আমার বিশ্বাসভাজন সহকর্মীরা দেশ বিভাজন স্বীকার করে নিয়েছেন।" এই উক্তি ব্যর্থতায় ভেঙ্গে পড়া এক বিষণ্ণ মানুষের উক্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

ডঃ রাধাকৃষ্ণণ লিখেছেন: "জীবনের শেষ অঙ্কে তিনি হয়ে পড়েন নিঃসঙ্গ ও নৈরাশ্যপীড়িত। আততায়ীর গুলী তাঁর দেহে বিদ্ধ হবার পূর্বে প্রচণ্ড হতাশা তাঁর আত্মাকে ভর করেছিল।"

(শতবার্ষিকীর অনুচিন্তন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, বাংলা অনুবাদ—গান্ধী পরিক্রমা, ২য় সং)

* * * *

গান্ধীজী মহৎ উদ্দেশ্যেই কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি রাজনীতির চিরাচরিত ধারণার উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। ছোট-বড় দু-একটি বিষয় উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর বিরূপ ও অ-গণতান্ত্রিক আচরণের কথা জানাই আছে, কাজেই সে বিষয় নিয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই।

এখন একটি ছোট বিচারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

নলিনীরঞ্জন সরকার এক সময় দেশবন্ধুর অন্যতম প্রিয়পাত্র হয়ে উঠে বাংলার রাজনীতিতে বেশ আসর জাঁকিয়ে বসেছিলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ বাংলার পঞ্চবৃহতের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। বাংলার সেই নীতিহীন রাজনীতির যুগে নলিনীরঞ্জন সরকার কলকাতার মেয়র হওয়ার আশায় সুবিধাবাদী নীতি অনুসরণে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু কলকাতা কর্পোরেশনের বেশির ভাগ সদস্যই ১৯৩৪ সালে ফজলুল হকের নাম মেয়র পদের জন্য প্রস্তাব করেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও তাঁর সমর্থকরা সরকার মনোনীত সদস্যদের সমর্থনে নলিনীরঞ্জনের নাম প্রস্তাব করেন। এপ্রিল মাসে নির্বাচন হয় এবং নলিনীরঞ্জন ভোটে জেতেন। কিন্তু ৩১শে মার্চ সরকার মনোনীত কাউন্সিলারদের কার্যকালের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ায় তার অধিকার ছিল না। সভাপতি বীরেন্দ্র নাথ শাসমল এই কারণে নির্বাচনে হক সাহেবকে জয়ী বলে ঘোষণা করেন।

তখন বাংলার কুখ্যাত লাট এলভারসনকে ধরে নলিনীরঞ্জন নির্বাচন বাতিল করে দেন। আইন সংশোধন করে সরকার মনোনীত সদস্যদের ভোটের জোরে নলিনীরঞ্জন মেয়র হন। বীরেন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে তারযোগে সমস্ত ব্যাপারটি জানিয়ে ডাঃ রায়ের সমর্থক কাউন্সিলারদের কংগ্রেস আদর্শ ও নীতি ক্ষুণ্ণ করে সরকার মনোনীত কাউন্সিলারদের সঙ্গে যোগ দিতে নিষেধ করার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী জবাবে জানালেন:

"উভয় পক্ষের কথা না শুনে আমি হস্তক্ষেপ করার সাহস রাখি না।"

(ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, ৩০শে জুন, ১৯১৪)

১৯৩৬ সালের ১১ই আগস্ট বিক্ষুব্ধ জওহরলাল গান্ধীজীকে লেখেন যে,

"ইনি তো সেই নলিনী সরকার যিনি ভারত সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন যখন আমরা কারারুদ্ধ ছিলাম। কলকাতা কর্পোরেশনের মতই লজ্জাজনক চেহারার বৃহদাকার সংস্করণেই কি কংগ্রেস পরিণত হতে চলেছে?"

গান্ধীজী জবাব দেন নি, তিনি চোখ বুজেই রইলেন।

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই তবে ধনপতি গোষ্ঠীর সঙ্গে গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ যোগ লক্ষ্য না করে পারা যায় না। কংগ্রেসের সমর্থক ধনপতি গোষ্ঠীর নেতা শেঠ ঘনশ্যাম দাস বিড়লার সঙ্গে পরামর্শ না করে তিনি কোন কাজ করতেন না।

এ সবেরই শেষ পরিণতি নেতার আসন থেকে তাঁর অপসারণ এবং জনগণের

সংগ্রাম ও আত্মত্যাগকে অগ্রাহ্য করে কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের সব সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে শেষপর্যন্ত নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়া।

ভারত বিভাগের জন্য ব্রিটিশ সরকার দায়ী নয় বলে গান্ধীজী যে মন্তব্য করেছিলেন তার সুযোগ গ্রহণ করে "স্বদেশী" বড়লাট মাউন্টব্যাটেন সম্পর্কে বলেছিলেন যে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যে "হত্যালীলা চলছে তা ব্রিটিশ শক্তিরই প্রশস্তি এবং ব্রিটিশ আশ্রয়ের প্রতি বিশ্বাস। এটা (হত্যালীলা) ব্রিটিশ রক্ষণার অবসানের যুগ।"

নির্লজ্জ ও আত্মম্ভরী মাউন্টব্যাটেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভেদনীতিকেই অস্বীকার করে এমন কথা বলতে পেরেছিলেন গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতাদের দৌলতে।

গান্ধীজী চেয়েছিলেন অহিংসা ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে, কিন্তু স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল যুদ্ধ পরবর্তী দেশব্যাপী গণ-বিক্ষোভ, নৌ-বিদ্রোহ এবং ভারতীয় ফৌজের মধ্যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহী মনোভাবের ফলে। তবু বিশাল ভারতবর্ষে যে গণ-জাগরণ গান্ধীজী ঘটিয়েছিলেন তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সারা দেশে লক্ষ লক্ষ নরনারী গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল বলেই পরবর্তীকালের ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ সম্ভব হয়েছিল। তাই 'জাতির পিতা' অভিধা অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য।

তবু যে বিরাট ব্যর্থতা তাঁর শেষ জীবনকে বিষণ্ণ ও দুর্বহ করে তুলেছিল (যিনি একদিন শতাধিক বৎসর বাঁচতে চেয়েছিলেন তিনি আর বেশিদিন বাঁচতে চাননি) কারণ বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় :

গান্ধীজী পৃথিবীর ইতিহাসের এক বৃহত্তম ট্র্যাজিক নায়ক, এক শোকাবহ ব্যর্থতার প্রতীক। সামাজিক ক্রমবিবর্তনের সমস্ত নিয়ম অগ্রাহ্য করে তিনি চেয়েছিলেন শ্রেণী নির্বিশেষে মানুষে মানুষে প্রেম, প্রীতি ও গভীর মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে, পৃথিবীতে সমস্ত বিরোধ, সংঘর্ষ ও যুদ্ধের অবসান ঘটাতে। তিনি চেয়েছিলেন প্রেম ও প্রীতির মাধ্যমে পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি চেয়েছিলেন 'রামরাজ্য' অর্থাৎ এমন এক আদর্শ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে যেখানে রাজায়-প্রজায়, শ্রমিকে-মালিকে, কৃষক-জমিদারের কোন বিরোধ থাকবে না। সকলেই সমান অধিকার ভোগ করবে। রাজা, মালিক ও জমিদার জনগণের অছিরূপে জনগণের কল্যাণে তাদের সমস্ত সম্পদ ব্যবহার করবেন।

এই নব্য নীতি সামনে রেখেই তিনি সত্য, অহিংসা ও ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করেছিলেন। আর তাই সেই বাণীকে বাস্তবে রূপায়িত করার আপ্রাণ চেষ্টায় বার বার তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করতেও কুণ্ঠিত হননি।

বিষয়টি সোভিয়েত পণ্ডিত উলিয়ানভস্কি বেশ পরিষ্কারভাবেই বুঝিয়ে বলেছেন। তিনি বলেছেন, গান্ধীজীর মতবাদের সঙ্গে বুর্জোয়া বা ধনিকশ্রেণীর মতবাদের মিল ছিল না, কিন্তু উভয়পক্ষই চেয়েছিলেন স্বাধীনতা লাভ করতে। আশু লক্ষ্য স্বাধীনতা অর্জন, তারপর আর যা কিছুর করার দরকার তা ভেবে দেখা যাবে। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ ও অ-সহযোগ আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারকে নতজানু করবে এই ধারণা নিয়েই গান্ধীজী ও ভারতীয় ধনিকশ্রেণী গান্ধীজীকে নেতারূপে মেনে নিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু আপসহীন সংগ্রামে যে বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল সেই সম্ভাবনাকে রূপায়িত করতে গান্ধীজী চাননি, ধনিকশ্রেণীও চায় নি। এ ক্ষেত্রে মতের মিল থাকার জন্যই গান্ধীজী শেঠজীদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন।

জনগণ তখন অশান্ত, বিক্ষুব্ধ। নেতার ইঙ্গিতে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উন্মুখ।

"জাতীয় বুর্জোয়ার সঙ্গে গান্ধীজী ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছিলেন—যে জাতীয় বুর্জোয়া তখন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল। জাতীয় কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের ধারণা এবং উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালানোর জন্য তাঁর আহ্বান সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে ধনিকশ্রেণীর যোগকে ঘনিষ্ঠতর করে তুলেছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর অভিন্ন আকাঙ্ক্ষাই মূলত মধ্যবিত্ত ও কল্পনাশ্রয়ী (ইউটোপিয়ান) গান্ধী এবং জাতীয় কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতাদের মধ্যে ৩০ বছরের মৈত্রীবন্ধন ঘটিয়েছিল। বুর্জোয়া নেতাদের লক্ষ্য ছিল নিজেদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার উদ্দেশ্যে বিদেশী শাসন থেকে অব্যাহতি লাভ করা।" (উলিয়ানভস্কি)

এরপর উলিয়ানভস্কি সঠিকভাবেই বলেছেন যে গান্ধীজীর মত নেতার প্রয়োজন ছিল কংগ্রেসের, আবার গান্ধীজীও কংগ্রেসের মত একটি রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, শক্তিশালী, অপ্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু উভয় পক্ষই জানতেন যে এই মৈত্রী সাময়িক তাই সংগ্রামের

শেষ পর্বে স্বাধীনতা যখন আসন্ন তখন গান্ধীজী ও কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতাদের মধ্যে বিরোধ নাটকীয়ভাবে প্রবল হতে শুরু করল।

উলিয়ানভস্কি দেখিয়েছেন যে, গান্ধীজীর চিন্তাধারায় রক্ষণশীলতা থাকলেও তিনি স্বাধীনতালাভের পর আরও এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, জনগণের মধ্যে অসাম্য দূর করতে চেয়েছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা যতই অবৈজ্ঞানিক ও অনৈতিহাসিকই হোক না কেন, তাঁর রামরাজ্যের ধারণা যতই মধ্যবিত্ত ও কৃষকসুলভ হোক না কেন তাঁর পন্থা অনুসরণ করে স্বাধীনতালাভের পর উল্লিখিত লক্ষ্যগুলির জন্য প্রকাশ্যে প্রবল সংগ্রাম চালালে একটা বড় রকমের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হত বলে উলিয়ানভস্কি মনে করেন। পুঁজিপতি শিরোমণিরা তাতে বাধা দিয়েছিল এবং গান্ধীজী তাদের অহংবোধকে ধিক্কার দিলেও তাদের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করেন নি এবং করতেও পারতেন কিনা সন্দেহ।

সোভিয়েত পণ্ডিত উলিয়ানভস্কি যা বলেছেন তা সবই ঠিক এবং পরে তাঁর প্রবন্ধে গান্ধীজীর চিন্তাধারায় নানা অসঙ্গতি ও স্ববিরোধিতার উল্লেখ করে তিনি সঠিকভাবেই গান্ধীজীর গণতান্ত্রিক ভাবধারাকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও বিশ্লেষণের সব চেয়ে বড় ত্রুটি হল তিনি গান্ধীজী ও বুর্জোয়া নেতৃত্বের মধ্যে ত্রিশ বছরের মৈত্রী কিভাবে গান্ধীজীকে তাঁর আদর্শচ্যুত করেছিল, কিভাবে তিনি বুর্জোয়া রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত হয়েছিলেন তা একবারও আলোচনা করেন নি।

স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে ভারতীয় ধনিকশ্রেণী ও গান্ধীজীর মতের মিল থাকার জন্যই ধনিকশ্রেণী গান্ধীজীর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল—এ কথা উলিয়ানভস্কি নিজেই বলেছেন। এর ফলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা পৃথিবীর কোন দেশের মুক্তি সংগ্রামেই লক্ষ্য করা যায় না। অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষে কৃষি বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবের মেরুদণ্ড হতে পারেনি—লিখেছেন উলিয়ানভস্কি। তিনি ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের বৈশিষ্ট্যকেই এর কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। গান্ধীজী ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত প্রশ্নটিকে সমগ্র আন্দোলনের যুগে তুলতেই দেন নি, বরং কৃষকদের অসন্তোষ ও দাবিগুলিকে স্বাধীনতা লাভের আগে নয় স্বাধীনতা লাভের পর বিবেচনা করা হবে বলে তিনি কৃষকদের শান্ত রেখেছিলেন।

উলিয়ানভস্কি বলেছেন, "জনগণের উপর গান্ধীজীর অসামান্য প্রভাব এঃ

ব্যাপারে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বুর্জোয়া নেতৃত্বকে বিপুলভাবে সাহায্য করেছিল।" 'রামরাজ্য' ও 'সর্বোদয়'—এই স্বপ্নিল দাবি জনগণকে বিভ্রান্ত করেছিল।

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীই গান্ধীজীকে তাদের কাজে লাগিয়েছিল সার্থকভাবে, আর গান্ধীজী শুধু তাদের গণ-আন্দোলনে সামিল করে এবং জনগণের সকল অংশকে আন্দোলনের মধ্যে টেনে এনে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। ভারতবর্ষের মানুষের চিরাচরিত ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গান্ধীজী তাঁর যে মতবাত প্রচার করেন তা স্বাভাবিকভাবেই সমগ্র জনগণকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। আর ভারতীয় ধনিকশ্রেণী ঠিক এইটিই চেয়েছিল।

কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় গান্ধীজী একাধিকবার নেতার আসন ত্যাগ করেন, কিন্তু তার পরই তিনি আবার ফিরে গিয়েছেন সেই নেতার আসেন। এমনকি যখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতীয় ধনিকশ্রেণী আর তাঁকে নেতা হিসাবে মানতে চাচ্ছে না, তখনও তিনি কংগ্রেস ছাড়তে পারেন নি।

দেশ বিভাগ গান্ধীজী চাননি। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ তাঁকে ব্যথিত ও পীড়িত করেছিল তবু শেষ পর্যন্ত তিনি এই বিভাগ অনুমোদন করেছিলেন। দেশবিভাগের বিরুদ্ধে তীব্র মনোভাব ব্যক্ত করেও তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, আর আন্দোলন করার ইচ্ছা বা ক্ষমতা তাঁর নেই। পরেও তিনি বুঝেছিলেন যে, কংগ্রেসের নেতারা তাঁকে চান না, ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর কাছে তাঁর প্রয়োজন অনেক আগেই ফুরিয়ে গেছে এবং জনগণও আর তাঁর ক্ষমতার উপর আস্থা রাখতে পারছে না। কংগ্রেসের প্রতি এবং সত্যাগ্রহের প্রতি মোহই গান্ধীজীর ব্যর্থতার কারণ—এমন কথা বলেছেন অশীন দাশগুপ্ত। তিনি লিখেছেন:

"অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টাতেই এই মোহের উৎপত্তি।...গান্ধীর ধর্মের মধ্যেই গান্ধীর ব্যর্থতা লেখা ছিল।"

(জড়ভরতের হরিণ: গান্ধী ও কংগ্রেস—দেশ, কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যা, পৃঃ ৫৫)

ব্যর্থতার শিকার হয়েই বিষণ্ণ ও নিঃসঙ্গ গান্ধীজী শহীদের মৃত্যুবরণ করলেন তাঁরই এক দেশবাসীর হাতে।

তাঁর নাম আজও মানুষ করে কিন্তু তা ভারক্রান্ত চিত্তে নয়, ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে নয়। স্মরণ করে বিশেষ বিশেষ দিনে নিতান্তই আনুষ্ঠানিকভাবে, আর তাঁকে স্মরণ করে রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃবৃন্দ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে।

প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজী আজ বিস্মৃত। তাঁর মতবাদ যারা সমর্থন করেন তারা আজ কার্যত জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, অসহায় তাই দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক, ধর্মগত, সামাজিক ও জাতিগত বিরোধের আগুন জ্বলছে তা নেভানোর কোন চেষ্টা তারা করছেন না বা করতে পারছেন না। কিছু আদর্শবাদী মানুষ যে চেষ্টা করছেন তা আশানুরূপ সাড়া জাগাচ্ছে না। যে গুজরাটে গান্ধীজীর জন্ম, যে গুজরাটে একদিন তাঁর বিপুল সংখ্যক সমর্থক ছিল 'তানিয়া' সম্প্রদায়ের মধ্যে তারা আজ গান্ধীজীর মত ও পথ বর্জন করে সংকীর্ণ মনোভাবেরই পরিচয় দিচ্ছে। আর তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গুজরাটেই গান্ধীবাদের চিতাশয্যা রচিত হচ্ছে।

উলিয়ানভস্কির মত পণ্ডিত ব্যক্তিরা এসব ঘটনা লক্ষ্য করছেন না বা উপেক্ষা করছেন অথবা আশা করছেন যে, শেষ পর্যন্ত সব ঠিক হয়ে যাবে।

সত্য বলতে গান্ধীজী কি বুঝেছিলেন তা আজ বিতর্কের বিষয় হলেও তাঁর অহিংসার আদর্শ ও তা রূপায়ণের জন্য তাঁর সংগ্রাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু আজকের শ্রেণী বিভক্ত পুঁজিবাদী সমাজে এবং ভারতের পর যে সব সদ্য স্বাধীন দেশ সেই পুঁজিবাদী পথে এগিয়ে চলেছে সেইসব দেশে গান্ধীজীর অহিংসা ও প্রেমের বাণী কখনই ফলপ্রসূ হবে না।

গান্ধীজী বলেছিলেন: "প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে অনেক তন্ত্রী আছে। আমরা যদি জানি যে ঠিক তার কোনটিতে মূর্ছনা তুলতে হয় তা হলেই আমরা সঙ্গীত সৃষ্টি করতে পারব।"

না, যারা শোষকশ্রেণী, যারা সাম্রাজ্যবাদী, যারা জাতিবর্ণদ্বেষী তাদের হৃদয়ে প্রেমের মূর্ছনা জাগানোর মত কোন তন্ত্রী নেই, থাকতে পারে না। এটা রবীন্দ্রনাথ জানতেন বলেই তিনি বলে গেছেন "মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ।" সাধারণ মানুষ, জনগণ আজ যত বিভ্রান্তই হোক, যত বিষণ্ণ হোক একদিন না একদিন তারা পথ খুঁজে পাবে, তাদের উপর বিশ্বাস রাখতেই হবে। রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি যে কত সত্য দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদের

বিরুদ্ধে, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষের অবিরাম সংগ্রাম তা প্রমাণ করেছে। এই সংগ্রামের রূপ বৈচিত্র্য আছে—নিরুপদ্রব প্রতিরোধ থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম কিছুই বাদ যাচ্ছে না। আধুনিক জীবনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে সমাজের ক্রমবির্তনের নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে গান্ধীজীর অহিংস স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। জনগণ হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করতে চায় না। কিন্তু জনগণের প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শোষক-শ্রেণীর নির্মম আক্রমণের সম্মুখীন হয়। তার জবাবে জনগণকে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। পালটা আঘাতে শোষকশ্রেণীকে পরাভূত করতে হয়। *কিন্তু একটি পরিষ্কার ও স্পষ্ট আদর্শ সামনে রেখেই পাল্টা* আক্রমণ চালাতে হয় তা না হলে আবির্ভূত হয় নতুন এক শ্রেণীর যা আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে বার বার লক্ষ্য করেছি।

পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজ-তন্ত্রের লক্ষ্য সামনে রেখে কি করে শোষিত ও নির্যাতিত জনগণ জয়লাভ করে তা অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহা-বিপ্লব আমাদের শিখিয়েছে। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াতেই অহিংসা ও প্রেমের বাণী বাস্তবরূপ লাভ করে ও করেছে। সেই দুনিয়ায় মানুষে মানুষে বিরোধ নেই, সাম্প্রদায়িক, বর্ণগত বা জাতিগত হানাহানি নেই। গান্ধীজীর মূল আদর্শ একমাত্র শ্রেণীহীন সমাজেই বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে।

(২)

ব্যাংককে অনুষ্ঠিত প্রবাসী ভারতীয়দের আমন্ত্রণে সুভাষচন্দ্র সাড়া দিলেও ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসের আগে তিনি সিঙ্গাপুরে পৌছুতে পারলেন না। অনেকে মনে করেন যে, ১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্লবকালে অথবা তার কিছু পরেও যদি সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে পৌছুতে পারতেন তা হলে আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষে জাপানের সহায়তায় ভারতবর্ষ ব্রিটেনের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হত। এ রকম ধারণা অবশ্য তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের অন্তর্বিরোধ সম্পর্কে অজ্ঞতারই প্রমাণ। ককেশাসে সোভিয়েত ব্যূহ ভেদ করে নাৎসী বাহিনী ভারতবর্ষে জাপ বাহিনীর সঙ্গে হাত মেলানোর ও ভারত ভাগাভাগির গোপন চুক্তি করেছিল বটে, কিন্তু গভীর

গোপনে নাৎসী সামরিক কর্তৃপক্ষ ঠিক করেছিলেন যে, ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে পারলে তারা চুক্তি অগ্রাহ্য করে একেবারে ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে উপস্থিত হবেন এবং সিংহল (শ্রীলংকা) প্রভৃতি জয় করবেন।

অপরদিকে জাপ সামরিক কর্তৃপক্ষ স্থির করেছিলেন যে তারা পারস্য উপসাগর অঞ্চলে প্রবেশ করে তৈলক্ষেত্রগুলি দখল করে নেবেন।

ককেশাসে নাৎসী বাহিনী সোভিয়েত ব্যূহ ভেদ করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করলে কী ভয়ঙ্কর দুর্দিন ঘনিয়ে আসত সে সম্বন্ধে সেদিন প্রাচ্যের অধিকাংশ মানুষের কোন ধারণাই ছিল না, থাকবার কথাও নয়। কারণ জাপ-জার্মান গোপন চুক্তির কথাও যেমন কেউ জানত না, জাপ-জার্মান অন্তর্বিরোধের কথাও কেউ ভাবেনি।

সুভাষচন্দ্র ১৯৪২ সালের আগস্ট প্রস্তাবে খুশি হয়ে বলেছিলেন যে এবার ভারতবর্ষের জাতীয় সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হবে। তখনও তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জাপান, জার্মানী ও ইতালি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করবে, তবে "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে মুখ্যতঃ ভারতীয়দেরই।" তখনও ফ্যাসিবাদের ভয়ঙ্কর রূপটি তিনি ধরতে পারেন নি, বুঝতে পারেন নি যে, নাৎসীদের সাফল্য সুদীর্ঘকালের জন্য ভারতবর্ষের শুধু নয় সারা পৃথিবীর সমস্ত পরাধীন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দেবে। তিনটি ফ্যাসিস্ট শক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষ তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে এই অলীক স্বপ্ন তখন সুভাষচন্দ্র দেখছিলেন। এ স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে যেতে অচির-কালের মধ্যে যদি নাৎসী বাহিনী ভারতে প্রবেশ করতে পারত। সুভাষচন্দ্র কোন পক্ষেরই হাতের পুতুল হতে চাইতেন না, ফলে তাঁকে বন্দী হতে আর না হয় ফ্যাসিস্ট ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হত।

রাসবিহারী বসু ও অন্যান্য ভারতীয় নেতারা জাপানের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে ভারতীয় মুক্তিবাহিনী গঠনের কাজ আগেই শুরু করে দিয়েছিলেন। কাজেই সুভাষচন্দ্র সক্রিয় ভাবে ভারতবর্ষ অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে বিলম্ব করলেন না। জাপানের সহায়তায় এবং প্রবাসী ভারতীয়দের বিপুল অর্থ সাহায্যে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হল। ৬০ হাজার ভারতীয় সৈন্য জাপানের হাতে বন্দী হয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই মুক্তিলাভ করে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিলেন। এছাড়া প্রবাসী ভারতীয়রাও বহু সংখ্যায় ফৌজে ও

অন্যান্য সামরিক কাজে অংশগ্রহণ করেন। এদিকে মস্কো ও লেনিনগ্রাদ দখলের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ফলে নাৎসীরা যে অত্যন্ত সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল সুভাষচন্দ্র সে সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। জাপানও তখন নাৎসী বাহিনীর কোন বিপর্যয় ঘটতে পারে বলে ভাবতে পারে নি।

নাৎসী জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানার উদ্দেশ্যে জার্মান-সোভিয়েত রণাঙ্গনে সমাবেশ করেছিল ৬০ লক্ষ সৈন্য ও অফিসার (এদের মধ্যে মাত্র ৮ লক্ষ সৈন্য ছিল তাঁবেদার দেশগুলির)। অর্থাৎ নাৎসী বাহিনীর ৭৬ শতাংশকেই সোভিয়েতের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করা হয়। এই বিশাল চমূর কাছে ছিল ৩,২৭০টি ট্যাঙ্ক, ৪৩ হাজার কামান ও মর্টার এবং ৩,৪০০ যুদ্ধ বিমান।

এই বিশাল বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে সোভিয়েত বাহিনী পিছু হঠতে বাধ্য হল, নদ নদী পার হয়ে নাৎসী বাহিনী সমগ্র ইয়োরোপীয় রুশিয়াকে বেষ্টন করার উদ্দেশ্যে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হল। একটি বাহিনী এগিয়ে চলল স্তালিনগ্রাদের দিকে, আরেকটি এগিয়ে গেল ককেশাসে সোভিয়েত ব্যূহ ভেদ করে এশিয়ার দিকে অভিযান শুরু করার জন্য। স্বয়ং হিটলার প্রাচ্য অভিযানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সোভিয়েত বাহিনী ও জনগণের প্রচণ্ড প্রতিরোধের ফলে নাৎসী বাহিনী ককেশাসের সানুদেশেই রয়ে গেল, সোভিয়েত ব্যূহ ভেদ করা সম্ভব হল না। এক লক্ষ নাৎসী সৈন্য নিহত হল প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে। স্তালিনগ্রাদে পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম যুদ্ধে নাৎসী বাহিনীর শিরদাঁড়া ভেঙে গেল, ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হল সোভিয়েত বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ। যুদ্ধের মোড় পুরোপুরি ভাবেই ঘুরে গেল। পৃথিবীর সামনে যে সংকট দেখা দিয়েছিল তা কেটে গেল।

সুভাষচন্দ্র যখন তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে অভিযান শুরু করলেন তখন জাপান নিজেই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে নিরপেক্ষতা চুক্তি সম্পাদন করে তার আড়ালে জাপান সর্বতোভাবেই নাৎসী জার্মানীকে সাহায্য করেছিল। জার্মানী বিপন্ন হয়েছে দেখে জাপ সামরিক কর্তৃপক্ষ সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ কবার জন্য প্রস্তুত হলেন, ফলে বিশাল কোয়াটুং বাহিনীকে বা তার কোন অংশকে ভারত অভিযানের জন্য স্থানান্তর করা সম্ভব হল না।

এই অবস্থার মধ্যেও সুভাষচন্দ্র তাঁর অভিযান পরিচালনা বন্ধ রাখেন নি। ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হয় আন্দামানের দু'টি দ্বীপে। নিজেদের শক্তির উপর ভরসা রেখে এগিয়ে যেতে হবে এই ছিল সুভাষচন্দ্রের সংকল্প। প্রথমদিকে বেশ সাফল্য অর্জিত হয়েছিল।

১৯৪৪ সালের ১৯শে মার্চ আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের মাটিতে পা দিল।

ভারত সরকার বিচলিত ও উদ্বিগ্ন। আজাদ হিন্দ ফৌজ অগ্রসর হতে পারলে অভ্যন্তরীণ অভ্যুত্থান ঘটতে পারে এই আশঙ্কা ভারত সরকারের মনে জেগেছিল। তাই ভারত সরকার আবার কংগ্রেসের দিকে তাকাল। ১৯৪২ সালের ২১শে জুন 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধীজী যে মন্তব্য করেছিলেন তা তাদের মনে পড়ল।

গান্ধীজী লিখেছিলেন: "অক্ষশক্তির মিত্রজনোচিত কথাবার্তার উপর আমি কখনও গুরুত্ব দিই নি। তারা যদি ভারতে উপস্থিত হতে পারে, তা'হলে তারা ভারতের মুক্তিদাতা রূপে আসবে না, আসবে লুটের বখরা নিতে। সুতরাং সুভাষবাবুর নীতি সমর্থন করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।"

১৯৪৪ সালের মে মাসে গান্ধীজীর ম্যালেরিয়া হয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজ কোহিমা দখল করে পতাকা উত্তোলন করার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার 'স্বাস্থ্যের কারণে' গান্ধীজীকে মুক্তি দিল। ১৯৪৪ সালের ৬ই মে গান্ধীজী মুক্তিলাভ করেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের কতকাংশ দখল করে আরও অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু অভ্যন্তরীণ অভ্যুত্থানের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সমর্থক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন: "সুভাষবাবু আশা করেছিলেন, তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে বাইরে থেকে ভারত আক্রমণ করলে, ভারতের জনগণ বিশেষত তাঁর ভক্ত লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবে, একটা বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুত্থান ঘটবে, এবং এইভাবে তাঁর বিপ্লবী প্রচেষ্টা সফল হবে। কিন্তু বৈপ্লবিক সংগঠনও ছিল না, আর আগস্ট বিপ্লবের দেশজোড়া অসংগঠিত লড়াইয়ে প্রচণ্ড মার খেয়ে জনগণ তখন হাঁফাচ্ছিল। তার উপর গান্ধী-কংগ্রেস, বিপ্লবী দাদারা, কমিউনিস্ট দল সকলে একযোগে তাঁর বিরুদ্ধে দেশজোড়া প্রচার চালাচ্ছিল। তারও ওপর ছিল তাঁর আজগুবী ঘোলা আইডিয়া, গান্ধী-কংগ্রেসের উপর

ভক্তি এবং তার প্রচার, যার নিদর্শন আজাদ হিন্দ ফৌজের নাম নেহরু ব্রিগেড, আজাদ ব্রিগেড প্রভৃতি।"

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম বক্তব্যগুলি সঠিক হলেও পরের বক্তব্যগুলিতে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকৃত তথ্যাদি সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথমত, গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে সুভাষচন্দ্রের গণ-সংগ্রামের পথ গ্রহণ করলেও কখনও ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গকে সমর্থন করে নি। এই কারণেই জাপানের সাহায্যে সুভাষচন্দ্রের ভারত আক্রমণের নীতিও কংগ্রেস সমর্থন করতে পারেনি। আর সুভাষচন্দ্র ভারতের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর যে অভিজ্ঞতা ছিল তার ভিত্তিতেই বুঝেছিলেন যে, গান্ধীজী ও কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে তিনি কিছু করতে পারবেন না, তাই তিনি নেহরু ব্রিগেড প্রভৃতি নাম দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিভিন্ন বাহিনী গঠন করেন। আর বিপ্লবী দাদারা বলতে নিশ্চয়ই 'যুগান্তর' দলের নেতাদের কথা বলেছেন, কিন্তু তখন তো যুগান্তর দল গান্ধীজীর নেতৃত্ব পুরোপুরি মেনে নিয়ে কংগ্রেসে লীন হয়ে গেছে।

তা'ছাড়া সুভাষচন্দ্র জাপানী ফৌজসহ আসছেন বলে যে 'অপপ্রচারের উল্লেখ নারায়ণচন্দ্র করেছেন তা' আদৌ 'অপপ্রচার' ছিল না। তৎকালীন অবস্থায় তারই সম্ভাবনা ছিল বেশি। কিন্তু ককেশাসে নাৎসীবাহিনীর ব্যর্থতা এবং জাপবাহিনী বিরাট অঞ্চলে ছড়িয়ে থেকে ক্রমাগত প্রচণ্ড মার্কিন আক্রমণের সম্মুখীন হতে থাকায় জাপানের পক্ষে সৈন্য দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে সাহায্য করা এবং শেষ পর্যন্ত নিজেদের আধিপত্য কায়েম করা সম্ভব হয় নি। প্রকৃতপক্ষে জাপান তখন নিজেই আত্মরক্ষার যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছে। নইলে যা ঘটত তার কথা আগেই বলা হয়েছে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের যে আক্রমণকে ব্রিটিশ সেনাপতি 'সাময়িক আক্রমণ' বলে অভিহিত করেছিলেন সেই আক্রমণ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটালো। তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনা করে বড়লাট প্রধান সেনাপতি ও বিভিন্ন প্রদেশের লাটসাহেবরা কংগ্রেসের সঙ্গে দ্রুত একটা আপস-রফা করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করলেন। কিন্তু জবরদস্ত সাম্রাজ্যবাদী চার্চিল সাহেব তাদের অভিমত অগ্রাহ্য করলেন ফলে খাস ব্রিটেনেই চার্চিল বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে উঠল।

অন্যদিকে হিটলারের পতন আসন্ন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জাপানের সংকট

ঘনিয়ে অসাছে দেখে জাপ অধিকৃত দেশগুলিতে মুক্তিকামী জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হল। বর্মা, মালয়, ফিলিপাইনস প্রভৃতি দেশে ইঙ্গ-মার্কিন সহায়তায় জাপবিরোধী সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠল।

এই অবস্থায় জাপানের সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ল। জাপানের সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজেরও সংকট ঘনিয়ে এল।

কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করলেও রসদহীন আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষে যুদ্ধ চালানো ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। ফৌজের মনোবলও ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকজন অফিসার ইংরেজ পক্ষে যোগ দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রকৃত অবস্থা ও সামরিক অবস্থানগুলি তাদের জানিয়ে দিল। ১৯৪৪ সালের ১০ই জুলাই ইম্ফল রণাঙ্গনে পরাজিত আজাদ হিন্দ ফৌজ পিছু হটার আদেশ পেল। সামরিক বিপর্যয় আর রোধ করা গেল না।

এ দিকে ভারতবর্ষে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস আবার সরকারের সঙ্গে আপস আলোচনা শুরু করে দিয়েছে।

১৯৪৫ সালের ৫ই মে বার্লিনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপে যুদ্ধের অবসান ঘটল। ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত পরাজয় সমগ্র পৃথিবীতে এনে দিল স্বস্তি। জাপ সাম্রাজ্যবাদীদের দিনও ফুরিয়ে এল। ১৯৪৬ সালের ৫ই এপ্রিল সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের সঙ্গে সম্পাদিত নিরপেক্ষতা চুক্তি বাতিল করে দিল। জাপান তখনও বিপুল সামরিক শক্তির অধিকারী। মিত্র পক্ষের শত্রুরূপে জয়লাভের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য সোভিয়েত প্রস্তুত হয়েই ছিল। তবু জাপানকে আত্মসমর্পণ করে যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ব্রিটেন এক যুক্ত বিবৃতিতে আহ্বান জানাল। জাপ সাম্রাজ্যবাদীরা বিপদ আসন্ন বুঝে তখন নতুন খেলায় মেতেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের সঙ্গে একটা আপসরফা করার মতলব জাপ সাম্রাজ্যবাদীরা ভেঁজেছিল। তাদের বিপুল সামরিক শক্তির উপর ভরসা রেখেই জাপ সাম্রাজ্যবাদীরা নতুন পরিকল্পনা রচনা করে।

১৯৪৫ সালের ৮ই আগস্ট সোভিয়েত সরকার মস্কোস্থিত জাপ রাষ্ট্রদূতকে জানিয়ে দেয় যে, পটসডাম ঘোষণা অনুযায়ী তারা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ঘোষণা করতে চলেছে। জার্মানীর বিপর্যয় স্মরণ করে জাপান যেন বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করে নইলে যুদ্ধ অনিবার্য।

৯ই আগস্ট সোভিয়েত সরকার জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। মঙ্গোলিয়া সরকার সোভিয়েতের সঙ্গে একমত হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়।

জাপানের মতলব সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র কি কিছু জানতেন? বোধহয় না। জাপানের সঙ্গে তাঁর যতই 'হৃদ্যতাপূর্ণ' সম্পর্ক থাক না কেন তিনি যে আর কোন সাহায্য পাবেন না তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজকে রেঙ্গুন থেকে পশ্চাদপসণের আদেশ দেওয়া হয়। শেষ ঘাঁটি থাইল্যাণ্ডে।

ইতিমধ্যে ব্রিটেনে ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে সাধারণ নির্বাচনে চার্চিল মন্ত্রিসভার পতন ঘটল। লেবার পার্টি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল। প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি ভারতের সঙ্গে একটা আপস-মীমাংসার জন্য নতুন করে উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।

১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে রেঙ্গুন থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজকে পিছু হটে ব্যাংককে ঘাঁটি স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়। এটাই আজাদ হিন্দ ফৌজের শেষ ঘাঁটি।

১৯৪৫ সালের ২১শে মে ব্যাংককে সুভাষচন্দ্র তাঁর এক বক্তৃতায় বললেন:

"বন্ধুগণ, আর একবার আমি ইয়োরোপের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করতে চাই।

এক সময় জার্মানবাহিনী রুশিয়ার ভিতরে স্তালিনগ্রাদ পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল। আমি হবাক হয়ে ভাবি ক'জন তখন ছিলেন যাঁরা কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে, স্রোত উল্টো বইবে, একদিন সোভিয়েতবাহিনী পৌছুবে বার্লিনে। জার্মানীর পরাজয় এ যুদ্ধের এক আশ্চর্য ঘটনা।

এখন এটা পরিষ্কার যে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধের লক্ষ্য ইঙ্গ-মার্কিনদের লক্ষ্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা যদিও উভয়েরই অভিন্ন শত্রু ছিল জার্মানী।"

সুভাষচন্দ্র বড় বিলম্বে বুঝেছিলেন, তা নইলে ভারতবর্ষ একজন নির্ভীক, একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিককে হারাতো না।

জুন মাসের গোড়ার দিকে ব্যাংককে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এক চায়ের আসরে সুভাষচন্দ্রকে আশ্বাস দিয়ে বলা হয় যে জাপান যদি যুদ্ধে হেরে যায়

তাহলে থাইল্যাণ্ডে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন। সুভাষচন্দ্রের অন্যতম বিশ্বস্ত সঙ্গী দেবনাথ দাস একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহারে সুভাষচন্দ্রকে আত্মগোপন করে রাখার ব্যবস্থাও করেছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র ব্যাংককে থাকার প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। তখনও কি তিনি আশা করেছিলেন যে জাপান জিততে না পারলেও একটা মিটমাট করে তার স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে পারবে?

এখানে একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলা দরকার। তা হল এই যে, জাপান কোন সময়েই খুব বেশী কিছু দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজকে সাহায্য করেনি, যদিও ব্যাংকক সম্মেলনে প্রেরিত জাপ প্রধানমন্ত্রী তোজোর বার্তায় বলা হয়েছিল যে, জাপ সরকার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সব রকম সাহায্য দেবে।

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের গবেষক ডি. ভাইদেখান[১] লিখেছেন··· "সুভাষচন্দ্র বসুর অনুগামীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে জাপানী ও জার্মান সৈন্যাধ্যক্ষদের গভীর সন্দেহ ছিল। ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর (আই এন এ) সৈন্যাধ্যক্ষদের ভারতে স্বাধীনতার দাবি এবং তার জন্য সংগ্রাম, জার্মান দেশে সংগঠিত 'ভারতীয় মুক্তিবাহিনীর' সোভিয়েত রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অসম্মতি, বর্মার জাতীয় সৈন্যদের এবং ফ্যাসি-বিরোধী গণ-সংগঠনের সৈন্যদের বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয় বাহিনীকে প্রয়োগের বিরুদ্ধে সুভাষ বসুর অসম্মতি প্রভৃতি থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, সুভাষ বসুর পরিচালিত বাহিনীর দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে প্রকৃতপক্ষে জাপানী ও নাৎসীদের আজ্ঞাবাহী হিসাবে পরিচালিত হওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল।"

এই সত্যটি বর্তমান প্রবন্ধের লেখক তদানীন্তন জার্মানীর বৈদেশিক দপ্তরের বিভিন্ন নথিপত্রের মাধ্যমে আবিষ্কার করেছেন।

(মূল জার্মান থেকে অনূদিত—"ভারত ও সমাজতান্ত্রিক জি. ডি. আর, ১০ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা)

এই প্রবন্ধে বিভিন্ন সময়ে সুভাষচন্দ্র বসুর অভিমতগুলি স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন যে জার্মানী, জাপান ও ইতালি সাহায্য করবে কিন্তু ভারতের মুক্তি আনতে হবে মুখ্যত ভারতীয়দের নিজেদের চেষ্টায়।

যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে 'স্বাধীন

১। জি ডি আর এবং পররাষ্ট্রবিষয়ক পরিষদের দঃ পূঃ এশিয়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত।

ভারতবর্ষের ভারতীয় জনগণই দেশের ও স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ভবিতব্য নির্ধারণ করবে।'

সুভাষচন্দ্রের এইসব উক্তি অবশ্যই ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের চিত্তবিনোদন করে নি, তারা সুভাষচন্দ্রের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল।

প্রথম দিকে আজাদ হিন্দ ফৌজকে জাপান যে সাহায্য দেয় সে সাহায্যের পরিমাণ আর বাড়েনি। আজাদ হিন্দ ফৌজকে তার নিজস্ব নৌ ও বিমানবাহিনী গড়ে তুলতে দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে জাপ নৌ ও বিমানবাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজকে তেমন কোন সাহায্য করেনি। কারণটা বুঝতে কষ্ট হয় না, জাপান ও নাৎসী জার্মানী উভয়েই চেয়েছিল সুভাষচন্দ্রের সাহায্যে তাদের নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তাদের হাতের পুতুল হতে রাজী হন নি।

স্তালিনগ্রাদ ও ককেশাসের দিকে নাৎসীবাহিনী অগ্রসর হওয়ার সময় নাৎসী জার্মানী ও জাপানের মধ্যে ভারতবর্ষ ও নিকট প্রাচ্য ভাগাভাগির যে গোপন চুক্তি হয় তারপর থেকে জাপান খুবই তৎপর হয়ে ওঠে। নাৎসী জার্মানীকে ভারতবর্ষ দখল করতে দেওয়ার বাসনা জাপানের ছিল না। অন্যদিকে হিটলারের পরিকল্পনা ছিল সুদূরপ্রসারী—নাৎসীরা চেয়েছিল আফগানিস্তান, ইরান, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া ও এশিয়ার অন্যান্য দেশ অধিকার করতে। হিটলারের ঘনিষ্ঠ নাৎসী নায়ক এস এস ওবেরগ্রুপ্পেন ফুয়েবার ডানটের শেলেনবার্গ তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে ৩০-এর দশকের শেষ দিকে হিটলার নিউ গিনি পর্যন্ত সমগ্র এশিয়া দখলের স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

যাই হোক, নাৎসী জার্মানীর প্রাথমিক সাফল্যে জাপান উৎসাহিত হয় এবং প্রিন্স কোনোয়ের স্মৃতিকথায় জানা যায় যে তৎকালীন জাপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাৎসুওকা জাপানকে অবিলম্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আক্রমণ চালাতে প্ররোচিত করেন। সোভিয়েত-মঙ্গোলিয়া সীমান্তে দুর্ধর্ষ কোয়াটুং বাহিনী সমাবেশ করা হয় এবং সৈন্যবল দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু জাপ সেনাপতিরা তাদের অতীতের অভিজ্ঞতা স্মরণ করে ইতস্ততঃ করতে থাকেন। এছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রচণ্ড প্রতিরোধ জাপ সেনাপতিদের মনে সন্দেহ জাগায়। সম্রাট হিরোহিটো সহ জাপ শাসকগোষ্ঠীর এক গোপন বৈঠকে স্থির হয় যে, সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধ সম্পর্কে জাপানের মনোভাব ত্রিশক্তি চুক্তির দ্বারা

নির্ধারিত হলেও আপাততঃ জাপান এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করবে না। জাপান সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং বর্তমান যুদ্ধের অবস্থা জাপানের অনুকূলে হলে জাপান অস্ত্র ধারণ করবে।

এদিকে হিটলার অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন এবং জাপান যাতে অবিলম্বে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে তার জন্য চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু মোনসক-এর যুদ্ধ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে জাপ সামরিক কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারেন যে, যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে। ফলে সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে মার্কিন নৌঘাঁটি পার্লহারবার আক্রমণ করা স্থির হয়। সমগ্র এশিয়া অধিকারের জাপ পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ শুরু হয় পার্লহারবারে মার্কিন নৌঘাঁটি বিধ্বস্ত করে। তারপরেই শুরু হয় আগ্রাসী অভিযান। এশিয়ার বিরাট ভূখণ্ড অধিকার করার পর জাপানের দম ফুরিয়ে আসে, তখন তার চেতনা হয় যে তার মিত্রদের সাহায্য না পেলে আর সে অগ্রসর হতে পারবে না। এই কারণেই জাপান ভারত ও নিকট প্রাচ্য ভাগাভাগির গোপন চুক্তি করতে বাধ্য হয়। আগেই বলেছি সুভাষচন্দ্র এ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না।

স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে নাৎসী জার্মানীর শোচনীয় পরাজয়ের পর সুভাষচন্দ্র বুঝতে পারেন যে, জার্মানীর পরাজয় অনিবার্য, তাই তিনি তাড়াতাড়ি এশিয়ায় ফিরে জাপানের সাহায্যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার সংগ্রামে নেমে পড়তে চান। কিন্তু নাৎসী সরকার টালবাহানা করতে থাকে। যাই হোক, সুভাষচন্দ্র তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের সহায়তায় শেষ পর্যন্ত সাবমেরিনে মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে সিঙ্গাপুরে পৌছুতে পারেন। এখানে যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা' হল এই যে, জার্মানীতে নাৎসী সরকারের পক্ষ থেকে যাঁরা সুভাষচন্দ্রকে সাহায্য করতেন তারা ছিলেন নাৎসীবিরোধী। এঁদের মধ্যে ব্যারন ফন ট্রোটৎসু-ঘোলৎম ছিলেন সুভাষচন্দ্রের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য বন্ধু। ইনি ছিলেন জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারতীয় শাখার প্রধান। ফন ট্রোট ছিলেন ফ্যারিয়ান সোস্যালিস্ট অর্থাৎ নরমপন্থী সমাজতন্ত্রী। হিটলারের পতন ঘটানোর জন্য অনেকদিন আগে থেকেই এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ১৯৪৪ সালের ২০শে জুলাই এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাতে গিয়ে ফন ট্রোট ও তাঁর সহযোগীরা ব্যর্থ হন। পরে ধরা পড়ে ট্রোট নির্মমভাবে নির্যাতিত হন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করা হয়।

এঁদের মত নাৎসী বিরোধীদের সহায়তায় সুভাষচন্দ্র বিলম্বে হলেও এমন সময় জার্মানী ত্যাগ করতে সমর্থ হন যখন তাঁর নিজের জীবনই বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

যাই হোক, সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে পদার্পণ করার পর দ্রুত তাঁর পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে এগিয়ে গিয়েছিলেন। রাসবিহারী বসুর সক্রিয় সহায়তায় তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং অনেক চেষ্টার পর আন্দামানে আজাদ হিন্দ সরকার স্থাপন করতেও সমর্থ হয়েছিলেন। এর পরেই যে বাধাটি সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল তা হল বিমানবাহিনীর অভাব। জাপান বিমান আচ্ছাদনেরও (এয়ার কভার) কোন ব্যবস্থা করেনি। এর ফল যে কি মারাত্মক হতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল ১৯৪৪ সালের ২২শে মার্চ। ঐদিন মণিপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান উপলক্ষে রেঙ্গুনের উপকণ্ঠে একটি সামরিক কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠান হয়। বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ এই অনুষ্ঠান যখন চলছে তখন হঠাৎ একটি ব্রিটিশ জঙ্গী বিমান নেমে এসে কুচকাওয়াজরত সৈন্যদের উপর গুলিবর্ষণ করে, ফলে বেশ কিছু লোক হতাহত হয়।

জাপানের বিমানবাহিনীর শক্তি তখন কম ছিল তা নয়, কিন্তু নাৎসী জার্মানীর অবস্থা লক্ষ্য করে তখন জাপানের ভারত অভিযানের আগ্রহে ভাঁটা পড়েছিল! প্রকৃতপক্ষে জাপান তখন আত্মরক্ষার যুদ্ধে লিপ্ত।

অনেকে মনে করেন যে, ১৯৪২ সালে সুভাষচন্দ্র যদি এশিয়ায় উপস্থিত হতে পারতেন তা হলে ফল অন্যরকম হত। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ ১৯৪২ সালে জাপান এশিয়ার বিরাট অঞ্চল দখল করার পর জাপানের সৈন্য বলে টান ধরেছিল। পূর্ব রণাঙ্গনে তার যে সৈন্যবল ছিল তার জোরে সে অনায়াসে ব্রিটেনের দুর্বল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চূর্ণ করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে পারত, কিন্তু ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশকে দখলে রাখা সম্ভব হত না। একমাত্র সোভিয়েত সীমান্তে অবস্থিত কোয়াটুং বাহিনীর কিছু অংশ ভারত সীমান্তে স্থানান্তরিত করতে পারলে সত্যই গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হত কিন্তু জাপানের পক্ষে তা করা সম্ভব ছিল না, কারণ জার্মানীর সঙ্গে গোপন চুক্তি অনুযায়ী তখন তাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে হচ্ছে। তবে সে সময় আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হলে সুভাষচন্দ্র হয়তো বড় রকমের

সাহায্য অর্জন করতে পারতেন কিন্তু জাপানের শাসক গোষ্ঠী কখনই তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিত না।

আর একথাও মনে রাখা দরকার যে মণিপুর রণাঙ্গনে শুধু আজাদ হিন্দ ফৌজ যায়নি, তার সঙ্গে ছিল জাপ বাহিনী। অবশ্য যুদ্ধে জাপানীরা কতটা অংশগ্রহণ করেছিল তা যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ না পাওয়া গেলে বলা সম্ভব নয়।

১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা হয়। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে অর্থাৎ জাপ অধিকৃত ভারত ভূখণ্ডে আজাদ হিন্দ সরকার কাজ আরম্ভ করে। অবশ্য এ কাজ সহজে সম্পন্ন হয়নি, জাপ সরকার সহজে এতে সম্মতি দেয়নি। এর উপর জাপ বাহিনীর নির্মম আচরণে বিক্ষুব্ধ আন্দামান বাসীদের আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণ করাও কঠিন ছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র দমলেন না, তিনি ভারতে প্রবেশের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। জাপানের মনোভাব অথবা তার মতি পরিবর্তনের বিষয় তিনি তখন কিছুই জানতে পারেন নি। জানতে পারার কথাও নয়।

১৯৪৩ সালের আগস্ট মাসে সুভাষচন্দ্র বর্মা থেকে ভারতে গোপনে এক বার্তা পাঠান। তাতে তিনি জানান "আজাদ হিন্দ ফৌজ এখন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। আমরা শীঘ্রই রওনা হব এবং রওনা হয়ে ভারতের সীমান্তে উপস্থিত হব। এখনই আপনাদের প্রস্তুত হতে হবে…। যাতে আমাদের আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সর্বত্র বিপ্লবের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।"

(দ্য অর‍্যাক্‌ল, নেতাজী সংখ্যা, ১৯৮৬)

১৯৪২ সালে "আগস্ট বিপ্লবে"র আগুন যখন নিভে এসেছে তখন এই আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মত কেউ ছিল না। কাজেই বিপ্লবের আগুন আর জ্বলে উঠল না।

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কুরসবের যুদ্ধে নাৎসী বাহিনীর বিপর্যয়ের ফলে সমস্ত উদ্যোগ চলে গেছে সোভিয়েত বাহিনীর হাতে, শুরু হয়েছে প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ। জাপানের পক্ষ থেকে আজাদ হিন্দ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী লেঃ জেনারেল ইসোদা সাবুরো অকপটে বলেছেন:

"১৯৪৪ সালের গোড়ার দিক থেকেই যুদ্ধের পরিস্থিতি আমাদের প্রতিকূল

হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। নৌ ও বিমান শক্তিতে প্রাধান্য বিস্তারকারী মিত্রবাহিনীর ব্যাপক পাল্টা-আক্রমণের সম্মুখীন হয় আমাদের সৈন্যবাহিনী এবং দিনে দিনে আমাদের অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বর্ষাকালীন প্রবল বর্ষণ ও শত্রুপক্ষের সামরিক বিমান আক্রমণ নেতাজীর মাতৃভূমির মুক্তির আজীবনের আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করে দেয়, কারণ ছয় মাসের মরিয়া লড়াইয়ের পর ইম্ফলের কাছে একেবারে যখন পৌছানো গেলে তখনই মুণিপুরের দিকে ভারত-জাপ যুক্ত অভিযান পরিত্যাগ করতে হল।"

(দ্য অর‍্যাকল, নেতাজী সংখ্যা, জানু: ১৯৮৬)

কৃষ্ণা বসু সঠিকভাবেই লিখেছেন: "৪৪ সালের প্রথম ছয় মাস আজাদ বাহিনীর গৌরবময় অধ্যায়।" সাফল্যের পর সাফল্য অর্জন করে আজাদ হিন্দ ফৌজ ১৯৪৪ সালের ১৯শে মার্চ ভারতবর্ষের ইম্ফলের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে ভারত-জাপ যুক্তবাহিনী। এই সময় সুভাষচন্দ্র সেমিওতে জাপ সেনাপতি মুতাগুচিকে জানিয়ে দেন যে, ভারতভূমিতে যে রক্ত ঝরবে সে রক্ত ঝরবে ভারতীয়ের। তাই হয়েছিল। ইম্ফলের অল্প দূরে ক্ষয়রাংয়ে ভারতবর্ষের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন সৌকত মালিক। ভারতবর্ষের অধিকৃত এলাকার আজাদ হিন্দ সরকারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন মেজর জেনারেল এ সি চ্যাটার্জী। এর পরেই এসে গেল বর্ষাকাল, প্রবল বর্ষণে সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে গেল। মিত্র পক্ষের প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চলতে থাকল। তাদের স্থলবাহিনী বিমান থেকে খাদ্য থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই পেতে থাকল।

অনাহারক্লিষ্ট, রোগজীর্ণ আজাদ হিন্দ ফৌজ তখনও প্রবল বিক্রমে লড়ছিল। কিন্তু জয়ের আশা নেই দেখে আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকজন অফিসার শত্রু-পক্ষে যোগ দিয়ে সবকিছু জানিয়ে দেয়। ফলে মিত্রপক্ষের সুবিধা হয়ে গেল। তাদের আক্রমণ তীব্রতর হল। অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠছে দেখে জাপ কর্তৃপক্ষ পিছু হঠার আদেশ দিলেন ১০ই জুলাই। সুভাষচন্দ্রের সব আশা ব্যর্থ হয়ে গেল। আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানের কাছ থেকে কখনই প্রয়োজনীয় সমরোপকরণ পায়নি, কাজেই জাপ-বাহিনী পিছু হটতে শুরু করলে তাদের পক্ষে যুদ্ধ চালানো আর সম্ভব ছিল না।

জাপানের পিছু হঠা ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। তখনও তার সামরিক শক্তি ছিল বিপুল।

১৯৪৫ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি প্রতিরক্ষা বিভাগের গোয়েন্দা দপ্তরের হিসাবে জাপ সমর-শক্তি ছিল নিম্নরূপ :

জাপানের দ্বীপগুলিতে মোট সৈন্য সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ, জাপ অধিকৃত চীন, মানচুকুও, কোরিয়া ও ফরমোজা (তাইওয়ান) ২০ লক্ষ ; ইন্দোচীনে, থাইল্যাণ্ডে ও বর্মায় ২ লক্ষাধিক ; ইন্দোনেশিয়ায় ও ফিলিপাইনস-এ ৫ লক্ষাধিক ; মার্কিন বাহিনীর পিছনে প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে—এক লক্ষাধিক।

আগস্ট মাসে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার ফলে জাপানের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৫৫ লক্ষ। এই বিরাট বাহিনীর মেরুদণ্ড ছিল দুর্ধর্ষ কোয়াণ্টুং বাহিনী। সব মিলিয়ে জাপানের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৭২ লক্ষ। এ ছাড়া ছিল প্রায় ৫ শত যুদ্ধ জাহাজ এবং দশ সহস্রাধিক বিমান (এই বিমান বাহিনীর মধ্যে ছিল ৫ হাজার 'কাকি-কাজে' বা আত্মহননে প্রস্তুত পাইলট)। ভয়াবহ বীজাণু যুদ্ধ পরিচালনার জন্যও জাপান সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিল।

বোঝা যায় যে জাপান দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ সংগ্রামের মধ্যে ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটা মিটমাট করে নেওয়ার জন্য উদ্যোগী হয়েছিল। এই অবস্থায় ভারতবর্ষ, বর্মা, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে সরে আসাই জাপ সামরিক কর্তৃপক্ষ শ্রেয় মনে করেছিলেন।

কাজেই আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে তারা মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন বোধ করেন নি। অসহায় সুভাষচন্দ্রের কিছুই করার ছিল না।

১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন বর্মা থেকে পিছু হটে ব্যাংককে ঘাঁটি স্থাপন করল তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে এবং জাপ সরকারের ছল-চাতুরীর পরিচয় পেয়ে সোভিয়েত-জাপ চুক্তি (১৯৪১ সালের ১৩ই এপ্রিল সম্পাদিত) বাতিল করে দিয়েছে এবং জাপানের উপর আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এক কথায় জাপান তখন দারুণ সংকটের সম্মুখীন।

জাপানের বিপুল সামরিক শক্তি ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষকে বিচলিত করে তুলেছিল। তাই তারা সোভিয়েত ইউনিয়ন যাতে নাৎসী-জার্মানীর পরাজয়ের পর জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তার জন্য রাষ্ট্রনায়কদের চেষ্টা করতে বলেন।

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইয়ালটা শীর্ষ সম্মেলনে স্বাক্ষরিত ত্রিশক্তি

চুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে, নাৎসী-জার্মানী আত্মসমর্পণ করার দুই-তিন মাসের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে।

১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে জাপানের আক্রমণে এবং ওবিশুওয়ার যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিপুল ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। প্রায় ১৯০০ আত্মঘাতী জাপ-পাইলটের বিমান হানায় ২৬টি মার্কিন জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিহত হয় প্রায় ১২ হাজার মার্কিন সৈন্য, আহত হয় প্রায় ৩৪ হাজার।

ওকিনাওয়ার যুদ্ধে হতাহত ও নিখোঁজ হয় ৭৫,২৭০ জন মার্কিন সৈন্য। এই যুদ্ধে জাপানের 'বাইতেন' বা 'স্বর্গ যাত্রা' নামে অভিহিত মানুষ চালিত টর্পেডোর আঘাতে একটি বিমানবাহী জাহাজ ও একটি ক্রুইজারসহ ১৪টি মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ জলমগ্ন হয় অল্প সময়ের মধ্যে। তিন মিনিটের মধ্যে ১০ হাজার টনের জাহাজ ৮৮৩ জন সৈন্য ও নাবিক সহ ডুবে যায়।

অন্যদিকে প্রবল মার্কিন বিমান আক্রমণ জাপ সামরিক বাহিনীর শক্তি কিছুমাত্র ক্ষুন্ন করতে পারে না, হতাহত হয় বেশীর ভাগই অসামরিক লোকজন। জাপান তখন শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধের আওয়াজ তুলেছে। জাপ-শাসকগোষ্ঠীর তখন একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী করে ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটা সমঝোতায় উপনীত হওয়া।

যাই হোক, এই অবস্থায় আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সরকার নিয়ে জাপ সরকার আর মাথা ঘামাচ্ছিল না। তখন সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ ফৌজের একমাত্র ভরসা থাইল্যাণ্ড। থাই সরকার সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করেছিল, কিন্তু যুদ্ধে সাহায্য করার শক্তি তাদের ছিল না, তার উপর জাপানের আসন্ন পরাজয়ের কথা ভেবে তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। তবু সুভাষচন্দ্রকে থাইল্যাণ্ডে আত্মগোপন করার সুযোগ দিতে তারা কুণ্ঠিত হয়নি।

ব্যাংককে যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ তাদের শেষ ঘাঁটি স্থাপন করল তারপর অনেক ঘটনা ঘটে গেল দ্রুত গতিতে

১৯৪৫ সালের ৫ই মে নাৎসী জার্মানী বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করল। ইয়োরোপে যুদ্ধের অবসান ঘটল। ১৯৪৫ সালের ৯ই আগস্ট সোভিয়েত-মঙ্গোলীয় যুক্তবাহিনী অভিযান শুরু করল জাপানের বিরুদ্ধে। জাপ সম্রাট জাপবাহিনীকে প্রবল প্রতিরোধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার আদেশ দিলেন। তখনও

জাপ সরকার তাদের দূর প্রাচ্যের সাম্রাজ্য বজায় রাখতে পারবেন বলে আশা করছেন।

অন্যদিকে সোভিয়েত-মঙ্গোলীয় বাহিনী সাফল্য অর্জন করার আগেই যাতে জাপান ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে তার জন্য মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাদের উদ্ভাবিত পরমাণু বোমা বর্ষণ করল জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে যথাক্রমে ৬ই ও ৯ই আগস্ট তারিখে। দুটির কোনটিতেই জাপানের সামরিক ঘাঁটি ছিল না। মারা পড়েছিল সাধারণ মানুষ, সামরিক বাহিনীর কোনই ক্ষতি হয়নি। সাধারণ মানুষের জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন জাপ সামরিক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছিলেন: "আমরা এইসব বোমার ভয়ে ভীত নই, আমরা পাল্টা ব্যবস্থা নিচ্ছি।"

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা পরমাণু বোমা বর্ষণ করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন যাতে জাপান অধিকার করতে বা জাপান অধিকারের ভাগীদার হতে না পারে এই উদ্দেশ্যে—একথা আজ অকপটভাবেই স্বীকার করেছেন জাপানী সরকারের একজন কর্মকর্তা। যাই হোক, জাপ সরকারের আশা ব্যর্থ করে দিয়ে সোভিয়েত-মঙ্গোলীয় বাহিনী দ্রুত অগ্রসর হয়ে সব প্রতিরোধ চূর্ণ করে দিল। দুর্ধর্ষ কোয়াটুং বাহিনীকে নিদারুণ পরাজয় বরণ করতে হল।

১৯৪৫ সালের ১৪ই আগস্ট জাপান বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করল।

জার্মানী ও জাপানের আত্মসমর্পণের পরেও সুভাষচন্দ্র ভেঙ্গে পড়েননি। কিন্তু তিনি তখন স্থিতধী ছিলেন বলে মনে হয় না। নইলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে বিরোধ বাধবেই এটা ধরে নিয়ে তিনি রুশিয়ায় যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতেন না। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে যত বিরোধই থাক না কেন ঠিক যুদ্ধাবসানের পরেই তা আত্মপ্রকাশ করার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই সুভাষচন্দ্র যদিও সোভিয়েত ইউনিয়নে উপস্থিত হতেও পারতেন তাহলে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারেই সোভিয়েত সরকার তাঁকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হত।

এই বিপদ ছিল বলেই সুভাষচন্দ্রের জার্মান বন্ধু ও উপদেষ্টা হ্বানটের মায়ার, তাঁকে এই ঝুঁকি নিতে নিষেধ করেছিলেন। মায়ার সুভাষচন্দ্রকে কিছুক্ষণ আত্মগোপন করে থাইল্যাণ্ডে থাকার উপদেশ দেন, কিন্তু সুভাষচন্দ্র তাতে

রাজী হননি। সম্পূর্ণ একটি অসম্ভব ও অবাস্তব পরিকল্পনা নিয়ে সুভাষচন্দ্র জাপানে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

১৯৪৫ সালের ১৬ই আগস্ট ব্যাংককে মায়ারের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের শেষ দেখা হয়। দেবনাথ দাস প্রমুখ অনেকেই সুভাষচন্দ্রকে থাইল্যাণ্ডে আত্মগোপন করে থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, ব্যবস্থাও করা হয়েছিল কিন্তু সুভাষচন্দ্র তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন।

১৭ই আগস্ট সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সহকারীরা সায়গনের বিমান বন্দরে নামলেন। সেখানে সায়গন থেকে তখন একটি মাত্র বিমান ছাড়ছে যাতে শুধু সুভাষচন্দ্রের জন্য একটি মাত্র আসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব। কোথায় বিমানটি যাবে তাও কেউ জানে না। সুভাষচন্দ্র খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু কিছুই করার ছিল না। শেষ পর্যন্ত জাপ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এক রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনার পর ঠিক হয় যে, জাপ জেনারেল সিডেই-এর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র মানচুরিয়া যাবেন এবং সেখানে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সুভাষচন্দ্র তাঁর কর্মপন্থা স্থির করবেন। জাপান যখন আত্মসমর্পণ করেছে, তখন এই ধরনের ব্যবস্থার অর্থ হল সুভাষচন্দ্রকে সোভিয়েত সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া। যাই হোক, সুভাষচন্দ্র তাঁর 'অজানা দিকে' পাড়ি দিলেন (তাঁর ভাষায় adventure into the unknown)। তারপর সত্যিই তিনি হারিয়ে গেলেন এক অজানা দেশে যে দেশ থেকে কেউ ফিরে আসে না।

১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্র সহ হতাহত হলেন অনেকে। আহত সুভাষচন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বিদেশের মাটিতে। মার্কিন বাহিনী যখন জাপানে অবতরণ করেছে তখন সুভাষচন্দ্রের শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হল রেনকোজি বৌদ্ধ মন্দিরে। ১৮ই সেপ্টেম্বর এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে এই কাজ সম্পূর্ণ হল। তারপর থেকে সুভাষচন্দ্রের চিতাভস্ম সেই মন্দিরেই সংরক্ষিত রয়েছে।

জনসাধারণের সরল বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করে এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ ও তাদের সমর্থকরা রাজনৈতিক অভিসন্ধিপ্রসূত প্রচার চালিয়ে গেছেন জওহরলাল নেহরু তথা ভারত সরকারের বিরুদ্ধে। 'নেতাজীর মৃত্যু হয়নি'— এ প্রচার চলেছে দিনের পর দিন। বড় বড় কাগজে দিনের পর দিন দীর্ঘ প্রবন্ধ বেরিয়েছে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ অস্বীকার করে। অভিযুক্ত করা

হয়েছে সোভিয়েত সরকারকে—তারা নাকি বন্দী করে রেখেছেন সুভাষচন্দ্রকে। সুভাষচন্দ্র বলে বর্ণিত ও প্রচারিত একাধিক ব্যক্তি লাঞ্ছিত হয়েছেন। উত্তরবঙ্গে এক সন্ন্যাসীর আশ্রম তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে বাধ্য হয়েছে।

জাপানীদের বহুবার অনুরোধ করে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু ও তাঁর শেষকৃত্য সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণ পেয়েছেন কৃষ্ণা বসু এবং তার বিস্তারিত বিবরণ তিনি দিয়েছেন তাঁর "চরণ রেখা তব" গ্রন্থে। তবু সরল মানুষদের অন্ধবিশ্বাস এবং রাজনৈতিক অভিসন্ধি প্রসূত প্রচারের এমনই মহিমা যে, সব জেনেও তাঁর মনে সংশয় দেখা দিয়েছে, প্রশ্ন করেছেন: "কি করে বলব কোনটা সত্যি কথা? কে বলে দেবে? কোনও দিনও কেউ জানতে পারবে কি?" (পৃঃ ১৭৩)

এর ফল যা হবার তাই হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুকে রহস্যাবৃত করেই রাখা হয়েছে।

তাঁর দেহাবশেষ দেশের মাটিতে ফিরিয়ে আনার কোন উদ্যোগই গ্রহণ করা হয়নি।

সুভাষচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রয়াত সত্যানন্দ ১৯৫৮ সালের ২২শে জুনের এক চিঠিতে ড. শিশিরকুমার বসুকে সুভাষচন্দ্রের চিতাভস্ম ভারতে নিয়ে গিয়ে নেতাজী ভবনে রাখার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সে অনুরোধে কোন সাড়া মেলেনি। বছরের পর বছর গড়িয়ে যাচ্ছে। সুভাষচন্দ্রের চিতাভস্ম জাপানের বৌদ্ধ মন্দিরেই পড়ে থাকছে।

সুভাষচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি এ এক অভূতপূর্ব শ্রদ্ধা প্রদর্শনই বটে।

* * *

সুভাষচন্দ্র বীরের মৃত্যুবরণ করেছেন। সংগ্রামরত মানুষের জীবনে বিপর্যয় ঘটেই যাচ্ছে—তা সাময়িকই হোক, আর স্থায়ীই হোক—তাঁর জীবনে স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হওয়ার বিপর্যয়ই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় বলে মনে হয়েছিল। যে বিপর্যয়ে তাঁর জীবনাবসান ঘটল তা নিয়ে কখনও ভাবেননি।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র ইতিহাসের ট্র্যাজিক নায়ক নন। কারণ তাঁকে ব্যর্থতা বরণ করতে হয়নি। তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং যার প্রকাশ ঘটেছিল নৌ-বিদ্রোহে তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি চূর্ণ করে দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা ভারতীয় বাহিনীকে মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত

করার যে চেষ্টা চালিয়ে এসেছিলেন তারই পূর্ণ পরিণতি ঘটে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন ও নৌ-বিদ্রোহের মধ্যে।

সুভাষচন্দ্রের সংগ্রামী জীবনে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিডি হল ফ্যাসিবাদ সম্বন্ধে তাঁর ভ্রান্ত ধারণা এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর ভুল সিদ্ধান্ত। এই দুইটি তাঁকে ভুল পথে পরিচালিত করে।

ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিজম উভয় মতবাদ থেকে ভারতের কিছু নেওয়ার আছে এবং উভয় মতবাদের একটা সমন্বয় ঘটানো সম্ভব এই ধারণা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে জাপানে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সভায় তাঁর এই ধারণা আবার ব্যক্ত করেন। ফ্যাসিবাদ যে পুঁজিবাদেরই উলঙ্গরূপ একথা তিনি বুঝতেই পারেন নি। নাৎসী জার্মানীতে বেশ কিছুকাল অবস্থান করার পরও তাঁর এই ধারণা বেশ বিস্ময়কর বলেই মনে হয়।

ফ্যাসিবাদের আসল চেহারা ধরতে না পারার ফলেই সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে নিছক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের যুদ্ধরূপে গণ্য করে "শত্রুর শত্রু আমাদের মিত্র" এই তত্ত্ব অনুসারে ফ্যাসিস্ত শক্তিবর্গের সঙ্গে হাত মেলান। ফ্যাসিস্ত শক্তিবর্গ জয়লাভ করলে ভারতের তথা সারা পৃথিবীর স্বাধীনতা সুদীর্ঘকালের জন্য অবলুপ্ত হয়ে যেত এ কথা সুভাষচন্দ্র বুঝতে পারেননি।

তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় যে জটিলতা দেখা দিয়েছিল তার ফলেই তিনি ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবনীকার মিহির বসু এ কথা স্বীকার করে লিখেছেন "তাঁর সুবিদিত সমন্বয়বাদ ও সতত ব্রিটেনের শত্রুদের খুঁজে বেড়ানো সেই শত্রুদের পরিচয় পরখ না করেই তাঁকে অদ্ভুত অদ্ভুত সব পথে ঠেলে নিয়ে গেছে এবং সময় সময় কানা গলিতে ঠেলে দিয়েছে।"

[His celebrated celecticism and his constant search for the enemies of Britain without always checking their credentials, led him to strange pathways and even at times deadend"—The Lost Hero—by Mihir Bose.]

সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে যখন আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হয়েছে ও আজাদ হিন্দ ফৌজ রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়েছে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মুক্তি বাহিনী জনগণ নেমে পড়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে। ইন্দো চীনে বিশ্বখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা হো চিন মিন, বর্মায় জেনারেল আউঙ সান ও নে উইন, ইন্দোনেশিয়ায়

(ডাব ইস্ট ইণ্ডিজ) সুহার্তো, আদাম মালিক ও সুকার্ণ, ফিলিপাইন্স-এ ছকে-বালা হাপের নেতৃত্বে মুক্তিবাহী জনগণ যুগপৎ ফ্যাসিস্ত জাপান এবং সাম্রাজ্য-বাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র এঁদের সঙ্গে কোন যোগ স্থাপনের চেষ্টা করেননি বা করতে পারেননি। করতে পারলে সুভাষচন্দ্রকে 'অজানার পথে' পাড়ি দিতে হত না।

বুঝতে পারা যায় যে, জাপানীরা তাঁর উপর কড়া নজর রেখেছিল, কাজেই তাঁর ইচ্ছা থাকলেও তখন অন্যপথ ধরার সুযোগ তিনি পেতেন না। সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীজীর মধ্যে মিল ও অমিল নিয়ে অনেকে অনেক কথা লিখেছেন। হিংসা ও অহিংসার উপর অনেকে জোর দিয়েছেন। কিন্তু আসলে হিংসা ও অহিংসার প্রশ্ন গান্ধীজী-সুভাষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে কখনই বড় হয়ে দেখা দেয়নি। বড় হয়ে দেখা দিয়েছে আপস ও আপসহীন সংগ্রামের প্রস্তুতি। গান্ধীজী বরাবরই ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে একমত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করতে চেয়েছেন। সুভাষচন্দ্র বরাবর আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প ঘোষণা করে এসেছেন।

এখানেই গান্ধীজীর সঙ্গে ছিল গুরুতর পার্থক্য। গণ-জাগরণের হোতারূপে গান্ধীজী যদি 'জাতির জনক' রূপে স্বীকৃতি লাভ করে থাকেন, তা হলে সুভাষচন্দ্র অবশ্যই জনগণের আপসহীন সংগ্রামের অধিনায়করূপে স্বীকৃতি লাভের অধিকারী।

—সুভাষচন্দ্রের জীবনের ক্রমবিবর্তনও অসামান্য ব্যাপার। হিন্দু পরিবারে তিনি জন্মেছিলেন, হিন্দু সমাজের ঐতিহ্য ও সংস্কার তিনি বহন করে চলেছিলেন তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হওয়ার পরও যার মধ্যে কিছু সংকীর্ণতা ছিল। এই সংকীর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায় হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সময়। গোঁড়া মুসলমানরা কলকাতার রাজপথে বা অন্যত্র যেখানে সেখানে মসজিদ গড়ে তুলতে থাকলে সুভাষচন্দ্র হিন্দুদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেমে পড়েছিলেন। আমহার্স্ট স্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোডের মোড়ের মন্দিরটি তার সাক্ষ্য। আবার ব্রাহ্ম সম্প্রদায় পরিচালিত সিটি কলেজে সরস্বতী পূজার ঘটনা নিয়ে সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এমন কি যখন তিনি কংগ্রেস নেতাদের বিশেষ করে গান্ধীজীর চাপের ফলে

কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হন তখন তিনি "মারণ-উচাটন" যজ্ঞ করে কংগ্রেস নেতাদের জব্দ করার চেষ্টা করেছিলেন বলেও শোনা যায়। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকে সুভাষচন্দ্র প্রগতিশীলতার পরিচয় দেননি। কিন্তু কালক্রমে সুভাষচন্দ্র এ সব সংকীর্ণতা ও সংস্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে সত্যিকারের এক জাতীয় নেতারূপেই আবির্ভূত হয়েছিলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ সরকারে সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন মাত্র ছিল না—হিন্দু-শিখ-খ্রীষ্টান-জৈন-বৌদ্ধ সকলেই পেয়েছিলেন সমান অধিকার, সমান মর্যাদা ভারতীয় নাগরিকরূপে। স্বাধীন ভারতের ভাষারূপে তিনি গ্রহণ করেছিলেন হিন্দুস্তানী অর্থাৎ ফারসীমিশ্রিত হিন্দী ভাষা। আজকের ধর্মনিরপেক্ষ ভারত তাঁর আদর্শ ভারতীয় রাষ্ট্রের কাছাকাছিও যেতে পারেনি।

এর কারণ স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র গড়ে ওঠেনি আপসহীন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। আপসহীন সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই রক্তস্নাত ভারত সত্যিকারের অন্ধকারমুক্ত স্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে গড়ে উঠতে পারত। সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিস্ত ছিলেন না তবে তিনি ফ্যাসিবাদের কোন কোন ধ্যানধারণাকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন —তিনি চেয়েছিলেন অখণ্ড ভারত রাষ্ট্র—এক সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন মহানায়ক ও এক রাজনৈতিক দলের অধীনে। ভারতবর্ষকে শক্তিশালী আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার এটাই একমাত্র উপায় বলে তিনি মনে করেছিলেন।

এই কারণে সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিস্ত শক্তিবর্গের সাহায্য গ্রহণ করায় অনেকে তাঁকে ফ্যাসিস্ত বা ফ্যাসিস্ত মনোভাবাপন্ন বলে মনে করেন। কিন্তু এটা ভুল। কারণ প্রথমত সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিবাদকে ধিক্কার না জানালেও তিনি কখনও ফ্যাসিবাদকে সমর্থন করেননি। দ্বিতীয়ত নাৎসীদের জাতি দ্বেষী কর্মনীতি তাঁকে ক্ষুব্ধ করেছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৩৬ সালে মিউনিখে 'ভারত পরিষদ্'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ড. ফ্রান্তস থিয়ের ফেলডারের কাছে লেখা একটি চিঠিতে। (দ্রঃ ড. গিরিজা মুখার্জীর প্রবন্ধ, দ্য অর‍্যাক্‌ল, নেতাজী সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯৮৬)।

১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে লেখা এই চিঠিতে সুভাষচন্দ্র লেখেন:

"১৯৩৬ সালে যখন আমি প্রথম জার্মানীতে যাই তখন আমি আশা করেছিলাম যে নবীন জার্মান জাতি তার জাতীয় ক্ষতি ও আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে সেই নবীন জার্মান জাতি সহজাত প্রবৃত্তিবশতঃই

সমন্বয়াভিমুখী সংগ্রামরত অন্যান্য জাতির প্রতি গভীর সহানুভূতি সম্পন্ন হবে।

আজ আমাকে কত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এই প্রত্যয় নিয়েই আমাকে ভারতে ফিরে যেতে হচ্ছে জার্মানীর নবজাতীয়তাবাদ শুধু সংকীর্ণ ও স্বার্থপর নয়, উদ্ধতও বটে।"

"অন্যান্য জাতির উপর শ্বেতাঙ্গ জাতিগুলির আধিপত্য স্থাপনই তাদের ভবিতব্য" হিটলারের বক্তৃতায় এই কথা থাকায় সুভাষচন্দ্র তার তীব্র সমালোচনা করেন।

ব্রিটেনের অনুগ্রহ লাভের জন্য জার্মানী চেষ্টা করছে এই অভিযোগ করে সুভাষচন্দ্র তাঁর চিঠিতে ইংল্যাণ্ডে হিটলারের ও রোজেনবার্গের বই থেকে ভারত বিরোধী লেখাগুলি উদ্ধৃত করে জার্মানী যে পুস্তিকা প্রচার করে তার উল্লেখ করেন।

সুভাষচন্দ্র তাঁর চিঠিতে হিটলারের এক আপত্তিজনক বক্তৃতার উল্লেখ করে লেখেন যে তিনি এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে একটি বিবৃতি দিচ্ছেন তবে জার্মানীর সঙ্গে ভারতবর্ষের সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য তিনি সচেষ্ট থাকবেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় লেখেন :

"যখন আমরা পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা ও আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য লড়ছি এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের সাফল্য সম্পর্কে যখন আমরা সুনিশ্চিত তখন আমরা আমাদের প্রতি অন্য কোন জাতির অবমাননা অথবা আমাদের জাতি ও সংস্কৃতির উপর আক্রমণ আমরা বরদাস্ত করব না।"

১৯৪২ সালের ১লা মে সুভাষচন্দ্র স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে তিনি ফ্যাসিস্ত শক্তিবর্গের পক্ষে ওকালতি করতে যাচ্ছেন না এবং তারা কি করেছে বা ভবিষ্যতে কি করবে তার পক্ষ সমর্থন করাও তাঁর কাজ নয়।

এক কথায় বলা যায় যে সুভাষচন্দ্রের নীতি ছিল সম্পূর্ণ সুবিধাবাদী অর্থাৎ ভারতের স্বার্থে ফ্যাসিস্ত শক্তিবর্গকে ব্যবহার করা।

এখানে একথাও বলে রাখতে হবে যে, অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যেও সুভাষচন্দ্র স্বাধীনভাবে চলার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি কখনই নাৎসীদের বা জাপ সমরবাদীদের আজ্ঞাবহ হতে চাননি।

জাপানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়েও তিনি বর্মার ফ্যাসিস্তবিরোধী লীগের বিরুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজকে ব্যবহার করতে দেননি।

জাপানের সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে সুভাষচন্দ্র যে সব কথা বলেছেন সেগুলো নিছক কূটনৈতিক। ভারতের স্বাধীনতা সুভাষচন্দ্রের ধ্যানজ্ঞান, তাই জাপানের সাহায্য লাভের জন্য জাপ শাসকদের প্রশস্তি গাইতে তিনি দ্বিধা করেননি।

জাপ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে চীনের উপর জাপ আক্রমণের তীব্র নিন্দা করতে তিনি দ্বিধা করেন নি। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সরকার গঠনে জাপানের উপর যখন তিনি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, তখন তাঁকে জাপ শাসকদের সমর্থন লাভের জন্য অনেক কিছু বলতে হয়েছে যা তাঁর অন্তরের কথা নয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তোলার ব্যাপারে জাপান গোড়া থেকেই তেমন উৎসাহ দেখায় নি' ৩০ হাজারের বেশি সৈন্যকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে জাপ সরকার রাজী হয়নি। সুভাষচন্দ্র ৫০ হাজার সৈন্য এবং ২০ হাজার অ-সামরিক স্বেচ্ছা সৈন্যের জন্য অস্ত্রশস্ত্র দাবি করেছিলেন এবং দাবি আদায় করতে তাঁকে বেশ দর কষাকষি করতে হয়েছিল। তিনি বিমান ও নৌবাহিনীও গড়তে চেয়েছিলেন। জাপান একটি বিমান, একটি যুদ্ধ জাহাজও দেয়নি। আসলে সুভাষচন্দ্র বুঝতে পারেন নি যে, তিনি যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে ভারতে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন তখন জাপান আত্মরক্ষার যুদ্ধে লিপ্ত। ইঙ্গ-মার্কিন অভিযানকে যতদিন সম্ভব ঠেকিয়ে রেখে সুশৃঙ্খলভাবে পিছু হটে শক্ত ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তন এবং সেই সময়ের মধ্যে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের সঙ্গে একটা সম্মানজনক আপস করাই ছিল জাপানের লক্ষ্য।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপান প্রকৃতপক্ষে কোন সহায়তা করেনি। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইঙ্গ-মার্কিন অভিযানের গতিবেগকে মন্দীভূত করে দ্রুত পশ্চাদপসরণ করা। ইম্ফলে হাজার হাজার জাপ-সৈন্য প্রাণ দিয়েছিল ঐ উদ্দেশ্যেই, ইংরাজীতে যাকে বলা হয় "রিয়ার গার্ড এ্যাকশন"।

সুভাষচন্দ্রের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য তিনি তাঁর 'তনু ধন মন' নিঃশেষে নিবেদন করেছিলেন। অন্য কোন সমস্যার কথা তিনি চিন্তাই করতে পারেন নি, ফলে ফ্যাসিস্ট

রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তিনি যে এক সাজ্ঘাতিক জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন একথা তিনি বুঝতে পারেন নি।

নিজের ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং দেশবাসীর উপরেই সুভাষচন্দ্র ভরসা রেখেছিলেন, কোন বিদেশী শক্তির উপর নয়।

আর তাই বিমান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার পর আহত অপর সঙ্গী হবিবকে তিনি প্রত্যয় সিদ্ধ কণ্ঠে বলতে পেরছিলেন "হিন্দুস্থান জরুর আজাদ হোগা, উসকো কোই গুলাম নেহি রাখ শকৃতা"।

ভারত স্বাধীন হবেই কেউ তাকে তার গোলাম করে রাখতে পারবে না।

নিজের মাতৃভূমিকে যিনি প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন, যে 'সোনার বাংলা'র মাটিতেই যিনি চির বিশ্রাম লাভ করতে চেয়েছিলেন আজ তাঁর চিতাভস্মও সেই তাঁর মাতৃভূমি, তাঁর সোনার বাংলায় স্থান পেল না। বছরের পর বছর তাঁকে নিয়ে চলেছে রাজনীতির খেলা। সুভাষচন্দ্রের জীবনে এই হল চরম ট্র্যাজিডি।